স্বর্ণ-কণা ।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত, বি, এ,

(হেড্ মাষ্টার, দি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এড্ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন)

SWARNA-KANA

SELECTED AND EDITED

BY

BHUPENDRALAL DUTTA, B. A.

Head Master The Brahmanbaria Edward Institution

PUBLISHED BY

G. C. CHAKRAVARTTY,

12, Cornwallis Street, Calcutta.

মূল্য এক টাকা মাত্র

PUBLISHED BY
G. C. CHAKRAVARTTY,
CALCUTTA.



PRINTED BY
K. C. CHAKRAVARTTY,
GIRISH PRINTING WORKS,
51-2-6, SUKEA STREET
CALCUTTA.

ভূমিকা।

বঙ্গসাহিত্যখনি অনন্ত রত্নভাণ্ডার। অপূর্ব্ব মনীষাসম্পন্ন বাণীপুত্রগণ নানা বিচিত্র রত্নে ভাষাকে সম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছেন। তাহারই কয়েকটী সমুজ্জ্বল স্বর্ণকণা সংগ্রহপূর্ব্বক এই সাজি সজ্জিত হইল। সংগৃহীত স্বর্ণকণার সমুজ্জ্বল প্রভায় মুগ্ধ হইয়া শিক্ষাব্রত ছাত্রগণ একদিন এই খনিতে প্রবেশপূর্ব্বক উজ্জ্বলতর ও শ্রেষ্ঠতর স্বর্ণ আহরণপূর্ব্বক বঙ্গবাণীর চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিবে—ইহাই আমার একমাত্র আশা।

বঙ্গসাহিত্যেরদুইটী ধারা— পদ্য ও গদ্য। পদ্য-সাহিত্যে বাংলা চিরসম্পদশালী। বহু সুকণ্ঠ কবির সুস্বরে ও বীণার ঝঙ্কারে বঙ্গ-গগন মুখরিত।

বাংলা গদ্য-সাহিত্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। রাজা রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক বলা যাইতে পারে। তাঁহার আবির্ভাবের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধশতাব্দীকাল পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে উৎকর্ষ লাভের বহু চিহ্ন দেখা যায়। এত অল্প সময়ে এরূপ দ্রুত উন্নতি বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন ভাষার ভাগ্যে ঘটে নাই।

এই গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বাংলা রচনা সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। যে রচনাটীতে লেখকের লিখনভঙ্গিটী সুস্পষ্ট প্রস্ফুটিত, তাহাই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং যাহাতে তাহাদের চিন্তার ধারার সহিতও শিক্ষার্থী পরিচিত হইতে পারেন, সে দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছি।

যাঁহাদের রচনা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রকার লাভ আমাদের বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানার্থ ব্যয়িত হইবে।

১৩৩৭ শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
স্তব—(শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস)	১
বিবাদভঞ্জন—(স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়) ...	৪
আকবর শাহ—(শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত)	৫
অশ্বমেধ যজ্ঞ—(স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) ...	১৫
পিতৃদেব—(স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	২৫
বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র—(স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু) ...	৩৩
গ্লাডষ্টোন—(শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়)	৪৩
অকূল সাগর—(স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন)	৫২
স্বপ্নদর্শন,—বিদ্যাবিষয়ক—(স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত) ...	৬১
বিদ্যাসাগর—(স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৭১
বিনয়ে বাধা—(স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ)	৭৮
ভালবাসার অত্যাচার—(স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ...	৯০
টেলিমেকস—(স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) ...	১০০
ভক্ত হরিদাস—(স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ-বিদ্যাসাগর) ...	১১৭
অহল্যা বাই—(শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু)	১২৫
উড়িষ্যার মঠ—(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ) ...	১৩৩
বাপ্পারাও—(রাজস্থান)	১৪৫
সিরাজদ্দৌলা—(শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়) ...	১৬৪
কৃত্তিবাস—(স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-সরস্বতী) ...	১৭০
শাহ্জাহানের রাজ্যনাশ—(শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার) ...	১৭৮

স্বর্ণ-কণা।

স্তব।

(শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ)

নমস্তে নারায়ণ !

তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন। আমাদের এই হাসি-অশ্রুময় জীবন, সুখে দুঃখে পরিপূর্ণ সংসার—ইহাকে বাঁচাইয়া, জাগাইয়া রাখ একমাত্র তুমি।

তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া-পুত্তলিকা। তুমি যখন আপনাকে লুকাইয়া রাখ, তখনি সংসার মায়ার খেলা হইয়া উঠে। তুমি সৃষ্টিকে সত্য করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছ। সকল সংসার তোমার লীলাভূমি।

নায়ক নায়িকার মাধুর্য্য, পিতামাতার বাৎসল্য, সখার সখ্য এবং প্রভু ও দাসের একদিকে স্নেহ ও অপর দিকে ভক্তি—এই সব লইয়াই ত সংসার, এই সব লইয়াই ত জীবের জীবন। তুমিই ত এই সকল রসকে সার্থক কর। সকল রসের এক মাত্র লক্ষ্য তুমি; আর যাহা কিছু সব ত উপলক্ষ্য। ওই যে মাতা বাৎসল্য-আবেগে আপনার শিশুটিকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন, ঐ বাৎসল্য রস ত তোমারই দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ওই শিশুর মধ্যে যে জননী

শিশুরূপী তোমাকে না দেখিতে পান, তাঁহার বাৎসল্যের সার্থকতা কোথায়? তুমি যখনি তাঁহার প্রাণে ওই শিশুরূপে আবির্ভূত হও, তখনি তাঁহার বাৎসল্য ধন্য হয়। বাৎসল্যের অসীম আনন্দ তিনি তখনি উপভোগ করেন। নায়ক নায়িকার যে মাধুর্য্যরস তাহাও তোমারই পানে প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া না পায়, ততক্ষণ তাহার কোনও সার্থকতা হয় না। যখনি তুমি নায়ক নায়িকারূপে আপনাকে প্রকাশিত কর, তখনি তাহাদের প্রেমালিঙ্গন ধন্য হয়। তাহারা হাসি অশ্রুজলে, চুম্বনে, পরশে, তোমারই মাধুর্য্যরসের অপার আনন্দ সম্ভোগ করে। সকল সখ্যের তুমি আশ্রয়, সকল দাস্যের তুমি যে প্রভু। যতক্ষণ তুমি সখারূপে, প্রভুরূপে না দেখা দাও, ততক্ষণ তাহারা "কই সখা,—কই প্রভু" বলিয়া এই সংসার-অরণ্যে কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তুমিই তাহাদের সখ্য ও দাস্যকে সার্থক করিয়া তোল।

সকল জীবের তুমি একমাত্র আশ্রয়, সকল নরের তুমি সমষ্টি, সকল নরসমাজের তুমি ব্যষ্টি, সকল জাতির তুমিই জাতীশ্বর। তুমিই বিশ্ব-মানব,—অতীত মানব তোমারই বুকে লুকাইয়া আছে, বর্ত্তমান মানব তোমারই জীবন আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করিতেছে; আর মানব যাহা হইবে, তাহার সমুদায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এক অপূর্ব্ব অসংখ্য-দল পদ্মের মত তোমারই বক্ষে ফুটিয়া আছে। তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; তুমিই সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; অনাদি তুমি, আদি তুমি, অনন্ত তুমি, শান্ত তুমি। তুমিই **নরনারায়ণ।**

নরনারায়ণ।

তুমি যেমন জীবের অবলম্বন, জীবও যে তেমনি তোমার অবলম্বন। প্রভো! জীব ছাড়াও তোমার চলে না। লীলাপ্রয়োজন হেতুই ত

তুমি জীবকে তোমার বক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দিলে। সে জীব ছাড়া তোমার লীলা সম্ভব হয় না। তুমি নিত্যই এক, আর নিত্যই দুই হইয়া আপনার মধ্যে লীলা কর। তুমি এক হইয়াও লীলারসে বিভোর হইয়া অনন্তরূপ ধরিয়া বিশ্বসংসারে বিচরণ কর। তুমি যখনি তোমার বিশ্ববীণার ঝঙ্কার দেও, তখনি সকল বিশ্বের কবি গান গাহিয়া উঠে। কা'র সে সঙ্গীত, প্রভো! তুমি ছাড়া কেই বা তাহা সম্ভোগ করে? তুমি পিতা হইয়া, মাতা হইয়া স্নেহদান কর, আবার তুমিই সন্তান হইয়া সে স্নেহের দাবী কর। তুমি প্রভু হইয়া দাসকে স্নেহে আবদ্ধ কর, আবার তুমিই দাস হইয়া প্রভুকে প্রাণের ভক্তি অর্পণ কর। তুমি সখা হইয়া সখ্যরস ঢালিয়া দাও, আবার তুমিই সে রস সম্ভোগ কর। তুমি ধনী হইয়া দান কর, ভিখারী হইয়া গ্রহণ কর। তুমিই নায়ক-নায়িকা হইয়া প্রেমলীলার অভিনয় কর। তুমিই তাহাদের বাহুপাশ হইতে আলিঙ্গন কাড়িয়া লও, তাহাদের ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে প্রেমচুম্বন চুরি করিয়া আস্বাদ কর।

সকল ভোগ্যের তুমিই ভোক্তা, সকল রসের তুমিই আস্বাদনকারী। আমাদের সকল কর্ম্মের তুমি কর্ত্তা, সকল ধর্ম্মের তুমি ধাতা, সকল বিধির তুমি বিধাতা। অনন্ত তোমার লীলা, হে অনন্তরূপী নারায়ণ! তোমার কথা যখন ভাবি, অতীতের সমস্ত যবনিকা উত্তোলিত হয়, তখন বুঝিতে পারি, ইতিহাস শুধু তোমারই লীলাপরিপূর্ণ পুণ্যকাহিনী। সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব আর তুমি, তুমি আর জীব। তুমি এক, তুমিই দুই—এই দুই মিলিয়াই তুমি এক। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য। ইহাতেই বিশ্বের নিখিল রস-স্ফূর্ত্তি। ধন্য জীব, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার লীলা! নমস্তে নারায়ণ!

বিবাদভঞ্জন।

(রাজা রামমোহন রায়)।

পূর্ব্বপক্ষ পরপক্ষ কর নিরীক্ষণ।
পক্ষপাত শূন্য হয়ে কহিবে বচন॥

এক স্থানে এক মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকে পথের সহিত সংলগ্ন, ঐ মূর্ত্তির হস্তে একখান ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখে স্বর্ণময় এবং পশ্চাৎ রৌপ্যময়।

এক দিন দৈবাৎ দুই জন ঘোড়সওয়ার দুই দিক হইতে ঐ মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে, এই ঢাল স্বর্ণময়, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তির অন্যদিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, এ কি স্বর্ণঢাল? যদি তোমার চক্ষু থাকে, তবে এ ঢাল রৌপ্যময়। প্রথম ব্যক্তি কহিল যে, যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়া থাকি, তবে এ অবশ্য স্বর্ণঢাল। দ্বিতীয় তাহাকে উপহাসপূর্ব্বক কহিল যে, এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণঢাল রাখিবেক বটে; আশ্চর্য্য এই যে, পথিকেরা কেন রৌপ্যঢাল লইয়া যায় নাই? যে হেতুক ইহার উপরে যে লিখিত আছে, তাহার দ্বারা জানা যায় যে, এই ঢাল তিন শত বৎসর এখানে আছে। স্বর্ণঢালবাদী দ্বিতীয় ব্যক্তির উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে দুই জন আপন আপন ঘোটক ফিরাইয়া ধাবনোপযুক্ত আয়ত স্থানে গেল ও আপন আপন অস্ত্র লইয়া পরস্পর আক্রমণ করিল। তাহাতে উভয়কে এমত আঘাত লাগিল যে, দুই জন আঘাতী কাতর হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিল। এই কালে এক জন অতি

শিষ্ট মনুষ্য পথে যাইতেছিল, সে তাহাদিগকে সেরূপ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত দেখিল ; সে ব্যক্তি বনৌষধিতে পণ্ডিত ছিল ও আপনি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল, সে ঔষধ তাহার সহিত ছিল, তাহা তাহাদের ক্ষত স্থানে লাগাইয়া তাহাদিগকে সজীব করিল। যখন তাহারা কিঞ্চিত সুস্থ হইল, তখন সে তাহাদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এক জন বলিল যে, এই ঘোড়সওয়ার কহে যে, এই ঢাল রৌপ্যময়। দ্বিতীয় কহিল যে, এই ব্যক্তি কহে যে, ঢাল স্বর্ণের, একি চমৎকার! তখন সে পথিক খেদ করিয়া কহিল যে, হায়! হে ভ্রাতারা! তোমরা দুইজন সত্য বুঝিয়াছ ও দুই জনই মিথ্যা বুঝিয়াছ, তোমরা একজনও যদি আপনার অদৃষ্ট দিক্ দেখিতে, তবে এত ক্রোধ ও রক্তারক্তি হইত না ; যেহেতুক, এই ঢালের এক দিকে স্বর্ণ ও অন্য দিকে রৌপ্য আছে। অতএব অদ্য তোমাদের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, ইহার দ্বারা তোমরা শিক্ষিত হও যে, তোমরা কোন বিষয়ের দুই দিক না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না ; অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী এ উভয়ের যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝিয়া এক পক্ষের প্রশংসা এবং অন্য পক্ষের নিন্দা করা, মহতের নিকট কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হয়।

আকবর শাহ।

(শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত)।

চাঘটাই মোগল বাবর শাহ অনুর্ব্বর সমরখণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসিহস্তে স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং পাঠান জাতীয় লোদি-বংশের বিলোপ সাধন করিয়া মোসলমান রাজশক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লীর

সিংহাসন অধিকার করেন। বাবর পরলোকগত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ূন রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যলাভের পর অল্পকাল মধ্যেই পাঠান জাতীয় সেরশাহ ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিলেন; সে ঝটিকার প্রবলবেগে হুমায়ূনের মস্তক হইতে রাজমুকুট নিক্ষিপ্ত হইল। মোগলশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া সেরশাহ পাঠান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। হুমায়ূন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেরশাহের উত্তরাধিকারিগণের অবিমৃষ্যকারিতায় হিন্দুস্থান তাঁহাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইল। হুমায়ূন পুনর্ব্বার দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন। তাহার পর দুই দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই তিনি অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন; হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এমন সময় কিশোর বয়স্ক আকবর কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। আকবর নিরবলম্ব দুর্ব্বল রাজ্যের অধিকারী হইলেন। এই নিরবলম্ব দুর্ব্বল রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি কীর্ত্তিমন্দিরে স্থানলাভ করিয়াছেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী নানাবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বংশানুক্রম—গুণবত্তার প্রধান কারণ।

তৈমুর-বংশের জ্ঞানানুরাগ ও মহত্ত্ব।

আকবর শাহের রাজোচিত গুণগ্রাম অসাধারণ ছিল। তিনি যে সকল কারণের সমবায়ে তাদৃশ মানসিক বৈভবের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আলোচনার যোগ্য। আকবরের পূর্ব্বপুরুষগণের শৌর্য্যবীর্য্য, জ্ঞানানুরাগ ও মহত্ত্ব তাঁহাতে উত্তরাধিকারক্রমে অর্পিত হইয়াছিল।

তৈমুর বংশীয় নরপতিগণ সাধারণতঃ পাঠক সমাজে বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা এবং বীরবাহু যোদ্ধা বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানানুরাগ এবং প্রজাহিতৈষণাও নিরতিশয় প্রবল ছিল। পৃথিবীর অল্পসংখ্যক নরপতিই তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞানলিপ্সু ও পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন। তৈমুরলঙ্গ সমরখণ্ড ও বোখারায় বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎসমুদয়ের পরিচালনার্থ প্রচুর ধন ন্যস্ত করেন; উত্তরকালে এই দুই স্থান মোস্‌লেম জগতের জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তৈমুরলঙ্গই তাদৃশ উন্নতির সূত্রপাত করেন। তাঁহার আদেশে বা ঔদাসীন্যে দেশবিজয়-অন্তে সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ নরনারীর রক্তে বসুধা কলঙ্কিত হইত। কিন্তু তিনি বিদ্বজ্জনের প্রাণরক্ষার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। একবার মহাকবি হাফেজ তাঁহাকে কটু কথা কহেন; কিন্তু তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বে মুগ্ধ ছিলেন বলিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহচর্য্যই তৈমুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর ছিল।

তৈমুরের উত্তরাধিকারিগণ সুবিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রবল জ্ঞানানুরাগও লাভ করেন। তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহরুক পিতার ন্যায় শৌর্য্যবীর্য্যশালী ও জ্ঞানলিপ্সু ছিলেন। কিন্তু তিনি ন্যায়নিষ্ঠা ও দয়াধর্ম্মের জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দেশবিজয়জনিত গৌরব লাভ তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষা ও সমৃদ্ধি বিস্তার করিবার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। শাহরুক স্বীয় পুত্র উলুগবেগকে তুর্কিস্থানের শাসনভার অর্পণ করিবার সময় বলেন,—"বৎস, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আত্মসুখের জন্য আমাদিগকে ক্ষমতাশালী করেন নাই। দুঃস্থ ব্যক্তিদের কষ্টমোচনে নিরত হওয়া আবশ্যক; ইহাই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট

উপায়। * * * বিচারকগণ যাহাতে স্ব স্ব পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ন্যায়-বিচার করেন, তজ্জন্য মনোযোগী হইও, বিশেষভাবে কৃষককুলকে রক্ষা করিও, তাহাদিগকে রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্ম্মচারিগণের উৎপীড়ন ও অর্থলালসা হইতে রক্ষা করিতে যত্নশীল থাকিও।”

তৈমুরের বীরত্ব ও জ্ঞানানুরাগ এবং শাহরুকের মহত্ব ও প্রজাহিতৈষণা পরবর্ত্তী নরপতিগণের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হইত। তৈমুরের অন্যতম প্রপৌত্রের নাম আবুসৈয়দ ; আবুল ফজল তাঁহাকে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তদীয় পুত্র ওমর শেখ মিরজা ন্যায়পরায়ণ বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ওমরের পুত্র বাবর অতুল শৌর্য্যবীর্য্য, প্রবল জ্ঞানানুরাগ ও নির্ম্মল মহত্ত্বের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

পিতামাতা।

হুমায়ূনও পিতার ন্যায় মানসিক গুণরাজির অধিকারী ছিলেন, তিনি ঘোর বিপদের সময়েও কবি, লেখক ও পণ্ডিতগণে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। অঙ্ক এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থালয় তাঁহার জ্ঞানপিপাসার সাক্ষ্যদান করিত।

কিন্তু তাদৃশ মানসিক গুণরাজির অনুরূপ রাজনীতিজ্ঞতা ও শাসন-কুশলতা তাঁহার ছিল না। এ কারণ তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বিধির বিড়ম্বনায় নানাস্থানে ঘূর্ণিত হইতে থাকেন। হুমায়ূন এই সময় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিন্দালের শিক্ষকের কন্যা হামিদাবানুকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের সুমধুর ফল আকবর। হুমায়ূন সুন্নি ছিলেন। হামিদা শিয়া মতাবলম্বিনী ছিলেন। পরস্পর বিরোধী সুন্নি এবং শিয়া মত সম্মিলিত হইয়া যে ফলপ্রসব করে, তাহাকে মূর্ত্তিমান্ ঔদার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আকবর যে সময় জন্ম গ্রহণ করেন, তখন হুমায়ূনের চতুর্দ্দিকে বিপদ্ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া আকবর, সার্দ্ধ এক বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতামাতার স্নেহ-কোমল আশ্রয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন। পিতৃবৈরী পিতৃব্য কামরান তাঁহাকে হস্তগত করেন। আকবরের শৈশবকাল তাঁহার বিদ্বেষ-কঠোর আশ্রয়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। এখানে তিনি বহু ক্লেশ ও দুর্গতির মধ্যে বর্দ্ধিত হন; অনেকবার তাঁহার জীবন বিপদসঙ্কুল হইয়াছিল। আকবর কিঞ্চিদধিক সপ্তবর্ষকাল পর্য্যন্ত অশেষ কষ্টভোগ করেন এবং পুনঃপুনঃ নানারূপ বিপদে পতিত হন। ফলতঃ তাঁহার শৈশবকাল সুখৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে অতিবাহিত হয় নাই, ধনমদ ও চাটুবাদ তাঁহার চিত্তকে মলিন করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হয় নাই। আকবর নানা প্রতিকূলাবস্থায় লালিত পালিত হইয়া বর্ষাধৌত বিকচ পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুট হইয়া উঠেন।

আকবর বাল্যকালে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক নিজাম উদ্দীন আহম্মদ লিখিয়াছেন যে, তৈমুর বংশের প্রথানুসারে চারি বৎসর, চারি মাস, চারি দিন বয়ঃক্রম কালে আকবরের বিদ্যারম্ভ হয়। শুভক্ষণে তাঁহার "হাতে খড়ি" হইবার কথা ছিল। কিন্তু শুভক্ষণ সমাগত হইলে তিনি বালসুলভ চপলতাবশতঃ লুক্কায়িত হন; তাঁহাকে বহু অনুসন্ধানেও সময় মত পাওয়া যায় নাই। একারণ তাঁহার বিদ্যাভ্যাস সন্তোষজনক হইবে না বলিয়া সকলের বিশ্বাস জন্মে। মৌলনা আজাম উদ্দীন তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে নিযুক্ত হন। আজাম উদ্দীনের শিক্ষাদানের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তখন তৎপদে মৌলানা বায়েজিদকে নিযুক্ত করা হয়। ইহার কিছুদিন পরে মুনিম খাঁ রাজশিক্ষক নিযুক্ত হন। মুনিম খাঁ রাজকুমারকে রাজকার্য্যনির্ব্বাহোপযোগিনী শিক্ষা প্রদান করেন। এই সময় তিনি অশ্বে আরোহণ এবং বিবিধ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন।

হুমায়ূনের পরলোক গমনের পর বৈরাম খাঁ তাঁহার রাজকার্য্যনির্ব্বাহোপযোগিনী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই; তিনি তাঁহার মানসিক উৎকর্ষ সাধনজন্যও সমুচিত বন্দোবস্ত করেন। বৈরাম খাঁ নিজে জ্ঞানানুরাগী ছিলেন, তিনিও তাঁহার স্বর্গগত প্রভু হুমায়ূনের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ পণ্ডিত মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার প্রতিনিধিত্বের সময় দিল্লীর রাজদরবার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের বিদ্বজ্জনে পূর্ণ থাকিত। বৈরাম খাঁ এই পণ্ডিতশ্রেণী হইতে সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক মির আবদুল লতিফকে রাজশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আবদুল লতিফ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোন কারণে তত্রত্য অধিপতির বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। এজন্য তিনি দিল্লীর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। গুণগ্রাহী হুমায়ূন তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন। তদনুসারে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পরেই হুমায়ূন পরলোকগত হয়েন। তারপর বৈরাম খাঁ তাঁহাকে নবীন সম্রাটের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শিক্ষকের নিকট আকবর সবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রহেলিকাপূর্ণ গজলগুলি পাঠ করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন। এই সময় তিনি হাফেজের সুমধুর পদাবলী কণ্ঠস্থ করেন। প্রথম শিক্ষাই মনুষ্যের হৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে, এজন্য সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আকবর উত্তরকালে যে অসাধারণ সমদর্শিতা ও মনস্বিতার পরিচয় দেন, তাহার মূল তিনি আবদুল লতিফের সমীপেই প্রাপ্ত হন। আবদুল লতিফ মহামতি ছিলেন, "সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন" তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত এরূপ সংযত ও উদার ছিল যে, পারস্যের অধিবাসীরা তাঁহাকে

সুন্নি ও হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা তাঁহাকে শিয়া বলিয়া মনে করিত। কিন্তু তিনি সুন্নি কিংবা শিয়া, কোন মতাবলম্বীই ছিলেন না। তাঁহার তেজস্বিনী প্রকৃতি কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না। আবদুল লতিফ সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রিয়বিকারনির্ম্মুক্ত বিবেকবাণীকেই স্বীয় জীবনের নিয়ামক করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশসমূহ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল; আকবর স্বভাবতঃ জ্ঞানার্জ্জনে অনুরাগী ছিলেন, এবং সৎসঙ্গে বাসনিবন্ধন তাঁহার সে জ্ঞানস্পৃহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

আকবর চরিত্রে দৃঢ়তা ও কোমলতা।

আকবরের হৃদয় একাধারে পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও রমণীসুলভ কোমলতায় সুগঠিত হইয়াছিল। কিশোরবয়স্ক আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় হিন্দুকুলোদ্ভব হিমু সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে তুমুল বাত্যা তুলেন, তাহাতে আকবরের মস্তক হইতে রাজমুকুট দূরে নিক্ষিপ্ত হইবার উপক্রম হয়। পিতৃসুহৃদ্ বৈরাম খাঁ হিমুকে রণক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আকবরের সন্নিধানে আনয়ন করেন। বৈরাম খাঁ শত্রুর শিরশ্ছেদন করিবার জন্য আকবরকে বারংবার উত্তেজিত করেন। কিন্তু আকবর আপনার প্রধান অবলম্বন পিতৃতুল্য সুহৃদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাদৃশ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং বৈরাম খাঁ সে জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি আপন সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই। আকবরের হৃদয় একান্ত কোমল ছিল। পশু পক্ষীর যন্ত্রণাতেও তিনি কাতর হইয়া পড়িতেন। একদা তাঁহার পুত্র সেলিম এক ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ হইতে জীবদ্দশায় চামড়া তুলিয়া লইবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। আকবর

এই আদেশের বিষয় অবগত হইয়া বলেন, "মৃত পশুর চর্ম্ম তুলিবার দৃশ্যও আমাকে ব্যথিত করে। আমার পুত্র হইয়া সেলিম কিরূপে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করিয়াছে?" যদিও আকবর নিতান্ত কোমল-হৃদয় ছিলেন, তথাপি তিনি আবশ্যকমত কঠোরহস্তে ন্যায়দণ্ড পরিচালন করিতে পারিতেন। আকবর ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তারূপে জনসমাজে বরেণ্য ছিলেন। আকবর বিলাসবিমুখ, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী ছিলেন। "সমরক্ষেত্রের কোলাহলে ও কষ্টে তাঁহার যে আনন্দ ছিল, দিল্লী আগ্রার মর্ম্মরময় রত্নমণ্ডিত রাজকক্ষেও তিনি সেই আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি প্রত্যহ দুইশত লোকের জন্য মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করাইতেন। নিজে কয়েক মুষ্টিমাত্র আহার করিয়া অবশিষ্ট আগ্রা দুর্গের প্রাচীরপার্শ্বে সমবেত দরিদ্রদের ধরিয়া দিতেন। এই হিন্দুর দেশে রাজত্ব করিতে হইলে যে গুণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, আকবর তাহাতেও ভূষিত ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল। তিনি কখনও পরধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। আকবরের রাজনীতি উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি বলিতেন, অসত্যাচরণ সকলের পক্ষে গর্হিত। রাজাকে ঈশ্বরের ছায়া বলে, ছায়া সরল থাকিবে।

উদার শাসননীতি।

ফলতঃ আকবর কি বংশগৌরব, কি শৌর্য্যবীর্য্য, কি সুশিক্ষা ও মহত্ত্ব, সর্ব্বপ্রকারেই প্রজাপুঞ্জের হৃদয় অধিকার করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। পাদশাহ সমগ্র ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জ ও রাজবৃন্দকে প্রীতির মোহনমন্ত্রে সম্মিলন-সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে মনন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ খণ্ড রাজ্যসমূহ জয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্র

করিতে সংকল্প করিলেন ; এজন্য বহুল পরিমাণে হিন্দুর বাহুবল প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবৃন্দ ও প্রকৃতি-পুঞ্জের মঙ্গলবিধায়ক বিধানসমূহ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আকবর উজবেগ, পাঠান, হিন্দু, পারসীক, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় যোদ্ধা-দিগকে সমরবিভাগে গুণানুসারে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। আকবর আপনার সেনাপতিদিগকে বিজিত শত্রুর স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত অথবা দাসবিপণীতে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বহু অর্থাগমের পথস্বরূপ যাত্রিকর তুলিয়া দিলেন। এইরূপ নানাবিধ সুনিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। আকবর গুজরাটের শাসনকর্ত্তাকে একখানি আদেশপত্রে প্রাণদণ্ড, বেত্রদণ্ড ও লৌহদণ্ড ব্যতীত অন্য কোন প্রকার দণ্ড বিধান করিতে নিষেধ করেন। একমাত্র প্রবল রাজদ্রোহ ব্যতীত অন্য প্রকার অপরাধে প্রাণদণ্ড বিধান নিষিদ্ধ ছিল। প্রাণদণ্ড বিধান আবশ্যক হইলে পাদশাহের নিকট সমস্ত কাগজ-পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। প্রাণদণ্ড দিবার সময় বিকলাঙ্গ করা অথবা অন্য কোন প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ করা নিষিদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে বৃত্তিস্বরূপ নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে জায়গীর প্রদান করিবার প্রথা ছিল। এই প্রথার ফলে সৈন্যাধ্যক্ষগণ আপন আপন জায়গীরে যথেচ্ছভাবে কর আদায় করিয়া প্রজাপীড়ন করিতেন। এই কারণ আকবর উক্ত প্রথা পরিবর্ত্তিত করিয়া নগদ অর্থ দিবার নিয়ম প্রচলিত করেন। আকবর শাহের আদেশে রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এই নূতন বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্ম্মচারীদের শঠতার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। আকবর সুনিয়মিত বিধান দ্বারা রাজস্বের উন্নতি সাধন করিয়া নানাবিধ রাজপ্রাপ্য ও আমলান-প্রাপ্য কর তুলিয়া দেন। এই কারণ, বর্দ্ধিত রাজস্ব

নিবন্ধন প্রকৃতিপুঞ্জ ক্লিষ্ট হয় নাই। পাদশাহ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য শুল্ক এবং জলকরের পরিমাণ লঘু করিয়া দিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্য-গৌরব।

আকবর শাহ রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সুনিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। রাজ্যজয় ব্যাপারেও পাদশাহ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। আকবর বন্ধুবৎসল ছিলেন। বিশিষ্ট রাজপুরুষগণ তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। প্রীতির আস্পদ সম্রাটের কার্য্যে প্রাণপাত করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। আকবর প্রভুভক্ত, বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ অমাত্যবর্গ লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কর্ম্মনায়কের ক্ষিপ্রকারিতা এবং রণচাতুর্য্যে গুজরাট রাজ্যে, বিহার প্রদেশে, বঙ্গভূমিতে ও উড়িষ্যা দেশে মোগলের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

আকবর প্রজাহিতকর বিধান সকল প্রবর্ত্তন করিয়া এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান একচ্ছত্র করিয়া "প্রদীপ্ত যশঃপ্রভায় দীপ্তিসম্পন্ন" হইলেন। মোগল সম্রাটের গৌরব সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। "দূরদূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া" মোগলের সিংহাসনতলে ভক্তি ও প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল।

অন্তিম কাল।

আকবর শাহ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল এইরূপ প্রবল প্রতাপ ও সুশাসনে রাজত্ব করিয়া দারুণ ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তৎকালের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভিষক্ হাকিম আলী রাজচিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। চিকিৎসকের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল, পাদশাহের মৃত্যু আসন্ন হইল; তিনি অন্তিম-কালে রাজসভার সমস্ত ওমরাহকে শয়নকক্ষে আনয়ন করিবার জন্য



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রাজকুমার সেলিমকে ইঙ্গিত করিলেন। ওমরাহগণ সমবেত হইলে পাদশাহ তাঁহাদের নিকট সময়োপযোগী বাক্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের কাহাকেও মনঃকষ্ট দিয়া থাকিলে তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। ইহার পর সেলিম পাদশাহের পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। পাদশাহ সেলিমকে স্বীয় প্রিয় তরবারি গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অনন্তর পাদশাহের আদেশে সেলিম রাজপরিবার-ভুক্ত মহিলাবর্গের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে এবং তদীয় পুরাতন বন্ধুদিগকে প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। আকবর সেলিমকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। "ঈশ্বর তাঁহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন,—ঈশ্বরের নিকটেই তিনি প্রত্যাগমন করিলেন।"

অশ্বমেধ যজ্ঞ।

(স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব, শ্রবণমাত্র সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি; অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পূর্ব্বতন কোনও নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোক যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, যে যে বিষয়ের

অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই ; রাজকর্ত্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধ মাত্র অবশিষ্ট আছে ; তাহা সম্পাদিত হইলেই, আপনকার রাজ্যাধিকার আর কোনও অংশে অঙ্গহীন থাকে না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিব। যাহা হউক, যখন মহারাজ স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে ; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের আদেশ প্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র, রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! ইনি যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলে ; এক্ষণে, তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই, কর্ত্তব্য নিরূপণ করি। আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুজেরা, তৎক্ষণাৎ আন্তরিক অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন। তখন রাম বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতাবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনার কি অনুমতি হয়। বশিষ্ঠদেব তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর, রামচন্দ্র অনুজদিগকে বলিলেন, দেখ, যখন কর্ত্তব্য স্থির হইল, তখন আর অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে। তোমরা সত্বর সমস্ত আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগের নিমন্ত্রণ কর। সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক, সমস্ত নগরে ও জনপদে এ বিষয়ের ঘোষণা করিয়া দাও। লঙ্কাসমরসহায় সুহৃদ্বর্গের পরম সমাদরে আহ্বান কর, তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্যে অকাতরে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন ; তাঁহারা আসিলে আমি পরম সুখী হইব।

এতদ্ব্যতিরিক্ত, যাবতীয় ঋষিদিগের নিমন্ত্রণ কর; তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত! তুমি অবিলম্বে নৈমিষক্ষেত্রে গিয়া, যজ্ঞভূমিনির্ম্মাণের উদ্যোগ কর। লক্ষ্মণ! তুমি, আবশ্যকমত সমস্ত দ্রব্যের যথোচিত আয়োজন করিয়া, তৎসমুদয় সত্বর তথায় পাঠাইয়া দাও। দেখ, যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্তে, নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক, অতএব, যত্নপূর্ব্বক, সমস্ত বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন, কোনও বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন, কাহারও কোন অংশে ক্লেশ বা অসুবিধা না ঘটে। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী; তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, বশিষ্ঠদেব বলিলেন, মহারাজ! সকল বিষয়েরই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি এক বিষয়ের একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম বলিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতির আশঙ্কা করিতেছেন বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা বলেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব, জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি ব্যবস্থা হইবেক। শ্রবণমাত্র রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি, কিয়ৎক্ষণ অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নয়নের অশ্রুমার্জ্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিয়া বলিলেন, ভগবন্! ইতঃপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধমাত্র হয় নাই; এক্ষণে, কি কর্ত্তব্য, উপদেশ করুন্। বশিষ্ঠদেব, অনেকক্ষণ একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া বলিলেন, মহারাজ! পুনরায় দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে, আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, সকলেই এককালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ; কেবল লোক-

বিরাগসংগ্রহভয়ে সীতাকে বনবাস দিয়া জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল; এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। সীতার মোহিনী মূর্ত্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে উপস্থিত কার্য্যের অনুরোধে, পুনরায় দারপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দারপরিগ্রহ বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র, সে বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শিত করিয়া, মৌনভাবে, অবনত বদনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর, সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ভরত সর্ব্বাগ্রে নৈমিষক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন; এবং সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমির নিরূপণ করিয়া, অনুরূপ অন্তরে, পৃথক পৃথক প্রদেশে, এক এক শ্রেণীর লোকের জন্যে, তাহাদের অবস্থোচিত অবস্থিতিস্থান নির্ম্মিত করাইলেন। লক্ষ্মণও, অনতিবিলম্বে, অশেষবিধ অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী ও শয্যাযান প্রভৃতির সমবধান করিয়া, যজ্ঞক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্বের মোচন পূর্ব্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে, সসৈন্য নৈমিষারণ্য প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে লাগিল। শত শত নৃপতি, বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া, অনুচরগণ ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন; সহস্র সহস্র ঋষি, যজ্ঞদর্শনমানসে, ক্রমে ক্রমে, নৈমিষে আগমন করিতে লাগিলেন; অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন

নরপতিগণের পরিচর্য্যার ভারগ্রহণ করিলেন; বিভীষণ ঋষিগণের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, সুগ্রীব অপরাপর নিমন্ত্রিতবর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

এ দিকে, মহর্ষি বাল্মীকি, সীতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ দেখিয়া মনে মনে সর্ব্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিতা থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না; আর, কুশ ও লব, রাজাধিরাজ তনয় হইয়া, যাবজ্জীবন তপোবনে কালযাপন করিবেক, ইহাও কোনও মতে উচিত নহে, তাহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম, এ উভয়ের শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব, যাহাতে সপুত্রা সীতা পুনরায় পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোনও উপায় উদ্ভাবিত করা আবশ্যক। অথবা অন্য উপায় উদ্ভাবিত করিবার প্রয়োজন কি? শিষ্য দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাইয়া, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুত্রা সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। এই স্থির করিয়া, ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া, মহর্ষি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয়; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, পূর্ণগর্ভা অবস্থায়, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীরে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; এখন, আমার কথায়, তাঁহারে সহজে গৃহে লইবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কোনও সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনও মতে উচিতকল্প হইতেছে না। এই দুই বালক, উত্তরকালে, অবশ্যই কোশলসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেক; এই সময়ে, পিতৃসমীপে নীত হইয়া, রাজনীতি বিষয়ে বিধি পূর্ব্বক উপদিষ্ট না হইলে, রাজকার্য্যনির্ব্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্য্যাদারক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেক। বিশেষতঃ, রাজা রামচন্দ্র, আমি কোশলরাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন

বলিয়া, অনুযোগও করিতে পারেন। অতএব, এ বিষয়ে আর উপেক্ষা বা কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ পাঠান উচিত। অথবা, একবারেই তাঁহার নিকটে সংবাদ না পাঠাইয়া, বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য; তাঁহারাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

এক দিন, মহর্ষি, সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধির সমাধান করিয়া, আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে, এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত নিমন্ত্রণপত্র তদীয় হস্তে সমর্পণ করিল। মহর্ষি, পত্রপাঠ করিয়া, পরমপ্রীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক, সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্তে বিদায় দিলেন; এবং এক শিষ্যের উপর তাহার আহারাদিসমাধানের ভারপ্রদান করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তাহার সিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে, বিনা প্রার্থনায়, কার্য্যসাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই। রামের ও উহাদের দুই সহোদরের আকৃতি-গত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে উহাদিগকে তাঁহার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক; আর, অবলোকনমাত্র, রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবেক; এবং তাহা হইলেই আমার অভিপ্রেত সিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন; কল্য প্রত্যুষে প্রস্থান করিব মানস করিয়াছি; অপরাপর শিষ্যের ন্যায়, তোমার পুত্রদিগকেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। সীতা তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন।

মহর্ষি, স্বীয় কুটীরে প্রতিগমন করিয়া, শিষ্যদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়া দিলেন; এবং কুশ ও লবকে বলিলেন, দেখ, এ পর্য্যন্ত জনপদের কোনও ব্যাপার তোমাদের নয়নগোচর হয় নাই; রামায়ণনায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবেক; এবং তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া, তোমরা অনেক অংশে, লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। তাহারা দুই সহোদরে, রামায়ণে রামের অলৌকিক গুণপরম্পরার প্রকৃষ্ট ও প্রচুর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া, তাহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। এতদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞসংক্রান্ত মহাসমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্ন প্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম নয়নগোচর করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া, সীতার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই, তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এ পর্য্যন্ত, রাম সীতাগতপ্রাণ বলিয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর, তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, রাম তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবার্ত্তা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, রাম আবার বিবাহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া, তিনি একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগ-দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন; রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ক্ষোভ, সেই সীতার পক্ষে, একান্ত অসহ্য

হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার উপর তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কোনও অংশে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই, এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা, নিতান্ত আকুল চিত্তে, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, কুশ ও লব তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, মা! মহর্ষি বলিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞদর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া, রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা, যার পর নাই, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজা-রঞ্জনের অনুরোধে, নিজ প্রেয়সী মহিষীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তখন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সহধর্ম্মিণী কে হইবেক। সে বলিল, যজ্ঞসমাধানের জন্যে বশিষ্ঠদেব পুনরায় দারপরিগ্রহের নিমিত্তে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হন নাই; সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে; সেই প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিণীর কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেক। দেখ, মা! এমন মহাপুরুষ কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র রাজধর্ম্মপ্রতিপালনে যেমন যত্নশীল, দাম্পত্যধর্ম্মপ্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা, ইতিহাসগ্রন্থে, অনেক অনেক রাজার ও অনেক

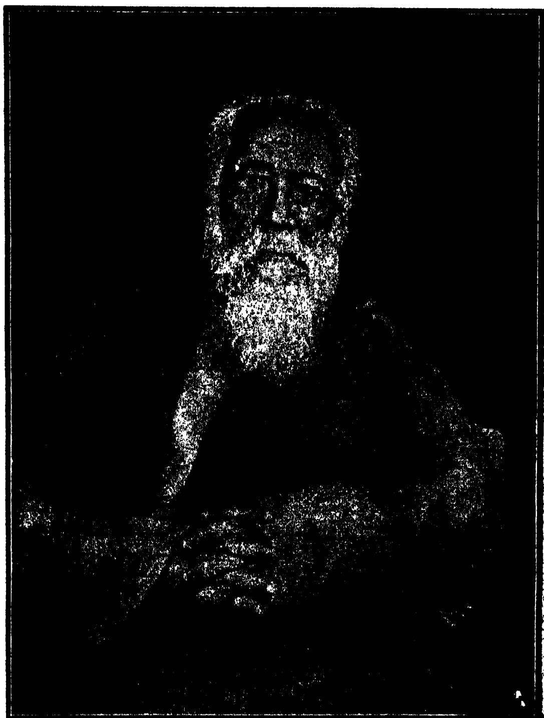
অনেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি; কিন্তু কেহই, কোনও অংশে, রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রেয়সীর পরিত্যাগ ও সেই প্রেয়সীর স্নেহের অনুরোধে, যাবজ্জীবন দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা হউক, মা! রামায়ণ পড়িয়া অবধি আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল, একবার রাজা রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিব; এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে; অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই"। সীতা অনুমতিপ্রদান করিলেন, তাহারাও দুই সহোদরে, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, মহর্ষিসমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিয়া, যে অতি বিষম বিষাদবিষে সীতার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণগোচর করিয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত, এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্ব্বাপিত হইল। তখন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল, এবং নির্ব্বাসনের ক্ষোভ তিরোহিত হইয়া, তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য-গর্ব্ব আবির্ভূত হইল।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, মহর্ষি বাল্মীকি কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে, নৈমিষপ্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস, অপরাহ্ণ সময়ে, তথায় উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠদেব, সাতিশয় সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। কুশ ও লব, দূর হইতে রামচন্দ্রকে লোচনগোচর করিয়া চমৎকৃত ও পুলকিত হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, দেখ ভাই! রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ইঁহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে; দেখিলেই, অলৌকিক গুণসমুদয়ের

অসাধারণ আধার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনই গম্ভীরাকৃতি। আমাদের গুরুদেব যেমন অলৌকিক কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলৌকিক গুণসমুদয়ে পূর্ণ। বলিতে কি, এরূপ মহাপুরুষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত না হইলে, মহর্ষির প্রণীত মহাকাব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণের পরিকীর্ত্তনে নিয়োজিত হওয়াতে, তদীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা জন্মিয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমঁরা নয়নের চরিতার্থতা লাভ করিলাম।

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে, নিরূপিত দিবসে, মহাসমারোহে, স' ল্পিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীন, দরিদ্র ও অনাথ পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনায়, যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্নার্থী অপর্য্যাপ্ত অন্ন, অর্থাভিলাষী প্রার্থনাধিক অর্থ, ভূমিকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষাতিরিক্ত ভূমি, প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমনমাত্র তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত, চতুর্দ্দিকে নৃত্য, গীত, বাদ্য হইতে লাগিল। সকলেই মনোহর বেশ ভূষায় সুশোভিত। সকলেরই মুখে আমোদের ও আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল, কাহারও অন্তঃকরণে দুঃখের বা ক্ষোভের সঞ্চার আছে, এরূপ বোধ হইল না। যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি বা অন্যাদৃশ লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমরা কখনও এরূপ যজ্ঞ দেখি নাই। অতীতবেদী ব্যক্তিরাও বলিতে লাগিলেন, কোনকালে, কোনও রাজা, ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ সহকারে, যজ্ঞ করিতে পারেন নাই; রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতৃদেব।

(স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

আমার জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমার পিতা প্রায় দেশভ্রমণেই নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে তিনি কখনো হঠাৎ বাড়ী আসিতেন ; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইয়া আসিতেন, তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঔৎসুক্য হইত। একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবী চাকর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে সমাদরটা পাইয়াছিল, তাহা স্বয়ং রণজিত সিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবী— ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জ্জুনের প্রতি যে রকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবী জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা—ইহারা কোনো কোন লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া আমরা গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম। বৌঠাকুরাণীর ঘরে একটা কাচাবরণে ঢাকা খেলার জাহাজ ছিল, তাহাতে দম দিলেই রং-করা কাপড়ের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত এবং জাহাজটা আর্গিন বাদ্যের সঙ্গে দুলিতে থাকিত। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া এই আশ্চর্য্য সামগ্রীটি বৌঠাকুরাণীর কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া প্রায় মাঝে মাঝে এই পাঞ্জাবীকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। ঘরের খাঁচায় বদ্ধ ছিলাম বলিয়া যাহা কিছু দূর-দেশের, তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেনুকে

লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণেই গাব্রিয়েল বলিয়া একটি য়িহুদী তাহার যুন্টি দেওয়া য়িহুদি-পোষাক পরিয়া যখন আতর বেচিতে আসিত, আমার মনে ভারি একটা নাড়া দিত এবং ঝোলাঝুলি ওয়ালা ঢিলা ঢালা ময়লা পায়জামাপরা বিপুলকায় কাবুলিওয়ালাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রিত রহস্যের সামগ্রী ছিল।

যাহা হউক, পিতা যখন আসিতেন, আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে দূরে তাঁহার চাকরবাকরদের মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৌতূহল মিটাইতাম। তাঁহার কাছে পৌঁছানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো এক সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়ান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তখন পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন একটা ছিদ্র পথ দিয়া যে রুশীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মত প্রকাশ পাইবে, তাহা ত বলা যায় না। এই জন্য মার মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন,—"রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্ত্তাকে একখানা চিঠি লেখ ত!" মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কি করিতে হয়, কিছুই জানি না। দফ্‌তরখানায় মহানন্দ মুন্সীর শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারী সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক

পদ্মদলে বিহার করেন, তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম, তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন—ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাস-বাণীতেও মাতার রাশিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না—কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁহাকে পত্র লিখিবার জন্য মহানন্দের দপ্তরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অস্থির হইয়া কয়েক দিন মহানন্দ খসড়া করিয়া দিল; কিন্তু মাশুলের সঙ্গতি নাই। মনে ধারণা ছিল, মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতেই হইবে না—চিঠি অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিবে। বলা বাহুল্য, মহানন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশী ছিল এবং এ চিঠিগুলি হিমাচলের শিখর পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ী ভরিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোন ক্রটি হয়, এই জন্য মা নিজে রান্না-ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্ব্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিন জনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সঙ্কলন করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারাম বাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল। মাথা মুড়াইয়া বীরবৌলি পরিয়া আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কাণের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া, ঘরের কোণে পড়িয়াছিল,—বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম, নীচের তলা দিয়া কোন চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম,—তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত। বস্তুতঃ, গুরুগৃহে ঋষিবালকদের যে ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার কথা, আমাদের ঠিক সে ভাবে কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের তপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মত ছেলে যে মিলিত না, তাহা নহে, তাহারা খুব যে বেশী ভালমানুষ ছিল তাহার প্রমাণ নাই। শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের বয়স যখন দশ বারো ছিল, তখন তাঁহারা কেবলি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান করিয়াই দিন কাটাইয়াছেন, এ কথা যদি কোনো পুরাণে লেখে, তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই,—কারণ শিশু-চরিত্র নামক পুরাণটী সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মত প্রামাণিক শাস্ত্র কোনো প্রাচীন ভাষায় লিখিত হয় নাই।

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটী জপ করার দিকে খুব

একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে, সে বয়সে উহার তাৎপর্য্য আমি ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে, আমি "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কি বুঝিতাম, কি ভাবিতাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিসটা বাজিয়া উঠে, যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিতে বলা হয়, তবে সে যাহা বলিবে, সেটা নিতান্তই একটা ছেলে মানুষী কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে, তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশী। যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান, তাঁহারা এই জিনিষটার কোনো খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে, ছেলে বেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই, কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড় দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলায় যখন ইংরেজী আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না, তখন প্রচুর ছবিওয়ালা একখানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই—নিতান্ত আবছায়া গোছের কি একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই

ছবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম,—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম, তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া তত বড় শূন্য হয় নাই। একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা, ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মত এক লাইন আর এক লাইনের সঙ্গে অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝি নাই কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল, তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, "নিভৃত নিকুঞ্জগৃহংগত যা নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং" এই লাইনটা আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্য্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝঙ্কারের মুখে "নিভৃত-নিকুঞ্জগৃহং" এই একটি মাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত, সেইটেই আমার বড় আনন্দের কাজ ছিল। যে দিন আমি "অহহ কলয়া'ম বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং"—এই পদ ি ঠিক মত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সে দিন কতই খুসী হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ ত বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাও নহে তবু সৌন্দর্য্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরো একটু বড় বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্ন শিখণ্ডিবর্হঃ।

এই শ্লোকটী পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল "মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং" এবং "কম্পিত দেবদারুঃ" এই দুইটী কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটীর রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন, তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে, বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে—এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।

নিজের বাল্যকালের কথা যিনি বেশ ভাল করিয়া স্মরণ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিবেন যে, আগা গোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন—সেই জন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড় বড় কাণভরাট করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয়, যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না, কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ খতাইয়া বিচার করেন, তাঁহারাই অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন, যাহা দেওয়া গেল, তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা, এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে, তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে, সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়—সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয়, তখন বুঝিয়া

পাইবার দুঃখের দিন আসে, কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকলের চেয়ে বড় রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাট-বাজার বন্ধ হয় না বটে, কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্ব্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।

তাই বলিতেছিলাম, গায়ত্রী মন্ত্রের কোনো তাৎপর্য্য আমি সে বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে। কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে, সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শান-বাঁধান মেজের এককোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোক ভরিয়া কেবলি জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে—আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মত এমন কোনো একটা কারণ বলিতাম, গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র

(স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু)

যখন স্কুল ও কলেজে পড়িতাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালাই তখন আমাদের "দ্বিতীয় ভাষা" ছিল।—তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজীওয়ালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন, তাহা নহে; যাহাদিগকে উহাতে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত।

বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন বঙ্কিম বাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে তিনি বাঙ্গালাভাষায় ইংরাজী ধরণের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ কথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি! এত ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালায় বহি লেখা কেন! কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কিছু ভাবি নাই। মনে বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম, তিনি ঐ রকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এইবার কিন্তু প্রথম বারের মত মনে বিস্ময়ের ভাব একেবারেই জন্মে নাই; বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। দিনকতক পরে শুনিলাম, বঙ্কিম বাবু আরও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারও কাহারও মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই চারিটা ভাষার ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিম বাবুর বিষম নিন্দা রটনা করিতেছেন। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল, বুঝি বা বঙ্কিম বাবুর জন্য কাহারও গাত্রদাহ আরব্ধ হইয়াছে। তখন 'দুর্গেশনন্দিনী',

'মৃণালিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' কিনিয়া পড়িলাম। 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের 'আইবান হো' পড়িয়া লিখিত। অনেক দিন পরে বঙ্কিম বাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,— "দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে 'আইবান হো' পড়ি নাই।" আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমিই হিন্দুপেট্রিয়টে 'দুর্গেশনন্দিনীর নিন্দা করিয়াছিলে?" আমি বলিয়াছিলাম,—"না, হিন্দুপেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম।" তিনি বলিয়াছিলেন,—"সমালোচনা অযথা হয় নাই এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে, তখন 'আইবান হো' পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়াছিলেন।"

তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম,—তাঁহার 'বঙ্গদর্শনের' গ্রাহক হইলাম। 'বঙ্গদর্শনে' 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হয়। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর, আমাদের দেশের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ, বিরক্তি ও অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন—"ঐ আবার কুন্দনন্দিনী একটা কি বাহির হইতেছে?" তেমন লোকের মুখে ওরূপ কথা শুনিয়া আমার মনঃকষ্ট হইয়াছিল—সে মনঃকষ্ট এখনও যায় নাই; বোধ হয়, কখনও যাইবে না। তেমন যশস্বী প্রতিভাশালী পণ্ডিতেও যে বঙ্কিমচন্দ্রকে গুণবান্ বলিয়া স্বীকার করেন, এরূপ মনঃকষ্ট পাইয়া যদি ইহা বুঝিতে না হইত, তাহা হইলে কত সুখের বিষয় হইত! 'বঙ্গদর্শন' পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাংলাভাষায় সকল

প্রকার কথাই সুন্দররূপে কহিতে পারা যায়; আর বুঝিয়াছিলাম, ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ, মানুষের অভাব। 'বঙ্গদর্শন' বলিয়া দিয়াছিল, "বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।"

তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিম বাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে, আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন এমন কেহ কেহ আমাকে বলিলেন, "বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।" আমি প্রাণপণে মূর্ত্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম, তখন আমার কল্পিত মূর্ত্তি লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া পড়িল, তাহার ঠিকানা রহিল না। ১২ কি ১৩ বৎসর হইল, কলিকাতায় 'কালেজ রি-ইউনিয়ন' নামে ইংরাজীওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কালেজের পুরাতন ও নব্য ছাত্রেরা বৎসরে একদিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগান বাটীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা, কথোপকথন, আলাপ-পরিচয়, জলযোগ প্রভৃতি করিতেন। শুনিতাম, এরূপ করিলে দশজনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়া একতা স্থাপনের সুবিধা হয়। এখনও শুনি যে, এইরূপ সম্মিলনাদি হইতে এরূপ সুফল লাভ করা যায়। আমি তখনও একথা বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করি না। মানুষের মত মানুষ হইলে তাহাদের সম্মিলনে সুফল ফলিতে পারে, নহিলে পারে না। আমরা ত মানুষই নহি; তথাপি ঐ 'কালেজ রি-ইউনিয়নে' যাইতাম। যাইতাম—ওরূপ কিছু মনে করিয়া নয়, যাইতাম—কৃষ্ণবন্দ্যো, রাজেন্দ্রলাল, প্যারিচাঁদ, রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কালেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস যে, অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন—সদ্ভাব সৃষ্টির বা বন্ধুত্ব বিস্তারের আকাঙ্খী হইয়া কেহ যাইতেন না।

আমি দ্বিতীয় 'কালেজ রি-ইউনিয়নে'র সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের 'জ্যেষ্ঠভ্রাতার মরকত-কুঞ্জ' নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি, এমন সময়ে একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যে প্রকারে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম, বিদ্যুৎকেও সেই প্রকারে অভ্যর্থনা করিলাম বটে, কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কে ?' শুনিলাম—'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।' আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—'আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, —আর একবার করমর্দ্দন করিতে পাইব কি ?' সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিম বাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম, হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনও আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই। আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পুড়াইতে পারে না।

সে দিন বঙ্কিম বাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্ত্তা হয় নাই; কিন্তু সন্ধ্যার পর রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের মূর্ত্তিমান্ রাগাদি দেখিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'আপনি আপনার কোন উপন্যাসখানিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করেন ?' ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া, কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন—'বিষবৃক্ষ'। তখন বোধ হয়, 'চন্দ্রশেখর' পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এক বিচিত্র ব্যাপারে আমাকে বঙ্কিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার সদরদেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল ৺কৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয়ের উইলসূত্রে হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। উইল বাঙ্গালায় লিখিত, এবং

উহার একটি বিধানের অর্থ লইয়া বিবাদ। এক পক্ষের ইচ্ছা, বঙ্কিম বাবু দ্বারা উহার অর্থ করান। বঙ্কিম বাবুকে সম্মত করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হয়। বঙ্কিম বাবুও পিতৃবন্ধু ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী সরিষাগ্রাম নিবাসী এবং ইদানীং কলিকাতার ঝামাপুকুর নিবাসী ৺রামকুমরে বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আমার ভ্রাতা দুর্গারামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি তখন হুগলীর অন্যতম ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ;—কাছারী করিতেছিলেন। শামলা মাথায় দিয়া গিয়াছিলাম, কারণ আমি তখন প্রতিদিন বড় আদালতে হাওয়া খাইতে যাইতাম। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন না—উকীল মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা কোন্ মোকদ্দমায় আসিয়াছেন ?' আমি বলিলাম,—'আমরা কোন মোকদ্দমায় আসি নাই, আমার নাম—'। 'চন্দ্র বাবু' !—এই বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহাসমাদর পূর্ব্বক আমাদিগকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিলেন। কিন্তু নিজে এমন কষ্টকর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে একটি অতি সুখকর অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার করাইলেন—রবিবার তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া আহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া সেই আমার প্রথম আহার। আহার করিলাম—আদর।

সকলেই এখন জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃকবাড়ী জেলা ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমনকালে অনেকে সে বাড়ী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কতক প্রাচীন ধরণের, কতক নব্য ধরণের অট্টালিকা ঐ রেলপথের পূর্ব্বদিকে নৈহাটী ষ্টেশন হইতে ঐ ষ্টেশনের দক্ষিণদিকস্থিত প্রথম ফটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সদর বাড়ীতে বৃহৎ পূজার দালান ও প্রাঙ্গণ। দুর্গারাম এবং

আমি বেলা ৯ ঘণ্টার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম, সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে এবং পূজার দালানের প্রশস্ত রোয়াকে সমস্ত সমবেত শ্রোতৃবর্গের মাথার উপরে আপন মস্তক প্রায় অর্দ্ধহস্ত উত্তোলিত করিয়া এক বিশাল বপু বলিষ্ঠ বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। দুর্গারাম বলিলেন,—'উনিই বঙ্কিম বাবুর পিতা, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।' আমার মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বঙ্কিম বাবু এবং তাঁহার সহোদরদিগকে বড় পিতৃভক্ত দেখিয়াছি—সকলেই যেন এই ভাবে ভোর—"আমাদের পিতা অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্ব স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

প্রাঙ্গণ বা পূজার দালানে বঙ্কিম বাবুকে দেখিতে না পাইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তিনি কোথায়?' ভৃত্য বাহিরের একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া দিল। গৃহটি একতালা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিম বাবুর নিজের বৈঠকখানা—সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ব্ব লেখা লিখিবার ও বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম—অপরিমেয় আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য ঐ গৃহটি বঙ্কিম বাবুর বড়ই প্রিয় ছিল। উহা এখন সাহিত্যসেবীদিগের পীঠস্থান হইয়াছে। পীঠস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা এখন কিরূপ জানি না। অনেক দিন তথায় যাই নাই। বড় আশা আছে, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরের পরম স্থান হইবে।

এই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনারা যে সত্য সত্যই আসিয়াছেন! আমি মনে করিয়াছিলাম, আসিবেন না। রবিবার উকিলদের বাড়ীতে মক্কেলের

ভিড় লাগে। মক্কেল পাইলে আপনাদের ত আর কিছুই মনে থাকে না।” কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে অনেকবার গিয়াছিলাম ;—একবারের কথা বলি।—

বঙ্কিম বাবু যে সময়ে কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে থাকিয়া হুগলীতে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী লইয়া ঢাকায় যাই। তিনি কিন্তু আমাকে বলিয়াছিলেন—‘যাইতেছ—যাও ; কিন্তু ওকাজে থাকিতে পারিবে না।” আমিও ছয় মাস মাত্র ডেপুটীগিরি করিয়া উহাতে ইস্তাফা দিয়া আসি। তাহার দিন কতক পরে, বঙ্কিম বাবু হুগলীতে বাসা করেন। দুইটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। যোড়াঘাটের ঠিক্ দক্ষিণ পার্শ্বের বাড়ীতে তাঁহার বৈঠকখানা এবং বৈঠকখানার দক্ষিণে দুইখানা বাড়ীর পর একটী বাড়ী তাঁহার অন্দর ছিল। অন্দর বাটীর পূর্ব্বাংশের চাতালটি স্তম্ভোপরি নির্ম্মিত ; উহার নীচ দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইত। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিম বাবু একদিন বলিয়াছিলেন, ‘সন্ধ্যার পর আমরা এইখানে বসিয়া থাকি।’ বুঝিয়াছিলাম, নিশীথে আপনার গুলিকে লইয়া ভাগীরথী ভোগ করেন। তিনি স্রোতস্বিনীর শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। বৈঠকখানা বাড়ীতে তিনটি ঘর ছিল ; তন্মধ্যে মাঝের ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেই ঘরে গঙ্গার দিকে একটি বাতায়নের পার্শ্বে একখানি ইজি চেয়ারে বসিতেন। কথা কহিতেন আর গঙ্গা দেখিতেন। গঙ্গা দেখিয়া তাঁহার ক্লান্তি বা বিরক্তি হইত না। আমি প্রায় প্রতি শনিবার সেখানে যাইতাম। কোন শনিবার না গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। আমি প্রায়ই নৈহাটী দিয়া যাইতাম। নৌকায় আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র ঘাটের নিকট জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন। একবার ঘাটে নৌকা পৌঁছিবামাত্র আমি নামিলাম না দেখিয়া বলিলেন,—‘এস’। আমি বলিলাম—

'যাব কি না, তাই ভাবছি'। যাইবামাত্র হাসি আর আলিঙ্গন। সে কথা আর কি বলিব!

বঙ্কিম বাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন কখনই তাঁহার কাছে খাই নাই। যখনই গিয়াছি, দুই এক দণ্ড পরেই নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখনই আসিতে চাহিয়াছি, তখনই নানা সামগ্রী খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম, এ সব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়! শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়—আর তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র! আমি ত অনেকবার গিয়া অনেক দেখিয়াছিলাম। আমার ঋষিতুল্য বন্ধু, রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, একবারমাত্র আমার সঙ্গে গিয়া বলিয়াছিলেন—'বাঃ—বঙ্কিম বাবু কি বন্ধু-বৎসল'! একবার সন্ধ্যার কিছু পরে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাঁহার জ্বর হইয়াছে—তিনি অন্দরে শুইয়া আছেন। কিন্তু সংবাদ পাইবামাত্র উঠিয়া আসিলেন; আসিয়া নানা কথা কহিলেন। আমি যতক্ষণ আহার করিলাম, ততক্ষণ আমার কাছে উপবিষ্ট রহিলেন—যেন কোন অসুখ হয় নাই, যেন দেহ ও মনে স্ফূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই!

বঙ্কিম বাবু সাহিত্যানুরাগীদিগের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন—আলাপ করিলেই ভাল থাকিতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যানুরাগীর সংসর্গ তাঁহার যেন প্রাণবায়ু ছিল। সে সংসর্গ না পাইলে তাঁহার প্রাণ যেন ফুলিয়া উঠিত। যেবার হেমচন্দ্রকে লইয়া যাই, সেবার গিয়া দেখি, মহামহোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন। শীতকাল—সন্ধ্যা আগত-প্রায়। শীঘ্রই টেবিলের উপর দীপ জ্বলিতে লাগিল। সকলে টেবিল বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতুল রূপ, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, অপূর্ব্ব কমনীয়তামিশ্রিত অসীম প্রতাপ ও পুরুষকারব্যঞ্জক মুখ-গৌরব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্রাটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তখন তাঁহার অন্তরে কি আনন্দ ! হেমচন্দ্র উপস্থিত—অগ্রে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা আরম্ভ হইল ; সেই কথা হইতে আরও কত কথা আসিল । বঙ্কিমচন্দ্রের কি স্ফূর্ত্তি ! স্ফূর্ত্তিতে এই কথা ফুটিতে লাগিল— ইহাই ত সুখ, ইহাই ত জীবন,—এই রকমই ত চাই !

সাহিত্যের সংস্রবমাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র সুখী হইতেন। এক শনিবার আফিস হইতে বেলা তিনটা কি চারিটার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসায় গিয়া দেখি, অসুস্থতার জন্য তিনি মেজের উপর শয্যায় শুইয়া আছেন, আর দুইখানা কেদারায় দুইটী যুবক ব'সয়া আছেন ! একটি যুবককে আমি চিনিতাম। তিনি একখানা ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিম বাবুকে উপহার দিতে গিয়াছিলেন। আমি যাইবার দুই চারি মিনিট পরেই যুবক দুইটি চলিয়া গেলেন। তখন তাহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ইঁহারা কতক্ষণ ছিলেন' ? তিনি বলিলেন—'দুই তিন ঘণ্টা হইবে'। সাহিত্যের সংস্রব ছিল বলিয়াই বঙ্কিম বাবু অত ছোট বালক দুইটিকে লইয়া অতক্ষণ তেমন স্থির ধীর প্রফুল্লভাবে থাকিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলাম, বালকদ্বয় তাঁহার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

মাতৃভাষায় লিখিতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে তিনি অনেককেই উৎসাহিত করিতেন। আমি কখনই বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে ঘৃণা করি নাই। তখন চারিদিকে মাতৃভাষার নিন্দা শুনিতাম, স্কুলেও উহা ভাল করিয়া শেখান হইত না। কিন্তু আমি লুকাইয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতাম। লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতাম—কাহাকেও দেখাইতাম না। বঙ্কিম বাবু যখন যোড়াঘাটের বাড়ীতে ছিলেন, তখন বাঙ্গালা লিখিবার জন্য আমাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—'ভয় করে, বানান ভুল করিয়া হাস্যাস্পদ হইব' ? তিনি

হাসিয়া বলিয়াছিলেন—'বঙ্গদর্শন প্রেসে একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি বানান ঠিক করিয়া দেন. বঙ্কিম বাবুর যোড়াঘাটের বাড়ীতে আমি হরপ্রসাদকে প্রথম বন্ধু-স্বরূপ পাই। হরপ্রসাদের বাড়ী নৈহাটীতে। তিনি সর্ব্বদাই গঙ্গা পার হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় যাইতেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরম ভক্ত দেখিতাম. বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন. তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিতেন।

আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিম বাবু কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন; তখন প্রত্যেক ছুটীর দিন বৈকালে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম। নানা শাস্ত্রজ্ঞ, গম্ভীর প্রকৃতি, বালকবৎ সরলতা শোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিম বাবু যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই ভক্তি করিতেন। রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন বঙ্কিমচন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় তাঁহার আরও কয়েকটি বন্ধু বড় অনুরাগভরে আসিতেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার কলিকাতায় থাকিলে, তিনি তারাকুমার কবিরত্ন, বঙ্কিমের সহাধ্যায়ী বলাইচাঁদ দত্ত, কবিবর হেমচন্দ্র ও কোমৎ-মতাবলম্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র। আর সেখানে থাকিতেন—বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম দাদা সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্কিম বাবুর প্রতিভা ও হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাঁহার কাছে যাইতাম।

গ্লাডষ্টোন।

(শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়)।

মহারাণীর দীর্ঘ রাজত্ব সময়ে যাঁহারা প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গ্লাডষ্টোনের সমান কেহই ছিলেন না। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লিবারপুল নগরে সেই মহাপুরুষের জন্ম হয় এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৯ মে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কূট-মন্ত্রিত্বে ও বৈদেশিক নীতিত্বে কেহ কেহ গ্লাডষ্টোন অপেক্ষা বড় হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সততায়, উৎসাহ ও পরিশ্রমে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। রাজমন্ত্রীর সততা রক্ষা করা বড় কঠিন। সাধারণ লোকে চাহে, অন্য দেশের লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজে লাভবান্ হইতে। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতায় সাধারণ লোকের স্বভাব কলুষিত। রাজা আড়ম্বরপ্রিয়, প্রজা যুদ্ধপ্রিয়, এমন অবস্থায় ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া—হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া, লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া সাধারণের প্রিয় হওয়া, এ কেবল মহাগুণেই সম্ভবে। গ্লাডষ্টোনের মৃতদেহ দেখিবার জন্য দুই দিনে তিন লক্ষেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। দেশে বিদেশে অস্তমান সূর্য্যের দিকে পশ্চিম মুখে কোটী কোটী লোক চাহিয়াছিল,—তারে মুহূর্ত্তমধ্যে সকল দেশে তাঁহার তিরোধান সংবাদ পৌঁছিল—সকলেই ভাবিল, আমার একজন আত্মীয়ের মৃত্যু হইল, পৃথিবীর একটী আলোক নির্ব্বাপিত হইল। লিবারপুলের সেই শিশু সহস্র দেশের বন্দনীয়!—একি সাধারণগুণে সম্ভবে?

গ্লাডষ্টোনের পিতা-মাতা স্কচ। তাঁহার পিতামহ লিবারপুলে ব্যবসায় করিতে আসিয়া যথেষ্ট ধনশালী হইয়াছিলেন। গ্লাডষ্টোন্ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তান। তাঁহার অনুগ্রহে সহস্র সহস্র লোক বড় বড় উপাধি উপহার

পাইয়াছে, তিনি নিজে চিরদিন সাদাসিদা গ্লাডষ্টোন রহিয়া গেলেন। রাজা-রাজড়া তাঁহার কটাক্ষে কুঞ্চিত,—তিনি রেলের গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী। একজন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আপনার মত বড় লোক তৃতীয় শ্রেণীতে চড়েন কেন?" তিনি বলিয়াছিলেন,—"কি করিব! চতুর্থ শ্রেণী যে নাই!" বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, অসীম ধৈর্য্য, উদ্যম ও উৎসাহ গ্লাডষ্টোন পিতার নিকট;—কল্পনা-কুশলতা ও হৃদয়ের কোমলতা, ধর্ম্মভীরুতা ও পরদুঃখকাতরতা মায়ের নিকট পাইয়াছিলেন। যে তর্ক কৌশলে তিনি পৃথিবী মুগ্ধ করিতেন, বাল্যকালে পিতার বরে তাহার প্রথম শিক্ষা। তাঁহার পিতা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া ঘোর তর্ক বাঁধাইয়া দিতেন; বিনা তর্কে কোন কথার মীমংসা হইত না। মীমাংসা যাহার না হইত, কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

ইটন ও অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করিবার সময় গ্লাডষ্টোন সাহিত্য ও ইতিহাস ভালরূপে পড়িয়া ছিলেন এবং বাইবেল পড়িতে বড় আনন্দ অনুভব করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার স্বভাব কিছু গম্ভীর ছিল। ছেলেদের সঙ্গে কোন রকমের খেলায় তিনি যোগ দিতেন না, যেন একটু একা থাকিতে ভালবাসিতেন। তাই বলিয়া তিনি অসামাজিক বা অহঙ্কারী ছিলেন না। ভদ্রতা ও বিনয়ে তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতে ছাত্রদের সভায় তিনি যে বক্তৃতা করিতেন, তাহাতে সকলে মুগ্ধ হইত। শরীরে তাঁহার যথেষ্ট বল ছিল। ব্যায়ামের জন্য তিনি বেড়াইতে ভাল বাসিতেন; একাকী নূতন নূতন পথে, পাহাড়ে, গিরি-উপত্যকায় বা গ্রামে গ্রামে বেড়াইতে তাঁহার বড় আনন্দ হইত এবং কখন কখন নৌকায় হাল ধরিয়া নৌকা চালাইয়া ব্যায়াম-সুখ অনুভব করিতেন। ছেলেবেলা নৌকার কর্ণ ধরিতে যাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল, প্রবীণ বয়সে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইয়া তিনি কত বিপদ্

হইতেই তাহাকে কতবার রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যান্য খেলার মধ্যে তিনি ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা পছন্দ করিতেন। তাঁহার বাসগৃহের চারিদিকে বড় বড় গাছের প্রাচীন জঙ্গল ছিল ;—বৃদ্ধ বয়সে সেই গাছ কাটিয়া ব্যায়ামসুখ অনুভব করিতেন। তিনি গাছগুলি বড় ভাল বাসিতেন ; প্রাচীন গাছ বলিয়া আদর করিতেন ; অথচ দু একটি কাটিতেন। এজন্য তাঁহার একজন অনুচর তাঁহাকে একবার লাঞ্ছনা করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—'পচা মরা গাছ কাটিয়া না ফেলিলে অন্য গাছ গুলির আওতা কাটে না ; বায়ু ও আলোক প্রবেশ না করিলে অন্যদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। দেশে ও সমাজে তিনি এইরূপে প্রাচীন প্রথার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। কিন্তু যখন বুঝিতেন, তাহাদের কোনটি অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, অকুতোভয়ে তাহাদের মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিতেন।

যে ব্যায়ামে পরিশ্রমের সহিত চিন্তা করিবার অবসর পাওয়া যায় গ্লাডষ্টোন্ সেই সকল ব্যায়াম ভাল বাসিতেন। তবে ফুটবল ও ক্রিকেটে কেন যে তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। কাঠুরিয়ার চিন্তা করিবার অবসর অল্প, তবে বৃদ্ধ বয়সে একাকী ব্যায়াম করিবার এমন সুযোগ আর কিছুতেই হয় না। কাঠুরিয়ার কাযে, কাঠুরিয়াদের কোপের জোর ও লক্ষ্যের স্থিরতায় তাঁহার নিকট পরাজয় মানিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র হার্বাট তাঁহার কথঞ্চিত সমকক্ষতা করিতে পারিতেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন্ নিউইয়ার্কের প্রতিনিধি হইয়া পালিয়ামেণ্ট মহাসভায় প্রবেশ করেন। বাল্যাবধি তাঁহার বাসনা ছিল, তিনি একজন ধর্ম্মযাজক হইবেন ; কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া রাজনীতি শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। যাঁহার বক্তৃতা করিবার শক্তি আছে,

তাহার প্রায়ই ইচ্ছা হয়, দনঘটা করিয়া বক্তৃতার গর্জ্জনে শ্রোতাদিগকে মুহূর্ত্তে চকিত ও স্তম্ভিত করিয়া দেন। কাহারও কাহারও ইচ্ছা হয়, বলিবার কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, তবু যেন নিজের সজীবতা প্রতিপাদন করিতে কিছু বলিতেই হইবে। এরূপ লোক, ছাত্রদের বা সাধারণ লোকদের প্রিয় হইলেও, বিচক্ষণ লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়ে। গ্লাডষ্টোন্ ষাট বৎসর মহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। এই দীর্ঘকাল মধ্যে অনাবশ্যক একটী বক্তৃতাও করেন নাই;—ধীরে ধীরে সাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলেরই বিশ্বাস ছিল, তিনি যখন বক্তৃতা দিবেন, তখন কিছু নূতন কথা, নূতন সংবাদ, ও নূতন অভিজ্ঞতা শুনা যাইবে। সুতরাং তিনি বলিবার জন্য দাঁড়াইলেই লোকে উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনীর ন্যায় কুলু কুলু স্বরে কখন কাহিনী সমাপ্ত করিতেন, কখনও বা প্রবল স্রোতের উচ্ছ্বাসে গভীর গর্জ্জনে দু-কূল ভাসাইয়া সাগরে গিয়া পড়িতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাসভায় কত কত সুবক্তা দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একজনকেও পাওয়া যায় নাই। কি ভাষার উচ্ছ্বাস, কি যুক্তির প্রখরতা, কি স্বরের মাধুর্য্য ও শক্তি বিস্তৃত মহাসভার সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত! অঙ্গ ভঙ্গী নাই, বিকট চীৎকার নাই, যেন হিমাচলের তুষার গলিয়া বন্যায় ভারত ভাসাইতেছে!

মহাসভায় প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরে গ্লাডষ্টোন রাজকর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। অতি সামান্য কর্ম্মচারীর কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি ক্রমে উচ্চতর পদে উন্নীত হন, শেষে প্রধান মন্ত্রীপদ একচেটিয়া হইয়া পড়ে। বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত হওয়াতে, বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যপ্রণালী উত্তমরূপে শিক্ষা হইয়াছিল। ব্যবহারজীব হইবার বাসনায়

মহাসভায় প্রবেশ করিয়াই তিনি ছয় বৎসর আইন শিক্ষা করেন। যাহাকে আইন সৃষ্টি করিতে হইবে, তাঁহার আইন জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। মহাসভার সভ্যদিগকে ছোট ছোট কমিটীতে বসিয়া স্থানীয় বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়নে সাহায্য করিতে হয়। ইহাতে স্থানীয় অভাবের এবং মহাসভার কার্য্যপ্রণালীর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মে। এরূপ কার্য্য গোপনে হয়, ইহাতে বাহাদুরী পাইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ পরিশ্রম অত্যন্ত। রাত্রি এগারটা হইতে তিন চারিটা পর্য্যন্ত ঐরূপ সভার কার্য্য করিয়া তাহার পর চারি পাঁচটার সময় মহাসভায় বসিলে, তাহাতে যোগ দিয়া বেলা ছয় সাতটা পর্য্যন্ত সারারাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা অনেকের পছন্দ হয় না। গ্লাডষ্টোন সাধ করিয়া এই সকল সভার কার্য্য গ্রহণ করিতেন। আমরা যেমন কলেজ হইতে বাহির হইলেই বা দুখানা খবরের কাগজ পড়িলেই, রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার শক্তি হইয়াছে মনে করি, গ্লাডষ্টোনের সেরূপ মনে হয় নাই।

এত পরিশ্রম করিয়া তিনি অপ্রফুল্ল থাকিতেন না। হোমার লুক্রেসিয়স্ প্রভৃতি গ্রীক পুস্তক সকল পাঠে তিনি যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করিতেন। বন্ধু বান্ধব লইয়া পান ভোজন গল্প গানে যথেষ্ট আমোদ পাইতেন। তবে পবিত্র শান্ত নির্ম্মল স্বভাব না হইলে কি কবি, কি চিত্রকর, সাহিত্যকার বা গায়ক গ্লাডষ্টোনের সংসর্গ লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটিত না। যেন ফিডিয়াসের হাতে মার্ব্বেলে খোদা হার্কুলিস—যেমন অমিত বল, অসীম উৎসাহ, তেমনি শান্ত পবিত্র সুশীল, কাব্য ও গানে, চিত্র ও ইতিহাসে, যুবক বন্ধু ও বৃদ্ধ গ্রন্থকারের সহবাসে তাঁহার দিন আনন্দে অতিবাহিত হইত। যত কার্য্যই থাকুক, রবিবার মন্দিরে গিয়া নিয়মিত সময়ে উপাসনার কখন ব্যাঘাত ঘটে নাই। উপাসনায় মুসলমান, ভাবে হিন্দু, চরিত্রে খৃষ্টান, বলে গ্রীক, কাব্যে ইতালিয়ান; এমন

অসাধারণ সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। চাতকের ন্যায় চিরদিন আলোকের আকাঙ্ক্ষায় তিনি মর্ত্ত্যে আসিয়া স্বর্গমুখে একদৃষ্টে কাটাইয়াছেন। মৃত্যুমুখে স্পন্দহীন দেহে জিহ্বা হইতে স্বতঃই ফরাসী ভাষায় প্রার্থনার করুণস্বর তাঁহার মুখ হইতে বিগলিত হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোনের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষের একটা নিদর্শন এই,—গাছ কাটিতে কোন কাঠুরিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই, বক্তৃতায় কোন বক্তা তাঁহাকে অতিক্রম করে নাই, ধর্ম্মসঙ্গত রাজনীতিতে কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে, সমালোচনায় তিনি ক্ষিপ্রহস্ত, হোমর সম্বন্ধে তিনি যত লিখিয়াছেন, কোন গ্রীক পণ্ডিত তাহা লিখেন নাই, দান্তে সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা লাটিন পণ্ডিতমাত্রের মনোজ্ঞ, হোরেসের অনুবাদ তাঁহার অতুল কীর্ত্তি, তাঁহার মত কয়জন রসজ্ঞ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাইয়াছিলেন? বাইবেল সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, কয়জন ধর্ম্মযাজক তাহা অনুসরণ করিতে পারিয়াছে?

রক্ষণশীল হইয়া গ্লাডষ্টোন মহাসভায় প্রবেশ করেন। অক্সফোর্ডের শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাকে রক্ষণশীল করিয়াছিল। বি-এ পরীক্ষায় দুটী বিষয়ে সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অক্সফোর্ড পরিত্যাগ করেন। সাহিত্য ও ইতিহাসপ্রিয়তাও তাঁহার বাল্যরক্ষণশীলতার কারণ। গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, ফরাসী ও জর্ম্মাণ ভাষা তিনি উত্তমরূপে জানিতেন। এই সকল ভাষার মহাকাব্য তাঁহার অতি আদরের ছিল। ক্রমে ভূগর্ভস্থ মলিন রত্ন হইতে রসাকর্ষণ করিয়া অঙ্কুরে যেমন ধীরে আকাশের দিকে মাথা উচ্চ করিতে থাকে, হরিত পত্রে ক্রমে শোভমান হয়, ক্রমে পত্রপ্রান্তে অতুল সুষমা ও অনুপম সৌরভ-সম্বলিত প্রফুল্ল কুসুম উদিত হইয়া সহস্র জনের মণপ্রাণ শান্ত করে—গ্লাডষ্টোনের রক্ষণশীলতা হইতে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উদার নৈতিকতার আবির্ভাব

হয়। তিনি কোন দলের মুখাপেক্ষা করেন নাই। চিরদিন তিনি সত্যের মুখপানে চাহিয়া চলিয়াছেন। যাহাতে দরিদ্রের মঙ্গল হয়, অত্যাচারিতের যন্ত্রণা কমে, সকলের সর্ব্বাঙ্গীন সুবিধা হয়, তাহাই করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইলে ধর্ম্মভীরুতা তাঁহাকে অসীম সাহসে কর্ত্তব্য পূর্ণ করিতে সক্ষম করিয়াছে। লোকে জানিত, গ্লাডষ্টোন যাহা করিব বলিয়া বসিয়াছেন, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। বিদেশে যাহারা অত্যাচারে কাতর হইয়াছে, তাহারাই গ্লাডষ্টোনের শরণ লইয়াছে। ইতালি বা বলগোরিয়া, গ্রীস বা মন্টিনিগ্রো, ক্রীট বা আর্ম্মেনীয়া—অত্যাচারিতের বন্ধু গ্লাডষ্টোন অত্যাচারীর যম। কেহ কাঁদিয়া তাঁহার নিকট কখন বিফল হয় নাই। পথভ্রান্ত পথিকের ধ্রুবতারা আজ ছায়াপথে মিশাইয়া গিয়াছে!

আজকাল, আট নয় বছরের ছেলেদের বার্ডস্-আই পান করিয়া মুখ কলঙ্কিত ও শরীর বিযাক্ত করিতে দেখিতে পাই। গ্লাডষ্টোন কখন কোন প্রকারের ধূমপান করেন নাই।' ধূমপান করা ছোট লোকের কাজ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। মাদকতা মস্তিষ্কের জড়তা উৎপাদন করে। তাঁহার বিমল মস্তিষ্কে যেমন তীক্ষ্নতা তাঁহার স্মৃতিতে তেমনি প্রখরতা ছিল। যে সময়ে তাঁহার কার্য্যের যে প্রণালী ছিল, কখন তাহা রেখামাত্র বিলয়গামী হইতে তিনি অনুমোদন করিতেন না। বাল্য-কালে দশটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত এবং রাত্রে আটটা হইতে দশটা পর্য্যন্ত পড়িতেন। তখন কেহ তাঁহাকে অন্য কার্য্যে দেখিতে পাইত না বা কেহ তাঁহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না। প্রৌঢ় বয়সে প্রাতঃকালে উঠিয়া উপাসনা করিতে মন্দিরে যাইতেন, মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্র লিখিতে বসিতেন। নিত্য উপাসনার ব্যাঘাত কখন হয় নাই। স্মৃতিশক্তির গুণে তাঁহার গল্প করিবার অসাধারণ

ক্ষমতা ছিল। অনুসন্ধিৎসার গুণে তিনি যাহা নূতন পাইতেন, তাহাই শিখিতে চেষ্টা করিতেন। এজন্য যে কোন বিষয়ের গল্প উঠিলে তিনি সে সম্বন্ধে কত নূতন নূতন কথা বলিতে পারিতেন। নূতন কথা তুলিয়া কেহ কখন তাঁহাকে ঠকাইতে পারে নাই। একবার তাঁহার দুটী বন্ধু খুঁজিয়া খুঁজিয়া চীনদেশে দাবা খেলার প্রাণালী শিখিয়া সেই সম্বন্ধে কথা তুলিয়া গ্লাডষ্টোনকে ঠকাইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। সে কথা উঠিলে গ্লাডষ্টোন বলিলেন যে, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে দাবা খেলার প্রণালী সম্বন্ধে তিনি একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ এক মাসিক পত্রে লিখিয়াছিলেন। এত গল্প করিতে পারিতেন, তবু ডাক্তার জনসনের মত গল্প করিবার অধিকার কখন একচেটিয়া করিতেন না। অন্যের কথা শুনিতে আগ্রহ করিতেন, কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কিছু বলিতেন না। অহঙ্কারকে তিনি নীচতা মনে করিতেন। সভা-সমিতিতে সম্মুখে বসিব, বেদীতে বসিব, উচ্চাসনে বসিব, আমাদের কত ইচ্ছা হয়, ইহা লইয়া প্রকাশ্য সভায় কোন্দল করিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু গ্লাডষ্টোন যেখানে যাইতেন, একপার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইতেন, সকলকে আদর করিতেন, সম্মান করিতেন। এত বিনয় না হইলে বুঝি এত বড় হয় না, অথবা এত বড় না হইলে বুঝি এত বিনয় হয় না।

বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে চাকর-চাকরাণীরা গ্লাডষ্টোনকে দেবতার মত ভক্তি করিত। অথচ কোন বিষয়ে মতান্তর হইলে তাহারা স্বাধীনভাবে আপন মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কর্ত্তা বলিয়া অনেকে বাড়ীতে তুর্কীর সুলতানী করিতে বাসনা রাখেন; এটীও নীচতার লক্ষণ। কোন প্রকারের নীচতা গ্লাডষ্টোনের ছায়া স্পর্শ করিত না। চাকর-চাকরাণীদের সঙ্গে আপনার জনের মত মিশিতেন, তাহাদের

সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-স্বজনের সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন। তাহারা ভৃত্য বলিয়া কখন আপনাদিগকে বুঝে নাই।

রাজনৈতিক হইলে প্রায় লোকে হৃদয়শূন্য হয়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলে অপরের গুণ চক্ষে প্রতিভাত হয় না। যে দিন মহাসভায় গ্লাডষ্টোনের মৃত্যু সংবাদ উত্থাপিত হইল—বিষণ্ণমুখে ভগ্নহৃদয়ে উদাসনেত্রে শত্রু-মিত্র সকলে তটস্থ। বিশাল সভা-প্রাঙ্গণ নীরব নিস্তব্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বী বালফুর পীড়িত গতিশক্তিশূন্য দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল—হার্কোর্টের ও রোজবেরীর চক্ষু দিয়া দর-দর ধারা বিগলিত হইল,—বৃদ্ধ সালসবেরী চক্ষুজলে চিরদিনের শত্রুতা ধুইয়া ফেলিলেন।

*　　　*　　　*　　　*

আঁধারের ছায়ায় মহাসভা বিষাদ-মলিন হইল। জগজ্জ্যোতিঃ আজ নির্ব্বাপিত।

যুগান্তে উন্নততর মহাপুরুষের আবির্ভাব অসম্ভব নহে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দে এমন সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশসম্পন্ন, যেমন প্রখর বুদ্ধি তেমনি কোমল-হৃদয়, যেমন ধর্ম্মভীরু তেমনি রসজ্ঞ, যেমন বিশাল-দেহ তেমনি প্রশস্ত-মস্তিষ্ক,—গ্লাডষ্টোনের সমকক্ষ আর কেহ জন্মে নাই। এক এক অঙ্গে তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক জন্মিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে তিনি সকলের অপেক্ষা উচ্চতম। মহত্তর পুরুষেও তাঁহার মহানুভবতা ক্ষীণ হইবে না। আকাশের নীলপটে বিদ্যুৎ অক্ষরে তাঁহার কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অকূল-সাগরে

(স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন ।)

"A shipwrecked sailor hast thou been,—
misfortune's mark?"

আমার এমন পিতা! দুই দণ্ড প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া, শোকের আবেগ অশ্রুধারায় প্রবাহিত করিয়া, শান্তিলাভ করিব, বিধাতা তাহাও আমার কপালে লিখিয়াছিলেন না। পিতা যে আমাদিগকে কি অকূল সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন, তাহার ভাবনায় নয়নের বারি নয়নে নিবারিত হইল। পিতার যে কোনও রূপ পীড়া হইয়াছিল, আমি তাহার সংবাদমাত্রও পাই নাই। এক মুহূর্ত্ত মধ্যে যে মানুষের অদৃষ্টে এমন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, এক মুহূর্ত্ত মধ্যে মানুষ যে এরূপ অকূল অনন্ত বিপদসাগরে আকাশ হইতে অকস্মাৎ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহা প্রথমতঃ আমি ধারণাই করিতে পারিলাম না। আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে, আমার পিতা নাই; এক মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার এ অবস্থা ঘটিল। পিতা যাবজ্জীবন যাহা যাহা বলিয়া শাসাইতেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়া গিয়াছেন; তিনি বাক্সে একটী পয়সাও রাখিয়া যান নাই। তাহার উপর বহু সহস্র ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। একটী প্রকাণ্ড পরিবার—পাঁচটী শিশু ভ্রাতা এবং দুইটী অবিবাহিতা ভগ্নী, একটীর বিবাহকাল উপস্থিত, বিধবা মাতা, বিধবা খুড়ী ও এক খুড়তত ভ্রাতা। তাহার পর আমার শাশুড়ী ও তাঁহার অনাথ শিশু পুত্র। মাতুলের একটী অনাথ পরিবার। অনাথা মাসী ও দুই পিসী ও তাহাদের দুইটী পরিবার। এতগুলি পরিবার আশ্রয়হীন হইয়াছে। ফলতঃ আমার রক্ত যতদূর গিয়াছে, সর্ব্বত্রই দরিদ্রতা! সকলেই এক বজ্রাঘাতে আশ্রয়হীন, উপায়হীন হইয়াছে। পৈতৃক জমিদারীর ক্ষুদ্রাংশ

যাহা মোকদ্দমার পর পিতৃব্যেরা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাও আবার তাঁহাদের নিকট বন্ধক দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বয়বাদ সিদ্ধ করিয়া তাহাও লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা পিতার সহোদর ভ্রাতা নহেন। সহোদর ভ্রাতা তিনজন ইতিপূর্ব্বেই পার্থিব যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা আমার বংশ-সম্পর্কে পিতৃব্য মাত্র। অন্য এক পাপিষ্ঠ তাহার ঋণের তিন গুণ পাইয়াও অবশিষ্ট টাকার জন্য ডিক্রিজারি করিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি, ভদ্রাসন বাড়ীখানি পর্য্যন্ত, পিতার শ্মশানের অগ্নি নির্ব্বাণ না হইতে নিলামে তুলিল। মাতা অতি সরলা, সংসারের কিছুই বুঝেন না। পিতৃব্যেরা বুঝাইলেন, এমন সম্পত্তি আমি হাইকোর্টের জজ হইলেও মাতা পাইবেন না। হতভাগিনী মাতার এবং তাঁহার অভাগিনী বালিকা পুত্রবধুর যাহা অলঙ্কার ছিল, তাহাও বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিলেন। আর আপনারা বণ্টন করিয়া সকলে কিনিয়া লইলেন। সে টাকার দ্বারা নিলাম ডাকিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট টাকা মা কোথা হইতে দিবেন? সে টাকাটা একজন পিতৃব্য দিয়া সম্পত্তিটা কিনিয়া লইলেন। সম্পত্তি ত গেলই, এ কৌশলে মাতার ও স্ত্রীর যাহা অলঙ্কার ছিল, তাহাও গেল। শুনিয়াছি, বালিকা পুত্রবধূর অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইতে স্নেহময়ী মা বড় কাঁদিয়াছিলেন। পিতা সংসারে এত বীতরাগী ছিলেন, অর্থের প্রতি তাঁহার এত অশ্রদ্ধা ছিল যে, কখনও মাতা কোন অলঙ্কার গড়াইয়া দিতে বলিলে বরং মহা বিরক্ত হইতেন। মাতা গৃহস্থি খরচ চালাইয়া যাহা বাঁচাইতে পারিতেন, তাহাদ্বারা এ সকল অলঙ্কার গড়াইতেন। অম্লান বদনে আপনার ও আপনার সন্তানদের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্রবধূর অলঙ্কার খুলিয়া দিতে মাতার হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। পিতার শোকের উপরে এই দারুণ আঘাতে, আহা! মা আমার যে অসহনীয় দুঃখ অনুভব করিয়া-

ছিলেন, তাহাতে তাঁহারও অকাল-মৃত্যু ঘটিল। এত দুঃখের অলঙ্কার গুলিও শেষে পিতৃব্যেরা বণ্টন করিয়া লইলেন। বহু বৎসর পরে মাতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিবার জন্য একখানি গহনা উচিত মূল্যেরও অধিক দিয়া আমি তাঁহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম।—পাইলাম না। সরলা মাতা শেষ সম্বলও এইরূপে হারাইলেন। এখন এতগুলি পরিবারের উপায় কি? এই দারুণ চিন্তায় আমার চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইয়া গেল। এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? ইহার উত্তর যে মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। নিরুপায়ের উপায় ভগবান ভিন্ন ইহাদের উপায় কি আছে? সেই অনাথের নাথকে ডাকিলাম। তাঁহার চরণে ইহাদিগকে সমর্পণ করিলাম।

পিতৃব্যগণ আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া আমার উপর ঘোরতর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে আমার শিক্ষার ঘোরতর প্রতিকূল ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন বিধাতা তাঁহাদের প্রতিকূলতার পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহারা যুক্তির উপর যুক্তি খাটাইয়া আমার সরলা মাতার নামে পত্র লিখিয়া আমাকে তৎক্ষণাৎ শিক্ষার আশা বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ী যাইতে লিখিলেন। কখন বা লিখিলেন,—"তোমার যে সম্পত্তি চলিয়া যাইতেছে, তুমি হাইকোর্টের জজ হইলেও তাহা পাইবে না।" কখন বা ঘোরাল বর্ণে আমার নিরাশ্রয় পরিবারের দুরবস্থার ছবি চিত্র করিয়া পাঠাইলেন। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় আমি পিতার কাছে সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম, পিতা সে সকল পত্র তাঁহাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহারা আজ আমারই ভাষা দ্বারা শাণিত অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া আমার বিদীর্ণ হৃদয়ে অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এক একখানি পত্রে আমার দেবী মাতায় ও দেব-শিশু ভ্রাতা-ভগিনীদের এমন হৃদয়বিদারক

বর্ণনা অঙ্কিত হইত যে, আমি মাটিতে বুক রাখিয়া কাঁদিতাম। এদিকে কলিকাতার দুই চন্দ্রকুমার ও হরকুমার ভিন্ন আর সকলেই, দাদা পর্য্যন্ত, বাড়ী যাওয়া উচিত বলিতে লাগিলেন। যাইতেছি না বলিয়া কেহ কেহ তিরস্কার, কেহ মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। নির্ম্মম সংসারের চারিদিকের অস্ত্রাঘাতে আমি ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি বাড়ী যাইয়া কি করিব? সম্পত্তি রক্ষা করা দূরে থাকুক, এক মুষ্টি অন্নও ত দুঃখিনী মাতাকে দিতে পারিব না। বি, এ, পরীক্ষার আর তিন মাস মাত্র বাকী। এ সময়ে বাড়ী গেলে পরীক্ষা আর দিতে পারিব না। ভবিষ্যতে বিদ্যাভ্যাসের আশা গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে কুড়ি পঁচিশ টাকার কেরাণীগিরি, কি অন্য কোন চাকুরি ভিন্ন আর কিছু জুটিবার সম্ভাবনা নাই। তদ্দ্বারা এ পরিবার কি প্রকারে প্রতিপালন করিব? পিতা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও যাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন, আমি কুড়ি পঁচিশ টাকা দ্বারা কি করিব? অথচ কলিকাতা থাকিয়াই বা কি করিব? থাকিবই বা কি প্রকারে? পিতার মামাত ভাই কাশী বাবু কলিকাতায় আমাদের বাসায় থাকিয়া হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। পিতা কতবার আপনার পদ ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহার ধন প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অবস্থা খুব ভাল। তিনি দেশের মধ্যে একজন প্রধান জমীদার ও সহৃদয় লোক বলিয়া পরিচিত। তিনি পিতাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলে শত টাকা ব্যয় করিতেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ যখন কলিকাতায় পৌঁছে, তখন তিনি আমাদের বাসায় ছিলেন। কিন্তু তিনি যেরূপ শোকাতুর হইবেন মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই দেখিলাম না। আমি কিছু বিস্মিত হইলাম।

আমি দেখিয়াছিলাম, পিতার সাংসারিক অবস্থা যত মন্দ হইতেছিল, ততই তাঁহার আত্মীয়তাও কিছু কমিয়া আসিতেছিল। আমরা মনে করিতাম, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতা আমাদের জমিদারী মোকদ্দমার আপীল করিয়াছিলেন না বলিয়া তিনি এরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার দারুণ জিদ ও মোকদ্দমাপ্রিয়তা দেশখ্যাত। আদালত কুরুক্ষেত্রে তিনি একজন ভীষ্ম মহারথী। আমার অদৃষ্ট-আকাশ হইতে পিতৃসূর্য্য অস্তমিত হইলে, আমি ধ্রুব নক্ষত্রের মত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলাম। এ বাসায় থাকিয়া আমার সাহায্য না করিলে লোকে নিন্দা করিবে, কেন না, পিতার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা এবং পিতার কাছে তিনি যে বিশেষ উপকৃত। পিতা না থাকিলে তাঁহার যে, গৃহের ভিটারচিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না, তাহা সকলেই জানে। অতএব তিনি ম্লানমুখে আমাকে পাঁচটী টাকা মাত্র ভিক্ষা দিয়া পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিবার চারি পাঁচ দিন পর খিদিরপুর গিয়া এক বাসা করিলেন। হায় রে সংসার! অকূল সমুদ্রে পড়িয়া যে এক ভেলার উপর বক্ষঃ রাখিতে পারিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহাও ভাসিয়া গেল। তখন সম্পূর্ণরূপে উপায়হীন হইয়া ধরাতলে বক্ষঃ রাখিয়া অশ্রুজলে মাতা বসুন্ধরার বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলাম,—"মাতা! তোমার বক্ষঃই দীনহীনের একমাত্র আশ্রয়।" স্বর্গীয় পিতাকে ডাকিলাম। দেখিলাম, পিতা পূজায় যেরূপ পদ্মাসনে বসিতেন, সেরূপ ত্রিদিবে পুণ্যালোকে বসিয়া সুপ্রসন্ন মুখে সস্নেহ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমি পিতার এ প্রসন্ন মূর্ত্তি সর্ব্বদা স্বপ্নে দেখিতাম। পিতা জপ করিতেছেন, ললাট চুম্বন করিতেছেন। আর সেই অলোকিক সাহস-ভরা হৃদয়ে বলিতেছেন—"বৎস! মাভৈঃ!" আর ডাকিলাম, সেই দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু বিপদভঞ্জন হরিকে। অনাথের প্রার্থনা অনাথনাথ

শুনিলেন। কলিকাতার পথের ভিখারী পিতৃহীন যুবকের মনে অপরিমেয় সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত হইল, এত উৎসাহ একটি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর মনেও সঞ্চারিত হইতে পারে না। স্থির করিলাম, বাড়ী যাইব না। জীবন্ত উৎসাহে মাতার কাছে এরূপভাবে লিখিলাম—"মা! ভয় নাই। তুমি তিনটা মাস কোন মতে দুঃখে কষ্টে কাটাও। আমি তিন মাস পরে বি, এ, পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিব। পিতা সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই; আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এত পুণ্য, আমাদের কখনও কোন কষ্ট হইবে না। তাঁহার পুণ্যে, তাঁহার "আশালতায়" সুফল ফলিবে। দুর্গতিহারিণী দুর্গা আমাদের কুলমাতা। তুমি তাঁহার চরণে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাক; কুলমাতা আমাদিগকে কূল দিবেন।" প্রত্যেক পত্রে আমাদের সহৃদয় পিতৃব্যগণ লিখিতেন—"তোমার পিতা এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশও রাখিয়া গেলে তোমার আজ লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাকিত। তিনি তোমাদিগকে একেবারে ডুবাইয়া গিয়াছেন।" এরূপ প্রত্যেক পত্রে পিতার প্রতি কত শ্লেষ লেখা থাকিত। এই পিতৃ-নিন্দা আমার কাটা-ঘায়ে নূনের ছিটার মত লাগিত। এই দারুণ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিত। আমি তীব্রস্বরে তাহার উত্তর লিখিতাম—"আমার পরম ভাগ্য যে, পিতা আমাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না করিয়া অশেষ পুণ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। আমার জন্য সম্পত্তিস্বরূপ তৃণস্তূপ রাখিয়া গেলে আমি এ বংশের আর সকলের মত একটী প্রকাণ্ড গরু হইতাম।" পিতৃব্যগণ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। দেশশুদ্ধ লোক বিস্মিত হইল। এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও এত স্পর্দ্ধা, এত সাহস ও এত অহঙ্কার! আমার নিন্দায় দেশ পপূর্ণ হইল। আমার কত কুৎসা, কত নিন্দার সৃষ্টি হইল। দুই একটির নমুনা পরে দিব।

এদিকে কলিকাতায়ও বাসাশুদ্ধ লোক আমার সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া বিস্মিত। দুই একটি ইতরবংশ-সম্ভূত সহবাসী ঘোরতর মর্ম্মাহত হইল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ইহাদের কাছে কখনও ম্লানমুখ কি নতশির দেখাইব না। সাহস দেখিয়া চন্দ্রকুমার পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"নিতান্ত যদি বাড়ী না যাওয়া স্থির করিয়া থাক, তাহা মন্দ নহে। তবে আমার পিতার কাছে তোমার কলিকাতার খরচ বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাঠাইতে লিখি।" চন্দ্রকুমারের পিতা আমার পিসা, তাঁহার বিমাতা আমার পিসী; আমার পিতার সহোদরা ভগ্নী। তিনিই বলিদান করিতে গিয়া আমার আঙ্গুল একটা বলিদান করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমারের পিতা তখন মুন্‌সেফ কি সবজজ। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিলাম, তাহার প্রয়োজন নাই। আমার দুইটি Private tution আছে, তাহাতে কুড়ি টাকা পাই, তাহার দ্বারা আমার কলিকাতার খরচ চলিবে। আমার খরচের জন্য আমার ভাবনা নাই। চন্দ্রকুমার বলিলেন,—"পরীক্ষার তিন মাস মাত্র বাকী। এখন সকালে বিকালে দুই বেলা চার মাইল করিয়া আট মাইল হাঁটিয়া ছাত্র পড়াইতে গেলে, তোমার আপনার পড়া চলিবে কেন?" আমি বলিলাম,—"ভাই! ইহা আমার অতি সামান্য ক্লেশ। আমার হতভাগিনী মাতা, ভার্য্যা, শিশু ভাই-ভগিনীরা অর্দ্ধাহারে কি অনাহারে দিন কাটাইতেছে,—আমি কি এই ক্লেশটুকুও সহ্য করিব না? হাঁটা আমার সহিয়া গিয়াছে। আর পড়া, তা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িব। যদি নিতান্ত না পারি, তবে অবশ্য তোমার পিতার কাছে সাহায্য চাহিব। তিনি আমার পিতৃতুল্য, তাহাতে আমার লজ্জা নাই।" দুই এক দিন পরে চন্দ্রকুমার বলিলেন,—দাদা বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমার কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে

চাহিতেছেন।" অনেক চিন্তা করিয়া স্বীকৃত হইলাম। কেন, পরে বলিব। পিতৃব্যগণ তখন মাতাকে এই কু-পুত্রের আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের কাছে ভিক্ষা করিবার পরামর্শ দিলেন। সরলা মাতা উপায়ান্তর না দেখিয়া উত্তরীয় গলায় শিশু পুত্রগণ লইয়া তাঁহাদের ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিলেন। সুখে, সোহাগে, গৌরবে, বিলাসে, বেশবিন্যাসে পিতৃব্য-পত্নীগণ, কেহ এত দিন মাতার দুয়ারেও আসিতে পারেন নাই। আজ তাঁহাদের সুদিন। সে সব কথা তুলিয়া মাতার উপর তীব্র অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন—"শূকরীর মত ইহার কত সন্তান দেখ! এতগুলিকে কে ভিক্ষা দিবে?" কেহ বলিলেন,—"তোমার ত দাঁড়াইবার স্থান টুকুও নাই। আমার স্বামী বাড়ী-ভিটা পর্য্যন্ত কিনিয়া লইয়াছেন। থাকিতে দিয়াছি ইহাই যথেষ্ট! তাহার উপর আবার ভিক্ষা কি দিব?" যাহা হউক, পিতৃব্যেরা জমিদারী হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিয়া পিতার এক "অন্নজল" শ্রাদ্ধমাত্র করাইলেন। আমি মাতাকে লিখিয়াছিলাম, আমি গঙ্গাতীরে পিতার শ্রাদ্ধ করিব। তিনি কেবল তিলমাত্র স্পর্শ করাইয়াই আমার ভ্রাতাদের কাচা কাটাই-বেন; কিন্তু পিতার যে গৌরবে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, মাতার তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা ছিল না। ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা দানসাগর করার অপেক্ষা এরূপ তিলস্পর্শ করা শ্রেষ্ঠতর শ্রাদ্ধ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা মহাজ্ঞানী ছিলেন;—তাঁহারা জানিতেন, শ্রাদ্ধের অর্থ দানসাগর কি বৃষোৎসর্গ নহে। শ্রাদ্ধের অর্থ শ্রদ্ধার কার্য্য। অতএব তাঁহারা তিলস্পর্শ হইতে দানসাগর পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া সকল অবস্থার লোকের ধর্ম্মরক্ষার পথ করিয়া দিয়াছেন। বিরলে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তিল স্পর্শ করিলে যে শ্রাদ্ধ হয়, শ্রদ্ধাহীন একটা প্রকাণ্ড দানসাগরে তাহার বিপরীত হয় মাত্র; কিন্তু মূর্খ

যাজকদের কল্যাণে আজ আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়াছি। আজ পিতৃশ্রাদ্ধ শোকের কার্য্য না হইয়া সুখের কার্য্য ;—প্রাণের শোকোচ্ছ্বাসের কার্য্য না হইয়া উহা উৎসবের কার্য্য। আবার ভিক্ষা করিয়া হইলেও এ উৎসব করিতে হইবে। না হইলে ধর্ম্ম যায়,—জাতি যায়। হরি হরি! এ জাতির অধঃপতনের আর বাকী কি আছে? আমি কলিকাতার কাশীবাবুর ভিক্ষাদত্ত ৫৲ টাকায় বিগলিত পবিত্র অশ্রুধারায় মাতা ভাগীরথীর পবিত্র স্রোত বৃদ্ধি করিয়া যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা কুবেরের ভাগ্যেও ঘটে না। তাঁহার স্মৃতিতে এখনও আমার হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠে, নয়নে পবিত্র শ্রদ্ধার ধারা বহিতে থাকে। আমার পুত্র যেন আমার জন্য এইরূপ পিতৃশ্রাদ্ধ করে।



স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত

স্বপ্নদর্শন,—বিদ্যাবিষয়ক।

(স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।)

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এক্ষণে মথুরাসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত লহরীলীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরকখণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-পরিশোধিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিতরণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণবিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, পশু-পক্ষী সকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে বিলীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশের শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি, অন্ত, কার্য্য-

কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জলকল্লোলের কলকল ধ্বনি, বৃক্ষ পত্রের শর-শর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল দ্বারা পরম সুখানুভব হইয়া, মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীন দুর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝর-তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহলরূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল এবং তদানুসারে দিগ্বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া, যত দূর দৃষ্ট হইল, তত দূরই মহোৎসাহে ও পরমসুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড়, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক শান্তস্বভাব অবলোকনে তাঁহাকে বনদেবতা জ্ঞান করিয়া বিহিতবিধানে নমস্কার করিলাম ও তাঁহার পুনঃ পুনঃ দর্শনলাভ দ্বারা নয়ন-যুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোল-প্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার বাক্যস্ফুরণ না হইতে হইতেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি তোমার মানস জানিয়াছি, আমার নাম বিদ্যা, তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিতেছিলে, তাহার এই পথই

সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি। চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।”

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লগিলাম। উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে অরণ্যের শৈত্য, শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “দেবি! এ স্থানের নাম কি এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?” তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন, “এ বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন; কিন্তু ইহার ফলভোগ করা অতিশয় আয়াসসাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্র পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন,’ কেহ কেহ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই রমণীয় কাননের ফলভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদায় দর্শাইতেছি—চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা সমুদায় সুমধুর রসস্ফীত ফলভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধুধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে ও সুকুমারমূর্তি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্য-তরু। দেখিয়াছ, অলঙ্কতিরূপা কি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় লতা তাহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ

ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ।” ইহা কহিয়া বিদ্যাদেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে, আমি জ্যোতিষ-তরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-সমুদায় এক একবার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশ পূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হইতেছেন, আরবার প্রসন্ন বদনে হাস্য করিয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা-সংযুক্ত নহে, আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটিও দৃষ্টি করি নাই। তাহার কোন স্থানের কণামাত্রও ক্ষয় হয় নাই ও কুত্রাপি একটিমাত্রও ছিদ্র কিংবা চিহ্ন নাই। আমি এই অদ্ভুত তরুর বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, “এই সারবান্ অক্ষয় বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তী জ্যোতিষ-তরুর মূল ইহাতে সংবদ্ধ দেখিতেছ; প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তদুপরি প্রতিষ্ঠিত আছে।” বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা-প্রশাখা ও বৃক্ষরুহ-সংবলিত এক গণিত-বৃক্ষ অর্দ্ধকানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ-বচনে বলিলেন, “সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষ-লতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটা কলম তোমাদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্ন-জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া উৎসাহ ও যত্ন সহকারে তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি-সাধন করিয়াছে।

আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়; কারণ, যতগুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ সমস্তই এক-জাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি, আর বামদিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।" আমি ঐ উভয়-জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। ঐ সমস্ত সহজেই অসার ও রন্ধ্র-পরিপূর্ণ; কোনটা বা নিতান্ত শূন্য-গর্ভ; তাহাতে আবার সমুচিত যত্ন সহকারে পরিচালিত না হওয়াতে অতিশয় দুরবস্থ হইয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, দক্ষিণ দিকের সমুদায় বৃক্ষ অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্ন-শাখ হইয়াছে, কিছুই পারিপাট্য নাই; বোধ হইল, যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা সমুদায় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বামদিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটার বা সমুদায় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এ দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম; কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয়-পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা সহকারে মহা কোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরুসমূহ দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম এবং অতি শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে কহিলাম, "দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখ লাভ করিলাম। ভূমণ্ডলে এমন নির্ম্মল সুখধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিশুদ্ধচিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।" এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্ণবদনে

কহিলেন, "তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এ স্থান ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তি-দিগেরই যোগ্য বটে এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্বপরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য্য সকলই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে ; পাপরূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কটস্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, বিজাতীয় বেশধারী অভিমানে স্বমস্তক উন্নত ও গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া মহা শ্লাঘা প্রকাশ পূর্ব্বক সগর্ব্ব-পাদবিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না যে উহারা মনে মনে বিশ্বসংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে? তৎপার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কেহ অভিমানকে স্পর্শমাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার বৈরনির্য্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এ দিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। এক্ষণেও যেরূপ স্থূলকায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে, বিশ্বসংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জান?—লোভ। বিশেষতঃ কাব্য-তরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এ স্থানের অতিশয় অপযশ ঘোষণা হইয়াছে ; উহাদের নাম কাম ও পান-দোষ। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে নিষ্কলঙ্ক দম্পতি-প্রেমেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এ স্থানে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দম্পতি-প্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্য-

দশা উপস্থিত হইয়া পরানুরাগী কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর, পান-দোষ আপনার দলবল সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে! কি বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে! দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর কতকগুলি দুর্দ্দান্ত পিশাচ-পিশাচী আসিয়া তাহার সহিত বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে প্রিয়তম! এমন পরিশুদ্ধ পুণ্যধামের এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা এই সমস্ত রাক্ষস পিশাচকে আশ্রয় দেয়, তাহারা তদ্দারা আমাকেই প্রহার করে। আমি এ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া স্বয়ং এরূপ ভূরি ভূরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব? ঐ ঘনপল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমসুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল কতকগুলি বেশভূষা কল্পনা দ্বারা তৎসমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে; উহার নাম কপটতা।”

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম, এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক-দুঃখেতেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই একটি সুখময় পুণ্যধাম ছিল, তাহাতেও এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে! যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। এই বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদুঃখনিবারিণী সন্তাপনাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস-পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বিশেষতঃ কাম ও পানদোষ এই দুই জন নানাবিধ সুমধুর

প্ররোচনবাক্য বলিয়া আমাকে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, তখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি, তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরম হিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় দিয়া ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবলপরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুইজনে ইহাঁর দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহাঁর নিকটস্থ হইতে না পারে।"

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্নবদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান, ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম পুলকিত চিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল-প্রত্যাশায় মহোৎসাহ সহকারে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং অবিলম্বে পর্ব্বত সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহুপরিশ্রমী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহারা যাত্রীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা আর পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছুদূর গমন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সম্প্রতি এই স্থানেই অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয় মহীয়সী শক্তি দ্বারা

তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন, "হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে; অতএব সাবধান,—সাবধান!" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে, যত আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল! তথাকার সুশীতল মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি পরম-পবিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখ-শ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্যস্বভাব অবলোকন করিয়া অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন, আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইহাঁরা দেব-কন্যা হইবেন, তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, ইহাঁরা দেব-কন্যাই বটেন

এবং এই ধর্ম্মাচল ইহাঁদের বাস-ভূমি; ইহাঁদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইহাঁদের রূপ-গুণ ভুবন-বিখ্যাত। ইহাঁরা যে কি পর্য্যন্ত সুশীল, তাহা কি বলিব। বিদ্যারণ্য-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচলে আরোহণ করেন, তাঁহাদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।”

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া অভূত-পূর্ব্ব, অতি নির্ম্মল আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম; ইতিমধ্যে নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুমন্দ-মারুত-সেবিত যমুনা-কূলেই শয়ান রহিয়াছি।



স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যাসাগর।

(স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবল বাঙ্গালী হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙ্গালী-জন-সুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙ্গালী-দুর্ল্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্ত্তকালের জন্যও কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃত কলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, তাঁহার চাকরী লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিন তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্র-গুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরের উপকার-কার্য্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্ম কালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণতঃ আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ্ না থাকাতে তাহা সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষ-মহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম্ম। দয়ার বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ়বীর্য্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস-নিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভার লাঘব করা নহে; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোন ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্ব্বদা শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্য্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সঙ্কট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতা রক্ষার নিয়ম লঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি কোন গ্রাম্য-মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে, ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টিসংকারের ব্যবস্থা করে নাই; অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয় পরিজনের অন্তরে চিরশোক-শল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগাল কুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা-উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে

প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ-পুরুষোচিত; এই জন্য তাহা সরল এবং নির্ব্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্ম তর্ক তুলিত না, নাসিকা কুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে ঋজু রেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্য্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাহাকে কখনও রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি, কর্ম্মাটরে এক মেথর-জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্দ্ধমান বাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়-নির্ব্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবন চরিতে লিখিয়াছেন—"অন্নচ্ছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুইপলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত, তাহারা পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।" এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে,—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটী নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচ জাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণা-প্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানব-ধর্ম্ম-বশতঃ ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার অনেক

উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভাল মানুষ অমায়িক-প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণতঃ তাঁহাদের চক্ষুর্লজ্জা বেশী। অর্থাৎ, কর্ত্তব্য স্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না।

বিদ্যাসাগরের হৃদয়-বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙ্গালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড় বড় গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরীতে ছোটে ভাল, কিন্তু কর্ম্মের পথে গাড়ী লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটা যদি না থাকিত, তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অকুতোভয়ে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছল স্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে তিনি ভূরি ভূরি স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন; যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্ত্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই; যিনি আপনার ন্যায়-সঙ্কল্পের ঋজু রেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায় কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্র পরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার বলে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক, শিলা-স্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য্য করিয়া নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস

শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্য্যাপ্ত বল-বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্ব্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রপলিটান্ বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন—ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষণা ও অধ্যবসায় নহে, তাহার সজাগ ও সহজ কর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি—এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধা-বিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জ্জন দিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে উপস্থিত বিষয়ের মর্ম্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মত কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্ম্মবুদ্ধি বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল। যেমন ধর্ম্মবুদ্ধি, তেমনি কর্ম্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সরল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে, তাহা দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।" ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের। তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিষকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না; বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্যসাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি

তাহাকে দুর্মূল্য, দুর্গম করিয়া দেয়। সেই জন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন, চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্য্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই;—তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ কাব্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না। এই দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্ম্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ব্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বন-জঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন। ক্ষুধিত, পীড়িত, অনাথ, অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়-বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশে সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সবল,

অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্রবীর্য্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব

বিনয়ে বাধা।

(স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ।)

এ জগতে বিনীত বলিয়া লোকের নিকট প্রশংসিত হইতে কাহার না সাধ হয়? কত কঠোর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যায় না, যদি একটুকু মাথা নোয়াইলে, অথবা দুটি মধুর কথা কহিলেই সেই কীর্ত্তি সঞ্চয় করা যায়, তবে কাহার প্রবৃত্তি না তাহাতে আপনা হইতে উন্মুখ হয়? তবে সকলেই বিনয়ে অবনত হয় না কেন? ইহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য, এবং বোধ হয়, এই আলোচনায় হৃদয়-রহস্য এবং নীতিতত্ত্বেরও দুই একটি কথা প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইতে পারে।

বিনয়-সম্পর্কে বিচার করিতে হইলে, মনুষ্যকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া সুসঙ্গত। যাঁহারা মনুষ্যত্বের সমুদয় লক্ষণেই প্রথম শ্রেণীর লোক, যাঁহাদিগকে সকলে সর্ব্বাংশেই বড় মানুষ অথবা মানবজাতির অগ্রনায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাঁহাদিগের কথা আগে বলিব। তাঁহাদিগের সমস্ত মনোবৃত্তি সমান বিকসিত, সমঞ্জসীভূত এবং সেই হেতু সর্ব্বপ্রকারে অতি সুন্দরভাবাপন্ন। তাঁহাদিগের প্রকৃতির সহিত বিনয়ের কোনরূপ বিরোধ কিংবা বিসংবাদ নাই। তাঁহাদিগের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ ;—ভক্তির পবিত্র অথচ প্রীতিপ্রদ মাধুরীতে মধুর। তাঁহারা উন্নত হইয়াও আপনাদিগের উন্নতি সম্বন্ধে অন্ধ কিংবা উদাসীন, এবং অন্যের সমুন্নতিতে অসূয়াশূন্য। সুতরাং তাঁহারা অন্যদীয় গুণের নিকট অবনত হইতে স্বভাবতঃই অতি প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহারা প্রীতিমান্ পরসুখপ্রিয়, এবং দয়ার্দ্রচিত্ত। ইহার এই ফল, যেখানে ভক্তির তুলসীচন্দন উপহার দেওয়া কঠিন, সেখানেও

তাঁহারা প্রীতির প্ররোচনায় দুটি প্রিয় কথা কহিতে সমর্থ হন; এবং প্রীতিও যাঁহার কাছে ভয়ে কিংবা বিরক্তিতে অগ্রসর হইতে চাহে না, তাঁহারা তথাবিধ দুস্পৃশ্য ব্যক্তিতেও দয়ার দ্রবীভূত উদারভাবে আদর করিয়া থাকেন। তাঁহারাই মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য, এবং তাঁহারা স্বভাবগুণেই বিনীত। তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ কখনও শিক্ষা করিয়া বিনীত হইতে হয় না, অথচ, লোক-চরিত্রের নানারূপ বৈচিত্র্যের সহিত নিজ চরিত্রকে মিলাইবার জন্য বিনয়বিষয়ে নূতন শিক্ষার প্রয়োজন দেখিলেও তাহাতে তাঁহারা বিরক্তি অনুভব করেন না।

যাঁহারা বিবিধ মহার্হ বিদ্যায় এবং নানারূপ মানসিক ক্ষমতায় বড় হইয়াও হৃদয়াংশে অতি নিম্নশ্রেণীর লোক, তাঁহাদিগের পক্ষে বিনীত হওয়া সেইরূপ আবার স্বভাবতঃই অশক্য,—স্বভাবতঃই অসম্ভব। তাঁহাদিগের বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ অসির ন্যায় অতি সমুজ্জ্বল। যাহা কিছু সম্মুখে ফেলাইয়া দেও, সেই বুদ্ধি তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে। হয় ত, তাঁহারা অসাধারণ তার্কিক, অসামান্য বাগ্মী। হয়ত তাঁহারা সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই গুণবান্ ও প্রধান; কিন্তু যে সকল বস্তু লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তাঁহাদিগের সেইগুলিই নাই। তাঁহারা ভক্তিহীন, প্রীতিহীন এবং কেহ বা দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পূর্ণরূপেই দয়া-দাক্ষিণ্যহীন। তাদৃশ ব্যক্তিরা মনুষ্যসমাজে আর যেরূপেই কেন যশস্বী হন না, ইহা অবধারিত যে, তাঁহারা কখনও কাহারও কাছে বিনীত হইতে পারিবেন না;—যদি বিনয় নম্রতায় কোনরূপ মধু থাকে, তাঁহারা কখনও সে মধুর স্বাদলাভে অধিকারী হইবেন না। তাঁহাদিগের প্রকৃতিই বিনয়বিরোধিনী—বিষবর্ষিণী,—ছিন্ন তার বীণার মত নিত্য বিসংবাদিনী। তাঁহারা কথা কহিলেই, সে কথা নীরস কিংবা কর্কশ হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের দৃষ্টি যখন যাহার দিকে নিপতিত হয়, সে-ই তখন আপনাকে দগ্ধশলাকা

দ্বারা বিদ্ধ মনে করে। বিনয়সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, স্বভাবে যাহার অঙ্কুর নাই, শিক্ষায় তাহার বিকাশের আশা কি?—বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়?

যাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থল, তাঁহারা উল্লিখিত উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোক। তাঁহারা না বিদুর, না দুর্য্যোধন; না লুই, না মিলেংথন। তাঁহাদিগের হৃদয় অতি দুর্ব্বল। উহা ঘটিকাযন্ত্রের দোলকের ন্যায় সতত দোদুল্যমান। তাঁহাদিগের সেই দুর্ব্বল হৃদয়, কখনও ভক্তি কিংবা প্রীতির আকর্ষণে, একটুকু কোমল হইয়া নুইয়া পড়ে, কখনও আবার দম্ভের দিকে গড়াইয়া পড়িয়া একটা বিকট মূর্ত্তি ধারণ করে। আমরা যতদূর চিন্তা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই বোধ জন্মিয়াছে যে, এই মধ্যশ্রেণীস্থ নানা ব্যক্তির মনে বিনয়সম্বন্ধে নানারূপ কল্পিত বাধা আছে। সেই বাধাগুলি পায়ে ঠেলিয়া,—বাধাগুলির মূলা পর্য্যন্ত উঠাইয়া ফেলিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে বিনীত হওয়া যায় কিনা, তাহাই এক্ষণ আমরা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করি।

কাহারও মন কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিনয়ের স্বভাব-সুন্দর মাধুরীর দিকে, কিন্তু তিনি বিনীত হন না,—লজ্জায়। সে লজ্জা অভিমানে স্ফুরিত, অভিমানে জড়িত। লোকের নিকট ছোট হইয়া চলিতে হইলে তাঁহার আত্মা লজ্জায় একবারে ম্রিয়মাণ হয়! পাছে লোকে তাঁহাকে শক্তিহীন সামর্থ্যহীন, ক্ষমতাশূন্য কিংবা সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ বিবেচনায় উপেক্ষা করে, এই লজ্জাতেই তিনি সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকেন, এবং যেখানে ঔদ্ধত্যের কিছুমাত্র সার্থকতা নাই, সেখানেও ঔদ্ধত্য দেখাইয়া, যেখানে দুরক্ষরের কোন প্রয়োজন নাই, সেখানেও দুরক্ষর বলিয়া, কিংবা দাম্ভিক ভাবভঙ্গী ও কঠিনতা প্রদর্শন করিয়া বৃথা দুর্ব্বিনীত হন। এই শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা পরচিত্ত পরিজ্ঞানে নিতান্তই মূর্খ।

বিধাতা যাঁহাদিগের অঙ্গে জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় রূপরাশি ঢালিয়া দিয়াছেন, রূপের কৃত্রিম ছটা দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগের যত্ন থাকে না; এবং বিধাতা যাঁহাদিগকে শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও অন্য প্রকারের বৈভব দিয়াছেন, কৃত্রিম অভিমানের আবরণ দিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেও তাঁহাদিগের মতি জন্মে না। যাঁহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের আবার প্রদর্শন কি?—প্রদর্শন দরিদ্রের জন্য। যাঁহাদিগের অন্তরে মনুষ্যোচিত উচ্চতার অমল-জ্যোতিঃ সাগরগর্ভ-নিহিত অমূল্য রত্নের ন্যায়, লোকচক্ষুর অগোচরে লুক্কায়িত রহে, বিনয়ে তাঁহাদিগের আবার লজ্জা কি?—লজ্জা দীনজনের জন্য। মহাত্মা নিয়ুটনকে মনুষ্যমাত্রই জ্ঞান-গুরু দেবতা বলিয়া পূজা করে, এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার কথা চিন্তা করিয়া মানবজাতি গৌরব ও উন্নতির ধ্যানে, আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকে। তিনি বুদ্ধিবলে বিশ্বরচনার মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; দূরস্থিত গ্রহ ও উপগ্রহগণকে, অতি নিকটস্থ বস্তুর ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদিগের গতির পথ আঁকিয়া দেখাইয়াছেন; এবং নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডলকে আদি কবি জগদীশ্বরের করলেখা জ্ঞানে পাঠ করিয়া বিজ্ঞানের অতি কঠোর তত্ত্বেও কাব্যের অমৃতস্বাদ লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। এই পর্ব্বতপ্রতিম উচ্চ পুরুষ, জ্ঞানে সাধারণের ঐরূপ অনধিগম্য হইয়াও, বিনয়ে সকলের কাছেই এত অবনত ছিলেন যে, যে তাঁহার সন্নিহিত হইত, সে-ই তাঁহার শিশুসমুচিত সরল নম্রতায় মোহিত হইত, এবং অতি সামান্য লোকও তাঁহাকে আপনাদিগের সমান শ্রেণীস্থ মনে করিয়া নির্ভয়ে এবং নির্মুক্ত প্রাণে তাঁহার সহিত আলাপ করিত।

বিনয়ের আর এক বাধা—ভয়। অনেকের বিনয়ী হইতে লজ্জা নাই। তাঁহারা জানেন যে, গরিমা আর বিনয়, কাঞ্চনময়ী প্রতিমার কান্তি ও দৃঢ়তার ন্যায়, অনায়াসে ও অতি সুখে একত্র অবস্থান করিতে পারে;

তথাপি তাঁহারা বিনীত হন না,—ভয়ে। ভয় এই, পাছে বিনয়ের দিকে নামিতে নামিতে ক্রমে আত্মাবমাননা হয় এবং অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই ভয়ের অর্থ আপনাতে অবিশ্বাস। মনুষ্যের মন ভ্রান্তির বিপাকে পড়িয়া কতরূপে বিড়ম্বিত হইতে পারে, এই ভয়, —এই অবিশ্বাস তাহারই এক নিদর্শন। নতুবা, যাহার বুদ্ধি আছে, সে কেন বিনীত হইতে ভীত এবং বিনয়ে আত্মাবনতির শঙ্কা করিয়া কুণ্ঠিত হইবে? মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত ক্ষমতা পৃথিবীতে "শক্তি" নামে অভিহিত এবং প্রত্যক্ষ "শক্তি" বলিয়া পূজিত হইয়াছে, বিনয় ও সৌজন্য শিক্ষায় তাহার ক্ষয় হয়,—না বৃদ্ধি হয়? বুদ্ধির স্বাভাবিকী প্রতিভা, মনস্বিতার এ সকল অপরিহার্য্য গৌরব, আত্মার উচ্চতা, উদার হৃদয়ের মহিমা এ সকল যদি বিনয়েই কমিবার বস্তু হয়, তবে আর ইহাদের দুর্ব্বহ ভারবহনের প্রয়োজন কি? তোমাতে যদি যথার্থই এ সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে, নিশ্চয় জানিও যে, লোকের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও, তুমি মুকুট-মণির ন্যায় শোভা পাইবে, এবং সকলকে আপনার ক্ষমতায় বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। আর তোমাতে যদি এ সকল অথবা অন্যান্য সম্মাননীয় গুণের কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, তোমায় লোকের মস্তকে কিংবা স্বর্ণসিংহাসনের শীর্ষস্থলে তুলিয়া দিলেও তোমার স্বাভাবিকী ক্ষুদ্রতা, সমস্ত আচ্ছাদন ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

যখন রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সুহৃৎ-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যজ্ঞীয় বিবিধ কার্য্যের ভার পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিন্যস্ত করা হইল। কেহ ভাণ্ডারের ভার লইয়া দানাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। কেহ ভোজ্যান্ন বিতরণের ভার লইয়া বহুলোকের সুখ-সন্তৃপ্তি সাধনের সুযোগ পাইলেন। কেহ দ্বাররক্ষা,

কেহ পুররক্ষা এবং কেহবা শান্তিরক্ষার ভার লাভ করিয়া আপনাকে যথোচিতরূপে সম্মানিত মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনি যজ্ঞাবসানে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া অর্ঘ্য পাইয়াছিলেন, সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, আপনা হইতে প্রস্তাব করিয়া, আহূত ব্যক্তিদিগের পাদপ্রক্ষালনের ভার মাত্র গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিচিত্র বিনয়-নম্রতা, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তিপরম্পরার সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত না ভয় ও ভক্তির মিশ্রিতভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে? অযুত কোটি লোকের হৃদয়ারাধ্য অলোকসাধারণ খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র-মুগ্ধ শিষ্যেরা সেই আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, যেন কি এক ভাবে একবারে জড়সর হইয়া অধিকতর তদ্গত চিত্তে তদীয় আজ্ঞা পালন করিতেন, এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীরা, অদ্যাপি তাঁহাকে জগতে অতুল, জগৎপাবনী শক্তির প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। অপিতু, নীরো রোমবাসীদিগকে তাঁহার আত্মমূর্ত্তি পূজা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী রোমকেরা তাঁহাকে নরকের কীট বলিয়া ঘৃণা করিত, এবং লোকে এখনও তাঁহার নাম হইলেই, ঐ নামের উপর, অন্ততঃ কল্পনায়ও পাদুকাঘাত করিতে ভাল বাসে; বড় আর ছোট লৌহ আর চৌম্বক; চৌম্বককে উর্দ্ধে রাখ, অধোতে রাখ, দক্ষিণে রাখ, উত্তরে রাখ, লৌহ অবধারিতই উহার আকর্ষণীর অধীন হইবে। কারণ, চৌম্বকে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। বড় আর ছোট, বহ্নি আর তৃণস্তূপ; —বহ্নিস্ফুলিঙ্গকে তৃণস্তূপের উপর রাখ, আর নীচে রাখ, তৃণসংযোগে বহ্নি আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিবে। কারণ, বহ্নিতেও চৌম্বকের মত অদৃষ্ট শক্তি আছে। অতএব ইহাতে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বড়, বিনয়ের কোনরূপ কার্য্যই

তাঁহাদিগকে ছোট করিতে পারে না; এবং যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ছোট,—প্রকৃতির গঠনে খাট, তাহারা দুর্ব্বিনয় ও দাম্ভিকতার কোনরূপ অভিনয়ের দ্বারাই আপনাদিগকে বড় বলিয়া লোকের ভ্রান্তি জন্মাইতে সক্ষম হয় না।

উল্লিখিত ভয়ের ভাব, কতকগুলি লোকের হৃদয়ে ঠিক ইহার বিপরীত দিকে কার্য্য করিয়া আর এক প্রকারে বাধার মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহারা বিনয়কে কোন অংশেও আত্মাবমাননার কারণ মনে করেন না; এবং মনুষ্য বিনয়ের দিকে নামিতে নামিতে কোনরূপেও হৃদয়ে কি মনে দুর্ব্বল হইতে পারে, এমন ইহাদিগের ধারণা নহে। ইহাদিগের ভয়ের মুখ্য কারণ এই যে, সামাজিকেরা বিনয়ের ব্যবহারকে সাধারণতঃ কপট ব্যবহার বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন।

সুতরাং ইঁহারা যদি হৃদয়ের স্বাভাবিক স্ফূরণে অতি সরলভাবেও বাহিরে বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে ইহারাও সম্ভবতঃ কৃত্রিম বিনয়ী ও কপট-লোক বলিয়াই উপেক্ষিত হইতে পারেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, এইরূপ ভয় শুধু অমূলক নহে,—ইহা ঘৃণার্হ। ছলগ্রাহী মনুষ্য, মনুষ্যচরিত্রের বিনয়শীলতায় যেমন অবিশ্বাস করে, মনুষ্যহৃদয়ের ভক্তি, প্রীতি, দয়া ও সরলতায় তেমনই অবিশ্বাস দেখাইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রকৃত হৃদয়বান্ ব্যক্তিরা ভক্তি ও প্রীতি প্রভৃতি পূজার ভাবকুসুমগুলিকে পদতলে দলন করিতে সাহস পাইয়াছেন? লোকে অবিশ্বাস করিবে বলিয়া কি প্রকৃত দয়াশীল ব্যক্তি দয়ার উপযুক্ত পাত্রকে দয়া করিতে অথবা দয়ার উচ্ছ্বাসে নয়নের জল উপহার দিতে বিরত হইবেন? বিনয়ের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। মনুষ্য, হয় তোমাকে বিশ্বাস করিবে, না হয়, তোমাকে অবিশ্বাস করিবে। যে অন্যকে বিশ্বাস করিতে পারে না, সে অবশ্য অবিশ্বাসীর ক্রূর চক্ষেই তোমার সমস্ত কার্য্য

পর্য্যবেক্ষণ করিবে। কিন্তু পাছে মনুষ্য অবিশ্বাস করে, তুমি কি এই ভয়ে, আপনার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এবং ব্যবহারের সৌষ্ঠব বিনাশ করিয়া লঘুচিত্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় দুর্ব্বিনীত হইবে? বিনয়ে যদি প্রকৃত কোন সৌন্দর্য্য থাকে, সেই সৌন্দর্য্যের উপাসনা কর,—সত্যনিষ্ঠা ও সারল্যের সহিত বিনীত হও। লোকে তাদৃশ বিনীত ভাবের ভাল কি মন্দ কিরূপ ব্যাখ্যা করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া বিচলিত কিংবা কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হওয়া কাপুরুষতার পরিচয় মাত্র।

বিনয়ের তৃতীয় বাধা,—স্বার্থচিন্তা। মনে অভিমান-জনিত লজ্জা নাই, অথবা অন্য কোনরূপ অহেতুক ভয়ও নাই, অথচ এই বিশ্বাস অতি প্রবল যে, বিনয়ে একান্ত অধীন হইলে স্বার্থরক্ষা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। যাহারা বিনয় ও স্বার্থরক্ষার উপযোগী কর্ম্মপরতার ভাবকে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া অবধারণ করেন, তাঁহারা কখনও কখনও গৌরব করিয়া এইরূপও বলিয়া থাকেন যে, যখন বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর আঘাত না করিলে, কোথাও কোন কঠিন কার্য্যের উদ্ধার হয় না, তখন বৃথা আর লোকের কাছে বিনয়ের মধুধারা সেচনে কি পুণ্য লাভ হইতে পারে? বিনয়ের পক্ষে এই প্রতিবন্ধককেও আমরা উপযুক্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করি না। লৌকিক কার্য্যভূমিতে কদর্য্যনীতি ও কুৎসিৎ কর্ম্মপদ্ধতির উপর বজ্রের ন্যায় আঘাত করা যে সময়ে সময়ে অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা মানবজগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বজ্রসার পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন, এবং যাঁহারা গুরুতর কর্ত্তব্য কিংবা নীতিঘটিত গুরুতর প্রয়োজনের অনুরোধে বিপক্ষের মস্তকে সময়-বিশেষে শতবজ্রের সম্মিলিত শক্তিতে আপতিত হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই কি বিনয়হীন ছিলেন? অথবা বিনয়ের আভরণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা কেহই কি

কখনও ন্যায্য স্বার্থ ও উপযুক্ত সম্মান রক্ষায় উপেক্ষা কিংবা অক্ষমতা দেখাইয়াছেন? যিনি রোম-সাম্রাজ্যের সংস্থাপয়িতা বলিয়া পৃথিবীতে কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, এবং কাব্য-সাহিত্যের উৎসাহদান ও পুষ্টিবর্দ্ধন হেতু পুরাতন ইউরোপের বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, রোমের কোন্ পুরুষ সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অগষ্টস্ সীজরের সহিত বিনয়-নম্রতায় উপমিত হইতে পারে? অথবা রোমের কোন্ বীর, শত্রুশাসন, শত্রুপাতন এবং আঘাতের বজ্রনিভ কঠিনতায়, তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া সম্মান পাইবার যোগ্য? অগষ্টস্ সীজর, রাজ্যের দৃঢ়তা রক্ষার জন্য অতি কঠোর কার্য্যও বিনয়ের কৌশলে সম্পাদন করিতেই প্রয়াস পাইতেন, এবং তদানীন্তন সভ্যজগতের সর্ব্বাধিকারী প্রভু হইয়াও আশ্রিত ও আশ্রয়প্রার্থী প্রভৃতি সকলের কাছেই সতত বিনীত রহিতেন। তিনি কখনও সম্রাটের বেশভূষা গ্রহণ করিতেন না, এবং রাজকীয় সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইবার সময়েও একটি সৈনিক কিংবা সেবককে সঙ্গে লইয়া যাইতেন না। কিন্তু তাঁহার ধীর, গভীর, বিনীত ব্যবহারে এমনই এক বিচিত্র শক্তি ছিল যে, তিনি যতই বেশী নত হইয়া চলিতেন, লোকে ততই তাঁহার অনুগত হইত, এবং তিনি যাহাদিগকে প্রিয় বয়স্যজ্ঞানে প্রণয়ের সুখমধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন, তাহারাও তাঁহার কাছে প্রীতি ও ভক্তিতে সতত বদ্ধাঞ্জলি রহিয়া তাঁহার স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে কার্য্য করিত।

বীরচূড়ামণি বোনাপার্টি, তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও বীর-পুরুষদিগের নিকট বজ্রপুরুষ বলিয়াই অভিহিত হইতেন এবং সকলেই তাঁহাকে বজ্রের মত ভয়ঙ্কর মনে করিত। কিন্তু যাঁহারা এই জগতে যশ ও মানের জন্য বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিয়াছেন,—যাঁহাদিগের দৃষ্টিমাত্র নিক্ষেপে একটা দেশের হয় আনন্দো

কল-কোলাহল, না হয়, রোদনের বিকলধ্বনি উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে কে বোনাপার্টির মত বিনয়ী ও নম্র ছিলেন? বোনাপার্টির প্রশান্ত-গাম্ভীর্য্য সুস্থির ভাবকে লোকে বজ্রপাতের প্রাক্‌কালীন সুন্দর, সুখদর্শন ও প্রশান্ত মেঘমালার সহিত তুলনা করিত;—এবং তাঁহার অধরপ্রান্তে হাসির রেখা দৃষ্ট হইলেই বিরুদ্ধাচারী বিদ্বেষীদিগের মনে বজ্রসঙ্গিনী বিদ্যুতের রেখা প্রতিভাত হইত। কিন্তু যাহারা অহোরাত্র তাঁহার সঙ্গে একা অবস্থান করিয়া তাঁহাকে একখানি কাব্যের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিল, তাহারা প্রকৃতই তাঁহাকে কুসুমের মত কোমল এবং নিরতিশয় বিনীত-প্রকৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। কবিবর ভবভূতি লোকোত্তর-পুরুষদিগের চরিতরহস্য চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইঁহা-দিগের হৃদয় বজ্র হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। এই কথাগুলি বোনাপার্টির বিস্ময়াবহ জীবন-চরিতে অক্ষরে অক্ষরে প্রযুজ্য। সমরনায়ক সেনাপতিরা, যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার সময়ে, আপনাদিগের সম্পদ্ ও বৈভবের কতই ঘটা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বোনাপার্টির এ সকল কিছুই ছিল না। তিনি ঐরূপ সময়ে প্রায়শঃই সামান্য সৈনিকের বেশে সৈনিকদিগের সঙ্গে পাদচারে পথ পর্য্যটন করিতেন,—তাহারা যাহা খাইতে পাইত, তাহাই খাইয়া পরিতৃপ্ত রহিতেন, এবং সময়বিশেষে তাহাদিগের মত শ্যামল দূর্ব্বাদলে শয়ন করিয়াই নিদ্রার সুখ-শীতল শান্তি লাভে চরিতার্থ হইতেন। ফলতঃ, তাঁহার অসংখ্য পরিচরেরা যে উন্মত্তের মত তাঁহার উপাসনা করিত, তদীয় ধীর-স্থির বিনয়-নম্রতাই, অন্য দশ প্রকার কারণের মধ্যে তাহার এক প্রধান কারণ। তাঁহার এই রীতি ছিল, তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বে, সন্ধিসূত্রে শান্তিস্থাপনের জন্য, শত্রুর নিকট পুনঃপুনঃ অতি কাতরকণ্ঠে পত্র লিখিতেন, এবং যুদ্ধ যদি একান্তই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত, তাহা হইলে সমরাবসানে 'বিজয়-বৈজয়ন্তী

দোলাইয়া তৎক্ষণাৎই শত্রুপক্ষের নিকট পুনরায় সন্ধি সংস্থাপনের জন্য প্রার্থী হইতেন। তিনি পুনঃপুনঃ জয়লাভের পরেও বিরুদ্ধাচারী রাজাদিগের নিকট স্বহস্তে যে সকল বিনয়পূর্ণ কাতরোক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, অন্য কোন সাধারণ লোক কখনও তদনুরূপ বিনয় দেখাইতে সাহস পায় না। বোনাপার্টি এইরূপ বিনীত ছিলেন বলিয়া স্বার্থসংরক্ষণ বিষয়ে কেহই কি তাঁহাকে শুকদেব অথবা শঙ্করাচার্য্যের মত উদাসীন মনে করিয়াছে ?

পুরাকালে ইয়ুরোপের, তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান সম্রাট্ তেজঃপুঞ্জ সার্‌লিমেন একদা পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে রাজপথে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। একটি দীনমূর্ত্তি ভদ্রসন্তান, সেই সময়ে দূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। সার্‌লিমেন প্রত্যভিবাদনে তাঁহাকে তাহা হইতেও অধিকতর অবনতি এবং সাদর অনুগ্রহের ভাব দেখাইলেন। পারিষদদিগের মধ্যে এক জন, এই আচরণের অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া একটু হাসিতেছিলেন। সম্রাট্ হাসির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া একটুকু ব্যথিত হইলেন এবং সম্মুখস্থ সকলকেই স্মিত-মুখে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন যে,—যাহারা বিধাতার কৃপায় অবনীতে অতি উচ্চস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারা যদি নিজ নিজ স্বভাবের বিকৃতি কিংবা বিড়ম্বনায়, বিনয়-নম্রতার বিবিধ অনুষ্ঠানে একান্ত নীচাশয় কিংবা নিম্নস্থানীয় হন, তাহা হইলে কে তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে সমর্থ হয় ?—কে তাঁহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া নিবৃত্ত রহিতে পারে ?

বিনয়ে যাঁহাদিগের লজ্জা হয়, ভয় হয়, অথবা সাহসের অভাব হয়, বুদ্ধি থাকিলে তাঁহারা এই স্বনাম-ধন্য সম্রাটের নিকট শিক্ষা লইবেন। আর যাঁহাদিগের আত্মা, ভক্তি ও প্রীতি প্রভৃতি উচ্চতর মনোবৃত্তির

অস্বাভাবিক অবনতি হেতু বিনয়ের সুখ-সৌন্দর্য্যে বিরক্ত—বিনয়ের দিকে আকৃষ্ট হইতে অসম্মত, ভরসা করি, তাঁহারাও পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীরদিগের জীবনবৃত্ত সমালোচনা করিয়া বিনয়ের সহিত কর্ম্মফলা নীতি ও উন্নতির কিরূপ দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, উহা বুদ্ধিস্থ করিতে যত্নপর হইবেন

ভালবাসার অত্যাচার।

(স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু অথবা স্নেহ-দয়া-দাক্ষিণ্যশূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি; তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে, আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে. তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতেই হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্ কার্য্য মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন, অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্য্যকর্ত্তা, এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য্য করেন, এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী, এই জন্যই যে, তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারই সদসদ্ বিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি, যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না, এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি



স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই, যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে, বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার, যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণেও তিনি অধিকারী নহেন। যাহাতে আমার কেবল নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্যমাত্রেই অধিকারী, রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে; কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কার্য্যেই পরের অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তি মত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা, পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা। যে এই স্বানুবর্ত্তিতার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা, সমাজ ও প্রণয়ী এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে।

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব্বপণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণজন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্বতত্ত্বদর্শী এবং অনন্ত-জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাসনে এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিরা নীতিবেত্তা নহেন, নীতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন

নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনি এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-কন্যা, ভার্য্যা, স্বামী, আত্মীয়-কুটুম্ব, সুহৃদ্, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে।

* * * *

মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া দারিদ্র্যমোচনের উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময়ে মাতা তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল। মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চির-দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল; কৃতী সহোদরের উপার্জ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার এবং হিন্দুসমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে।

* * * *

যাহা হউক, মনুষ্য-জীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচার-পীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ, সেই পর-পীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়। কোন সমাজে কথন একবারে লুপ্ত হয় নাই।

দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্ম্মের অত্যাচার, তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা কেহই

প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন বা কেহ তেমন সদাসর্ব্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না;—সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা, প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে, কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়; কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে ও স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই,—কেন না, ইহাদের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তি জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটী দেখিলে কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখনও গোস্বামীর মাংসভোজনের উচিত বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না,—কেন না, জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি পরলোকে গোলক প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে। জড়পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুষ্য-জীবন নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন; এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজের প্রয়োজন এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজ-বন্ধনে বদ্ধ না হইলে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে মনুষ্যজীবনের সুনির্ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন; এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না। অপিচ, যেমন বাহুবল

সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মনুষ্য ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য; ধর্ম্মের অত্যাচার আছে বটে এবং ধর্ম্মের অত্যাচার-শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে। কেন না, অত্যাচারশক্তি স্বাভাবিক। যদি ধর্ম্মের অত্যাচার-শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ হিতবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়-সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার-শাসনের জন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব;—এ কথা যথার্থ স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহা ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, স্বার্থপরতা-শূন্য স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না, সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না; কেন না, পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন? অতএব ঐরূপ দর্শনমাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকেই অনেকে অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে;—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপর মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না,

তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুত্রমুখ-দর্শন-সুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল, সেও আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে থাক্;— সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল— নিত্য পুত্রমুখ দর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্যদুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল। এখানে মাতা স্বার্থপর; কেন না, আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী ও প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তসুখকর, কিন্তু অস্বার্থপর— পশুবৃত্ত। কেবল প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়-সুখের অভিলাষী, এই জন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে স্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের, স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষা বলিয়া সাধারণ মনুষ্যস্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে। কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য স্নেহ মনুষ্যহৃদয় স্থাপিত নহে। মনুষ্যের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যস্নেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ কেন না, পশুদিগেরও বৎসস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্যদাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণ নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা; যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায় পুত্রমুখদর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী;

যে প্রণয়ী প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগ ত্যাগ করিতে পারিল সেই প্রণয়ী।

যতদিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মানুষের ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা-কলঙ্ক ঘুচিবে না; এবং স্নেহের যথার্থ স্ফূর্ত্তি ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারা ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ-প্রণয়বিশিষ্ট, মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না—তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র, ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার-নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না,—ধর্ম্ম এক। দুইটিমাত্র মূলসূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে, এবং আত্মচিত্তের স্ফূর্ত্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। "পরের অনিষ্ট করিও না, সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।"—এই মহতী উক্তি জগতীর তাবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল এবং একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্বের সহিত এই মহা নীতিতত্ত্বের ঐক্য আছে; এবং পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতি-শাস্ত্রের সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূলসূত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার

নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন তাঁহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন সুখের জন্য হস্তক্ষেপ করিব না, আপনার ভাবিয়া যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয় করিব, তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

এই কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দশরথকৃত রাম-নির্ব্বাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব, তদ্দারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত। কৈকেয়ী দশরথের উপরে; দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্যে স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রতি যতটা কটূক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বিহিত কি না, বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভকামনা করিয়াছিল। সত্য বটে, পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা মাতা স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ-গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন, তাহাতে তাহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল, তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণবিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেতিহাস তাঁহার যশঃকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া সত্যপালন করায় ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ দস্যুর প্ররোচনায় সুহৃদকে বিনা দোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়? যেখানে সত্যলঙ্ঘনাপেক্ষা সত্যরক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়; কেন না, সত্য নিত্যধর্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব-পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপ-পুণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন যাহা কর্ম্মকর্ত্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক, তাহাই কর্ত্তব্য, যাহা তাঁহার তৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অকর্ত্তব্য, তবে পুণ্য-পাপের প্রভেদ থাকে না—লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব।

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্ম্মনীতির যে মূলসূত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা পরীক্ষা কর।

সত্য কি সর্ব্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাসা, সত্য পালনীয় কেন? সত্যপালনের একটি মূল ধর্ম্মনীতিতে, একটি মূল আত্মসংস্কারনীতিতে। আমরা আত্মসংস্কারনীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি, ধর্ম্মনীতিরই মূল দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র, পরের

অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্ত্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্যপালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমন স্থলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন। এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্যভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিস্কৃত করিলেন, অতএব যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়; অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন; এজন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতাদোষযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ।

অস্বার্থপর প্রেম এবং ধর্ম্ম ইহাদের একই গতি,—একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ, প্রেম এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্বসংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্মনাম প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্ম যতদিন না সার্ব্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার অত্যাচার-নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।

টেলিমেকস।

(স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।)

ট্রয় নিপাতিত হইলে পর, ক্রীতদ্বীপাধিপতি আইডোমানয়স স্বদেশে প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে এমন প্রবল বাত্যা উত্থিত হইল যে, পোতস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই স্থির করিল, পোতবিনাশ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মৃত্যুই সকলের চিন্তাপথের একমাত্র অতিথি হইয়া উঠিল, তদীয় ভীষণ মূর্ত্তিই চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ফলতঃ প্রাণরক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া সকলে কেবল হাহাকার করিতে লাগিল। এইরূপ ঘোর বিপত্তি দর্শনে আইডোমিনিয়স ঊর্দ্ধবাহু ও উত্তাননয়ন হইয়া বরুণদেবের বহুবিধ স্তুতি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার শক্তি ও মহিমা বর্ণন করিতে কোনও ক্রমেই সমর্থ নহি; এই অসীম সাগর আপনার একান্ত আজ্ঞাবহ; আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, কৃপা করিয়া প্রাণদান করুন্; যদি আমি এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারি, তাহা হইলে প্রথমে যাহার মুখ নিরীক্ষণ করিব, তাহাকে আপনার উদ্দেশে বলিদান দিব।"

এ দিকে আইডোমিনিয়সের পুত্র, পিতৃদর্শন নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, সর্ব্বাগ্রে আলিঙ্গনলাভমানসে তীরদেশে তদীয় উত্তরণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঐ হতভাগ্য যুবক জানিতেন না যে, তাঁহার পিতার আলিঙ্গন সংহার-মূর্ত্তি কৃতান্তের আলিঙ্গন সমান হইয়া রহিয়াছে। আইডোমিনিয়স বিষম বাত্যা অতিক্রম করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইয়া বরুণদেবের অশেষবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বরুণদেবের নিকট তিনি যে মানসিক করিয়াছিলেন,

তাহা যে বিষম অনর্থকর হইয়া উঠিল, ইহা তিনি অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে অপরিহার্য্য অতি বিষম অনিষ্ট-ঘটনার বলীয়সী আশঙ্কা উদ্ভূত হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কাতর করিতে লাগিল। তিনি আপন অবিমৃশ্যকারিতা স্মরণ করিয়া সাতিশয় পরিতাপ করিতে লাগিলেন; পাছে কোনও প্রিয়পাত্র প্রথমে তাঁহাব দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই ভয়ে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি নিতান্ত চিন্তাক্রান্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অন্তঃকরণে যার-পর-নাই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে অর্ণবপোত হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইলেন; উত্তীর্ণ হইয়া দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, পরমপ্রেমাস্পদ প্রাণাধিক পুত্রের মুখাবলোকন করিলেন। দর্শনমাত্র তিনি ত্রস্ত ও চকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; তিনি অন্য কোনও ব্যক্তির মুখদর্শন নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তখন আর সেরূপ চেষ্টা করা বৃথা। তাঁহার পুত্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্রুতবেগে নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু পিতা প্রত্যালিঙ্গনাদি কিছুই না করিয়া স্পন্দহীন ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; ইহা দেখিয়া পুত্র সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং পরিশেষে শোকভরে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আপনার মনে কি দুঃখের উদয় হইয়াছে, বলুন। এই দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে কি আপনি দুঃখিত হইতেছেন? হায়! আমি কি হতভাগ্য! আপনি এখন পর্য্যন্তও আমার প্রতি স্নেহপূর্ণ ও করুণাব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। পিতঃ! আমি আপনার কি অপরাধ করিয়াছি, বলুন।" আইডোমিনিয়স শোকে উত্তরোত্তর অধিকতর অভিভূত হইয়া

একটিও কথা কহিতে পারিলেন না; কিয়ৎক্ষণ পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হা বরুণদেব! আমি বিপদে পড়িয়া আপনাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে কি বিষম প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি! কি অনর্থকর নিয়মেই আপনি আমাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন! আমি সাতিশয় কাতরবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সেই মহাভীষণ অর্ণবতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত করুন, তন্মধ্যগত শৈলশেখরে আহত হইয়া আমার কলেবর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাউক, কিন্তু আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করুন।" ইহা কহিয়া আপন তরবারি বিকোষিত করিয়া তিনি স্বীয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু যাহারা তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা তদীয় হস্তধারণপূর্ব্বক, তাঁহাকে সেই উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিল। সফ্রোনিমস নামক একজন প্রাচীন দৈবজ্ঞও তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি আইডোমিনিয়সকে কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! পুত্রনাশ ব্যতিরেকেও বরুণদেব প্রসাদিত হইবেন। তুমি যে মানসিক করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত অন্যায্য ও গর্হিত; নিষ্ঠুরাচরণে দেবতারা প্রীত না হইয়া বরং বিরক্তই হইয়া থাকেন। তোমার ঐরূপ মানসিক করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে, এক্ষণে উহার সম্পাদন নিমিত্ত স্বহস্তে পুত্রহত্যা করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইও না। সম্যক্ বিবেচনা করিতে না পারিয়া একটি কুকর্ম্ম করিয়াছ বলিয়াই, তদনুরোধে ঘোরতর কুকর্ম্মান্তরের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদিই তুমি প্রতিজ্ঞার উল্লঙ্ঘনে ভীত হও, বরুণদেবের পরিতোষার্থ হিমশুভ্র শতসংখ্যক পশু বলিদান দাও, তাঁহার বেদী কুসুমে সুশোভিত কর ও সুগন্ধি ইন্ধন দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া, ধূমমণ্ডলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, তাহা হইলেই তিনি পরম পরিতুষ্ট হইবেন।"

আইডোমিনিয়সের আকার-প্রকার দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়াছেন। তিনি দৈবজ্ঞের বাক্যগুলি শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় হুতাশনবৎ প্রদীপ্ত ও আকার প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, মুখবর্ণ প্রতিক্ষণ বিকৃত ও মনঃক্লেশে সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার পুত্র, তদীয় কষ্ট-দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া, তন্নিবারণাশয়ে কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! এই আমি আপনার সম্মুখে রহিয়াছি, বরুণদেবের প্রসাদনে আর বিলম্ব করিবেন না, অথবা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া তাঁহার কোপানলে পতিত হইবেন না। যদি আমি প্রাণ দিলে আপনার প্রাণরক্ষা হয়, আমি অক্লেশে প্রাণত্যাগ করিতেছি। অতএব, পিতঃ! আমার প্রাণ সংহার করুন্। আপনি কদাচ মনে করিবেন না যে, আপনার পুত্র হইয়া আমি মরণকালে কাতরতা প্রদর্শন করিব।"

শ্রবণমাত্র আইডোমিনিয়স উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহসা স্বীয় তরবারি দ্বারা প্রাণসম প্রিয় পুত্রের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। অব্যবহিত পরক্ষণেই তিনি সেই অস্ত্র আপন বক্ষঃস্থলে প্রবেশিত করিবার উদ্যম করিলে পার্শ্বস্থ সমস্ত লোক বলপূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে তাদৃশ বিষম ব্যবসায় হইতে নিরস্ত করিল। যুবক আহত হইবামাত্র ভূতলে পতিত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর শোণিতে প্লাবিত হইল, নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি উন্মীলিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু আলোক সহ্য করিতে না পারাতে পুনরায় মুদ্রিত হইয়া গেল, আর উন্মীলিত হইল না। রাজকুমার ছিন্নমূল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় ভূতলে পতিত রহিলেন।

পিতা পুত্রশোকে বিহ্বল ও বিচেতনপ্রায় হইয়া কোথায় আছি, কি করিতেছি, কি কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নগরাভিমুখে

প্রস্থান করিলেন এবং প্রস্থান করিতে করিতে 'আমার পুত্র কেমন আছে কি করিতেছে' সম্মুখপতিত ব্যক্তিদিগকে বারংবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, প্রজাগণ রাজকুমারের প্রাণবিনাশ-দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর ও রাজার নৃশংস ব্যবহারে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার সমুচিত দণ্ডবিধানে স্থিরনিশ্চয় হইল। তাহারা ক্রোধভরে ক্ষণকালমধ্যেই অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিল। ক্রীতবাসীরা অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু ঈদৃশ অসম্ভাবিত অন্যায় প্রকারে রাজপুত্রের মৃত্যুসজ্ঘটনদর্শনে ক্রোধে তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ফলতঃ, তাহারা আইডোমিনিয়সকে সিংহাসনের অযোগ্য স্থির করিয়া তাঁহার প্রাতিকূল্যে অভ্যুত্থান করিল। তাঁহার বান্ধবগণ তাঁহাকে এই বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবিলম্বে অর্ণবপোতে লইয়া গেলেন ও পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সাগরপথের পান্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আইডোমিনিয়সের উন্মত্ততা অপগত ও বুদ্ধি-শক্তি প্রত্যাবৃত্ত হইল, তখন তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "বান্ধবগণ! আমি প্রাণসম প্রিয়পুত্রের শোণিতপাত দ্বারা যে স্থান দূষিত করিয়াছি, আমাকে তথা হইতে আনিয়া তোমরা সদ্বিবেচনার কার্য্য করিয়াছ, আমি কোনও ক্রমেই আর সে স্থানের যোগ্য নহি।" অনন্তর তাঁহারা বায়ুবেগবশে হেস্পীরিয়ার উপকূলে উপনীত হইয়াছেন, এবং এক্ষণে সানেষ্টাইসদিগের দেশে এক অভিনব রাজ্য সংস্থাপন করিতেছেন। এইরূপে ক্রীতদ্বীপের সিংহাসন শূন্য হইলে, ক্রীতবাসীরা স্থির করিল যে, মাইনসের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর প্রকৃত পন্থানুসারে রাজ্য শাসন করিতে পারেন, পরীক্ষা করিয়া এরূপ একটি সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্রকে অভিষিক্ত করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে

প্রত্যেক নগরের প্রধান প্রধান নিবাসীরা আহূত হইয়াছেন; পূজা, হোম, বলিদান প্রভৃতি দৈবকার্য্য এই মহৎ ব্যাপারের প্রারম্ভেই আরব্ধ হইয়াছে; প্রশ্নদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যোগ্যতা-পরীক্ষার্থ নিকটস্থ সমস্ত দেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; এবং বল, বিক্রম ও সাহস প্রভৃতির পরীক্ষাকরণার্থ নানাপ্রকার দ্বন্দ্বযুদ্ধেরও আয়োজন হইয়াছে; কারণ, ক্রীতবাসীরা এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের দেশের আধিপত্য একটি পুরস্কারস্বরূপ; যে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক গুণে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবেন, তিনিই সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সংখ্যাবর্দ্ধন দ্বারা জয়লাভ দুরূহ করিবার নিমিত্ত যাবতীয় বিদেশীয় ব্যক্তিবর্গের নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

নসিক্রেটিস, এই সমস্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বর্ণন করিয়া, আমাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কহিলেন, "তোমরা শীঘ্র আমাদিগের সমাজে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আর বিলম্ব করিও না, যদি দৈবকৃপায় তোমরা একজন জয়ী হইতে পার, এই সমৃদ্ধ জনপদের সাম্রাজ্য লাভ করিবে।" ইহা কহিয়া তিনি ত্বরিত-গমনে চলিয়া গেলেন; আমরাও কেবল তাদৃশ অসাধারণ ব্যাপার দর্শনের নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম, জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা বা অবশেষে রাজপদপ্রাপ্তিলালসা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও আমাদের অন্তঃকরণে উদিত হইল না।"

ক্ষণকালের মধ্যে আমরা নিবিড় অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী এক অতি প্রশস্ত রঙ্গভূমিতে উত্তীর্ণ হইলাম; দেখিলাম, মধ্যস্থলে যুদ্ধস্থান প্রস্তুত হইয়াছে; দ্রষ্টৃবর্গ তাহার চতুষ্পার্শ্বে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ক্রীতবাসীরা আতিথ্যবিষয়ে অন্যান্য জাতির অপেক্ষা সমধিক যত্নশীল; সুতরাং তাহারা আমাদিগকে সাতিশয় সমাদরপূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট করাইয়া উপস্থিত

ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার অনুরোধ করিল। বয়োবাহুল্যবশতঃ মেণ্টর অস্বীকার করিলেন, অস্বাস্থ্যপ্রযুক্ত হেজেলও অসম্মত হইলেন; কিন্তু আমার যে প্রকার বয়স ও শরীরের যেরূপ ওজস্বিতা, তাহাতে আমার আর অস্বীকারের কোনও পথ ছিল না। যাহা হউক, আমি মেণ্টরের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি সম্মত আছেন; অতএব আমি প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলাম। তদনুসারে তাহারা, আমার পরিচ্ছদ উন্মোচনপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া অন্যান্য যোদ্ধৃগণের মধ্যে আমাকে উপবিষ্ট করাইল। অনেকানেক ক্রীতবাসীরা আমাকে শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিল; তাহারা এক্ষণে আমার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিল; সুতরাং অবিলম্বে প্রচারিত হইয়া উঠিল যে, ইউলিসিসের পুত্র সাম্রাজ্যের প্রার্থী হইয়াছেন।

প্রথমতঃ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রোড্‌স্‌দ্বীপবাসী এক ব্যক্তি মল্ল প্রার্থী ছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বোধ হইতে লাগিল; তখন পর্য্যন্তও তাঁহার বল ও বিক্রমের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; ফলতঃ, তিনি একজন বীরপুরুষমধ্যে পরিগণিত। একে একে সমস্ত যোদ্ধৃগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন, কেবল আমিই অবশিষ্ট রহিলাম। আমার ন্যায় দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় দ্বারা তাঁহার সম্মানলাভ হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া ও আমাকে নিতান্ত তরুণবয়স্ক দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হওয়াতে তিনি মল্লভূমি হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু আমি যুদ্ধার্থে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমরা অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম এবং পরস্পর নানাপ্রার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে ভূতলে ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; আমি তাঁহাকে ভূমিতে ফেলিয়া তাঁহার উপর উঠিয়া

বসিলাম; সমস্ত দ্রষ্টৃবর্গ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, 'ইউলিসিস-তনয়ের জয়'। অনন্তর আমি হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভূতল হইতে তুলিলাম, তিনি লজ্জানম্রমুখে চলিয়া গেলেন।

তদনন্তর মুষ্টি-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ অপেক্ষা বিলক্ষণ কঠিন। সেমসদ্বীপবাসী কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্র যুদ্ধার্থী ছিলেন; তিনি ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে এরূপ বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীগণ বিনা যুদ্ধেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন; কিন্তু আমি অস্বীকার করিলাম। প্রথমতঃ তিনি আমার মস্তক ও উদরের উপর এরূপ দৃঢ় মুষ্টিপ্রহার করিলেন যে, আমার নাসিকা ও মুখ দ্বারা শোণিত নির্গত হইতে লাগিল; নয়নযুগল নিবিড় নীথরিকায় আচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল; মস্তক বিঘূর্ণিত, শরীর নিতান্ত ক্লান্ত, নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পুনরায় আক্রমণ করিলেন; আমি পরাভূত হইয়া ভূতলে পড়িতেছি, এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম মেণ্টর বলিতেছেন, "অহে ইউলিসিস-তনয়! তুমি কি পরাজিত হইবে?" মিত্রের স্বর শ্রবণে আমি অভিনব সাহস ও বলপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পুনরায় যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল। পরিশেষে অশেষ কৌশলে আমি তাঁহাকে ভূতলে ফেলিলাম এবং পতনমাত্র তাঁহার দিকে হস্তপ্রসারণ করিলাম; কিন্তু তিনি আমার হস্তগ্রহণে অস্বীকার করিয়া স্বয়ং শোণিতপঙ্কাবৃতশরীরে ভূমি হইতে উঠিলেন। পরাভব-লজ্জায় তাঁহাকে মৃতপ্রায় হইতে হইল; তিনি পুনর্যুদ্ধে সাহস করিতে পারিলেন না।

তদনন্তর রথযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে রথ মনোনীত করিয়া লইতে পারিল না, যাহার ভাগে যাহা পড়িল, তাহাকে তাহাই লইতে হইল। ঘটনাক্রমে অত্যন্ত অপকৃষ্ট রথই

আমার ভাগ্যে পড়িল। আমরা কয়জন আরূঢ় হইয়া আপন আপন রথ চালাইতে লাগিলাম। সকলেরই রথ অত্যন্ত বেগে ধাবমান হইল, কিন্তু আমি তাদৃশ বেগ না দিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সকলেরই অশ্ব নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে আমি আপন অশ্বদিগকে সম্পূর্ণবেগে চালাইতে লাগিলাম এবং সর্ব্বাগ্রে নির্ণীত স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহা দেখিয়া সমস্ত দ্রষ্টৃবর্গ পুনর্ব্বার এই বলিয়া উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল, "ইউলিসিস-তনয়ের জয়! এই ব্যক্তিকেই দেবতারা আমাদিগের রাজ্যেশ্বর স্থির করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।"

তদনন্তর অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও পূজনীয় ক্রীতবাসিগণ আমাদিগকে এক কাননের মধ্যে লইয়া গেলেন। ঐ কানন বহুকালাবধি অতি যত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; উহা কখনও কোনও ধর্ম্মদ্বেষী ইতর জনের পদস্পর্শে দূষিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-সমূহ যথাবৎ প্রতিপালিত হইবে ও প্রজাগণের পক্ষে সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার হইবে, এই উদ্দেশ্যে মহাত্মা মাইনস যে কতিপয় পরম প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আসিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় এক সভা হইল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ব্যতিরেকে আর কোনও ব্যক্তি ঐ সভায় প্রবেশ করিতে পাইল না। প্রাজ্ঞেরা আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা অতি প্রাচীন; তাঁহাদের আকারে অব্যাহত বুদ্ধিশক্তি ও প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহারা অত্যল্প কথা কহিতেন; কিন্তু যাহা বলিতেন, সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া সেরূপ বলিতে পারা যায় না। যখন তাঁহাদের পরস্পরের মত বিভিন্ন হইতে লাগিল, তাঁহারা এরূপে স্ব স্ব পক্ষের

রক্ষা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে মতবৈষম্য ঘটিয়াছে বলিয়া কেহ বুঝিতে পারিল না। ভূয়সী অভিজ্ঞতা ও সাভিনিবেশ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিবেকশক্তি ও বিপুল জ্ঞান জন্মিয়াছিল; দুর্দ্দান্ত ভোগাভিলাষের ঔদ্ধত্য বহুকালাবধি তাঁহাদিগের চিত্তভূমি হইতে অপসারিত হইয়াছিল; সুতরাং অসামান্য প্রশান্তচিত্ততাই তাঁহাদের তাদৃশ বিবেকশক্তির প্রধান কারণ। তাঁহাদের কার্য্যমাত্রেরই উদ্দেশ্য জ্ঞান, আর অবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের কুপ্রবৃত্তি-সকল এরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল যে, জ্ঞানামৃতপানে মগ্ন থাকিয়া তাঁহারা অবিরত বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিতেন। আমি কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদিগকে বিস্ময় স্তিমিত-নয়নে নিরীক্ষণ করিলাম এবং সহসা যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া একেবারেই তাদৃশ অভিলষণীয় বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হই, এই বাসনা আমার অন্তঃকরণে উদিত হইল; কারণ, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যৌবনাবস্থা মনুষ্যের অশেষ অনর্থ ও অসুখের আস্পদ। যুবা ব্যক্তিরা দুর্দ্দান্ত ভোগাভিলাষের নিতান্ত পরতন্ত্র হইয়া অনায়াসেই ধর্ম্মমার্গ অতিক্রম করে।

সভাপতি এক প্রকাণ্ড পুস্তক উদ্‌ঘাটিত করিলেন; উহাতে মাইনসের সমস্ত নীতিশাস্ত্র লিখিত আছে। উহা সুগন্ধি দ্রব্যপূর্ণ সবুজ পেটকে অতি যত্নে নিবদ্ধ থাকে। পুস্তক বহির্গত হইবামাত্র প্রাজ্ঞেরা প্রগাঢ় ভক্তি-প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, "যে সকল নিয়ম দ্বারা জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখের বৃদ্ধি হয়, তাহাদের তুল্য পবিত্র ঐহিক পদার্থ আর কিছুই নাই। যাঁহারা অন্যান্য লোকের শাসনার্থে এই সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজেও সেই সকল নিয়ম দ্বারা শাসিত হওয়া আবশ্যক; কারণ, ব্যক্তিবিশেষে শাসনকর্ত্তা না হইয়া, তত্তৎ নিয়মেরই শাসনকর্তৃত্ব থাকা উচিত।" প্রাচীন প্রাজ্ঞমণ্ডলী

এইরূপে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তদনন্তর সভাপতি তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিয়া দিলেন, মাইনসের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। প্রথম প্রশ্ন এই ;—সম্পূর্ণ স্বাধীন কে ? একব্যক্তি কহিল, যে রাজার অপ্রতিহত প্রভুশক্তি আছে ও যিনি স্বীয় সমস্ত অরিকুল পরাজিত করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর একজন বলিল, যাহার এরূপ ধন আছে যে, যাহা ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনও ব্যক্তি বলিল, যে বিবাহ করে নাই এবং কোনও রাজার শাসনাধীন না হইয়া চিরকাল দেশভ্রমণ করে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। কেহ কেহ বলিল, যে পুলিন্দ মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ নরসমাজের সহিত কোনও সংস্রব বা মানবজাতির প্রয়োজনোপযোগী কোন পদার্থে অভিলাষ না রাখিয়া অরণ্যে বাস করে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্যেরা কহিল, যে দাস অল্পক্ষণমাত্র দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, সেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ; কারণ, দীর্ঘকালীন দাসত্ব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়াতে, স্বাধীনতা যে কত মধুর, তাহা তখনই সে বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে। অপরেরা বলিল, যাহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন ; কারণ, মৃত্যুই সকল শৃঙ্খলের ভেদ করিয়া দেয় ও মৃত ব্যক্তির উপর কাহারও কোন ক্ষমতা চলে না।

এইরূপে সকলে উত্তর প্রদান করিলে পর, আমি বলিলাম, "দাসত্ব অবস্থাতেও যাহার স্বাধীনতার বিলোপ না হয়, সেই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে ভয় করে এবং তদ্ব্যতিরেকে আর কাহা হইতেও ভীত না হয়, কেবল সেই ব্যক্তিই সকল অবস্থায় স্বাধীন। ফলতঃ, যে ব্যক্তি ভয় ও বাসনার বশীভূত না হইয়া কেবল বিবেকশক্তির ও দেবভক্তির অধীন হইয়া চলে, সেই ব্যক্তি যথার্থ স্বাধীন।" প্রাচীনেরা

আমার উত্তর শ্রবণে প্রীত হইয়া সস্মিত-বদনে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং মাইনসের উত্তরের সহিত আমার উত্তরের একবাক্যতা হইল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ;—কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী ? যাহার মনে যাহা উদিত হইল, সে সেইরূপ উত্তর দিল। একজন বলিল, যাহার ধন, স্বাস্থ্য ও সুখ্যাতি নাই, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। আর একজন বলিল, সংসারে যাহার বন্ধু নাই, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। কেহ কেহ বলিল, যাহার সন্তানগণ ভ্রষ্টাচার ও কৃতঘ্ন হইয়া উঠে, তাহার অপেক্ষা অসুখী আর কেহই হইতে পারে না। লেসবস-নিবাসী এক অতি বিখ্যাত প্রাজ্ঞ বলিলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে অসুখী জ্ঞান করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী ; কারণ, সুখ ও অসুখ মনের ধর্ম্ম, অসহিষ্ণুতাতে যাদৃশ অসুখ জন্মে, বাস্তবিক দুরবস্থাতেও কদাচ সেরূপ হয় না। অশুভ ঘটনার স্বাভাবিকী অসুখোৎপাদিকা শক্তি নাই, যাহার পক্ষে অশুভ ঘটে, সেই ব্যক্তির মনের গতি ও অবস্থাবিশেষই অশুভ ঘটনার তাদৃশ শক্তি উৎপাদন করে। এই উত্তর শ্রবণমাত্র সকলে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিল এবং বিবেচনা করিল, এই প্রশ্নে ঐ ব্যক্তিই জয়ী হইলেন। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম "যে রাজা মনে করেন যে, অন্যান্য লোককে অসুখী করিলেই আপনি সুখী হইতে পারিবেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। অনভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার অসুখের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। কারণ, কি নিমিত্তে অসুখ জন্মিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না ; সুতরাং সেই অসুখের কোনও প্রতিবিধানও হয় না ; বাস্তবিক, তিনি অসুখের কারণ অবগত হইতে ভীত হন এবং মিথ্যাবাদী প্রতারক চাটুকারগণে সতত পরিবেষ্টিত থাকেন, তাহারা তাঁহাকে কোনও বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে

দেয় না। তিনি দাসবৎ আপন ভোগবিলাসের পরিতোষ সম্পাদনে সতত রত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে একান্ত পরাঙ্মুখ ও হিতানুষ্ঠানজনিত সুখের আস্বাদনে চিরকাল বঞ্চিত থাকেন, এবং ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে যে অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ হয়, তাহা কখনও তাঁহার হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয় না। তিনি বিষম অসুখে কালক্ষেপ করেন বটে, কিন্তু সেই অসুখ তাঁহার উপযুক্ত দণ্ড। তাঁহার মনঃপীড়ার ইয়ত্তা থাকে না; উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই থাকে। পরিশেষে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে চিরকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।" এই কথা শুনিয়া প্রাজ্ঞেরা কহিলেন যে, আমি মাইনসের যথার্থ অভিপ্রায়ানুরূপ উত্তর দিয়াছি, অতএব আমি জয়ী হইলাম।

তৃতীয় প্রশ্ন এই;—রণপণ্ডিত ও বিজিগীষু, অথবা রণকৌশলানভিজ্ঞ, কিন্তু শান্তশীল ও রাজকার্য্যদক্ষ, এই প্রকারের মধ্যে কোন্ রাজা উত্তম? অধিকাংশ ব্যক্তি বলিল, বিজিগীষু রাজা উত্তম। তাহারা এই কারণ দর্শাইল যে, রাজা সমরকালে স্বদেশরক্ষায় অসমর্থ হইলে, তাঁহার রাজকার্য্য-নৈপুণ্য ফলোপধায়ক হয় না; তাঁহার প্রভুশক্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়া যায়; প্রজাগণ শত্রু-হস্তে পতিত হয়। কোনও কোনও ব্যক্তি বলিল, শান্তশীল রাজা উত্তম; কারণ, যেমন তিনি রণে ভীত হইবেন, তেমনই যাহাতে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইতে না পায়, তদ্বিষয়েও সাবধানে থাকিবেন। কেহ কেহ এই উত্তরের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল; দেখ, বিজিগীষু নরপতি বিপক্ষ-জয় দ্বারা যে কেবল স্বীয় যশোবৃদ্ধি করেন এমন নহে, তাঁহার প্রজারাও দিগ্বিজয় দ্বারা দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি স্থাপন করে; কিন্তু শান্তশীল রাজার প্রজাগণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ্ হইয়া বাস করিতে করিতে পরিশেষে অত্যন্ত অলস, ভীরুস্বভাব ও কাপুরুষ হইয়া উঠে। তদনন্তর আমার

মত জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম,—“শান্তিকালে সুপ্রণালীতে রাজকার্য্যনির্ব্বাহে নৈপুণ্য ও সমরকালে অপ্রধৃষ্যভাবে রণ-কৌশল-প্রদর্শন, রাজার এই উভয় গুণসম্পন্ন হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। যিনি এই উভয়ের একতর গুণে বিহীন, তিনি প্রকৃত রাজার অর্দ্ধাংশমাত্র; কিন্তু যিনি শান্তিকালে রাজকার্য্যনির্ব্বাহে সম্যক্ প্রবীণ, অথচ স্বয়ং রণ-পণ্ডিত না হইয়াও সংগ্রামকালে উপযুক্ত সেনাপতি দ্বারা স্বীয় রাজ্যের রক্ষাকার্য্য সমাধান করিতে পারেন, তাদৃশ রাজা, আমার মতে, নিরবচ্ছিন্ন রণ-পণ্ডিত রাজার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রণ-পণ্ডিত রাজা দিগ্বিজয়-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই সংগ্রাম-ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন এবং তদ্দ্বারা স্বকীয় প্রজাগণের উচ্ছেদ-সাধন করেন। তিনি যে জাতির রাজা, যদি সেই জাতিকে তদীয় বিজিগীষানিবন্ধন অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তিনি যত রাজ্য জয় করুন না কেন, তাহাতে তাহাদের কোনও উপকার বা ইষ্টাপত্তি নাই। সমরানল বহুকাল প্রজ্বলিত থাকিলে রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং সেনাপতি ও সৈনিক পুরুষদিগের চরিত্র কলুষিত হইয়া উঠে। দেখ, ট্রয় নগরের পরাজয় করিতে গিয়া গ্রীস দেশের কত দুরবস্থা ঘটিয়াছে; তদন্তঃপাতী প্রায় সমস্ত রাজ্য ক্রমাগত দশবৎসর কাল রাজশূন্য থাকিয়া কিরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। আর যে দেশে যখন সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সে দেশে সর্ব্বপ্রকারে দুরবস্থার একশেষ ঘটে; রাজ্য-শাসন, কৃষি, বাণিজ্য, বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির এককালে লোপাপত্তি হইয়া উঠে। যে দেশের রাজা দিগ্বিজয়প্রিয়, সে দেশের লোকদিগকে অবশ্যই তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোনও রাজ্যের জয়কার্য্য সমাধান হইলে জেতা ও বিজিত উভয়েরই প্রায় সমান সর্ব্বনাশ হয়,

কেবল রাজা বিজয়ী হইলাম, এই ভাবিয়া অভিমানে উন্মত্ত হন। সেই রাজা রাজ্যশাসনকার্য্যে একান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং যুদ্ধে জয়ী হইয়াও সেই জয় দ্বারা সাধারণের কোনও উপকার করিতে পারেন না। বাস্তবিক তাদৃশ রাজা প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি সংবর্দ্ধনের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেন না; ভূমণ্ডলে কেবল বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার ও অনর্থপাত ঘটাইবার নিমিত্তই তাঁহার জন্ম হয়।

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শান্তশীল রাজা দিগ্বিজয়-ব্যাপারে সমর্থ বা অভিজ্ঞ নহেন, অর্থাৎ যে সকল জাতির সহিত তাঁহার কোনও সংস্রব বা যাহাদের উপর কোনও প্রকার অধিকার নাই, সেই সেই জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা অস্থির, বিবাদপরায়ণ ও রণোন্মত্ত হইয়া আপন প্রজাদিগকে তত ক্লেশ প্রদান করেন না। কিন্তু যদি তিনি ন্যায়পরায়ণ ও রাজ্য-শাসনকার্য্যে সম্যক্ পারদর্শী হন, তাহা হইলে, তদীয় প্রজাদিগকে কখনও বিপক্ষের আক্রমণ নিবন্ধন উৎপাতগ্রস্ত হইতে হয় না। তদীয় অবিচলিত ন্যায়পরতা, মিতাকাঙ্ক্ষিতা, অপক্ষপাতিতা প্রভৃতি গুণ-দর্শনে সকলেই তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সকলেই তাঁহার মৈত্রীশৃঙ্খলে আবদ্ধ হন; তিনিও যাহাতে সেই মৈত্রীর উচ্ছেদ বা ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, কদাচ তাদৃশ আচরণ করেন না এবং যে অঙ্গীকার করেন, প্রাণান্তেও তৎপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন না। এই সমস্ত কারণে তিনি প্রতিবেশী নৃপতিদিগের বিশ্বাসভূমি, প্রণয়াস্পদ ও ভক্তিভাজন হইয়া কালযাপন করেন। তাঁহা-দিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদভঞ্জন করিয়া দেন, কেহই তাঁহার মীমাংসায় অসন্তোষ প্রদর্শন করেন না। যদি কখনও কোনও দুর্বৃত্ত নরপতি দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী

হইয়া তদীয় অধিকার আক্রমণ করেন, তদীয় মিত্রভাববদ্ধ নৃপতিগণ সমবেত হইয়া সাহায্যদান করতঃ সেই আক্রমণের নিবারণ ও সেই দুরাকাঙ্ক্ষ নরপতিকে সাধারণের শত্রু জ্ঞান করিয়া যথোচিত প্রতিফল প্রদান করেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও রাজ্যশাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ও বিলক্ষণ পারদর্শী, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করেন, যাহাতে তাহাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরাগ ও অসৎপ্রবৃত্তি পরিহার হয়, তদ্বিষয়ে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকেন, এজন্য তাঁহার নিজ প্রজাগণ তাঁহার প্রতি পিতৃভক্তি প্রদর্শন করে। ফলতঃ, যে রাজার শাসনগুণে রাজ্যের যাবতীয় লোক সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে, তাঁহারই রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করা সার্থক এবং তাদৃশ ব্যক্তিরই রাজ শব্দে উল্লিখিত হওয়া উচিত। যদিও তিনি নিজে আবশ্যক সময়ে সমর-ব্যাপারে অপারগ হন, নিযুক্ত সেনাপতিগণ দ্বারা অনায়াসে তাহার সম্যক্ সমাধান হইতে পারে। তিনি রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, এজন্য যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকেই নিযুক্ত করিবেন; সুতরাং তাঁহার নিয়োজিত সেনাপতিরা প্রকৃতরূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব তাদৃশ নৃপতির সমর-ব্যাপারে অনভিজ্ঞতারূপ যে ন্যূনতা থাকে, অনায়াসেই তাহার পরিহার হইতে পারে। এই সমস্ত হেতু বশতঃ, আমার মতে শান্তশীল রাজা বিজিগীষু রাজার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।”

আমার উত্তর শ্রবণ করিয়া অনেকেই অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিলাম না; কারণ, সাধারণ লোকে সকল বিষয়ে ধূমধাম দেখিলেই প্রীত হইয়া থাকে। বিজিগীষু রাজা দিগ্বিজয়-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া বিজয়ী হইলে লোকে যে পরিমাণে তাহাকে প্রশংসা ও সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকে, শান্তশীল রাজা রাজ্য-

শাসনে ও প্রজাপালনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া কদাচ তদনুরূপ প্রশংসা ও সাধুবাদ লাভ করিতে পারেন না। যাহা হউক, প্রাজ্ঞেরা বলিলেন, "আমি যাহা কহিলাম, মাইনসের অভিপ্রায়ের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়াছে। সভাপতি কহিলেন, অদ্য আপলোদেবের অভিপ্রায় সম্পন্ন হইল। মাইনস্ তাঁহার নিকট এই জানিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমি যে বিধি প্রতিষ্ঠিত করিলাম, আমার সন্তান-পরম্পরা কতকাল তদনুসারে রাজাশাসন করিবে?" তাহাতে তিনি এই উত্তর পাইয়াছিলেন যে, যখন কোনও বৈদেশিক তোমার প্রতিষ্ঠিত বিধির প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া ঐ বিধির আধিপত্য স্থাপন করিবে, তখন তোমার বংশের রাজ্যাধিকার নিবৃত্ত হইবে। আমরা মনে করিয়াছিলাম, কোনও দেশান্তরীয় দুর্বৃত্ত নরপতি আমাদের এই দ্বীপের জয় ও অধিকার করিবে; কিন্তু ইউলিসিসের পরম প্রাজ্ঞ পুত্র ঐ দেববাণীর যথার্থ অর্থোদ্ভেদ করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ হইতে সেই বিষম আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ত্বরায় তাঁহাকে অভিষিক্ত ও সিংহাসনে সন্নিবেশিত করা যাউক।

ভক্ত হরিদাস।

(স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ-বিদ্যাসাগর।)

বঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের প্রথম পরিচয় অথবা প্রথম প্রকাশ বেণাপোল নামক বনভূমির মধ্যে বনের তৃণলতাদ্বারা বিরচিত বিজন কুটীরে। এই বেণাপোল এখনকার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত একটি অপরিচিত স্থান। হরিদাসের প্রথম বয়সে তদীয় জন্মস্থান বুঢ়ন গ্রামে মাঝে মাঝে তাঁহার যাতায়াত থাকা সম্ভব। কিন্তু তিনি যখন অকৃতদার অবস্থায় গৃহবাসের সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য সুখের নিকট জন্মের মত বিদায় লইলেন, তখন ঐ বেণাপোলের দুর্গম বনই কিছুকালের তরে তাঁহার বাসস্থান হইল।

"হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা,
বেণাপোলের বন মধ্যে কতো দিন রহিলা।"

বেণাপোলের বনভূমির মধ্যে অকস্মাৎ একটি দীপ জ্বলিল,—বনভূমির গভীর অন্ধকার কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যুদ্দাম-বিভাষিত নিবিড় নীল মেঘের ন্যায় পথিকের চক্ষে প্রতিভাত হইল। সে বন হরিদাসের ভক্তির প্রভাবে প্রকৃতই উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং বনের অদূরবর্ত্তী গৃহস্থেরা নানা শ্রেণীর লোকের নিকট হরিদাসের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়া ক্রমে তাঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল।

এই পৃথিবীর যেখানে মাটিতে একটুকু মিষ্ট বস্তু পড়িয়া রহে, সেই খানেই ক্রমে পিপীলিকার একটি হাট হইয়া থাকে। মানুষের চিত্তবৃত্তি মিষ্ট বস্তুর অন্বেষণে পিপীলিকার উপমাযোগ্য। হরিদাস আপনাকে দীনের দীন জ্ঞানে, দীনবন্ধুর পদারবিন্দধ্যানে বনভূমির বিজন-নিবাসে লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ও রসনায় একটুকু মিষ্টবস্তু ছিল। যেই-

লোকে জানিতে পারিল, অমনই তাঁহার কুটীরের চারিপার্শ্বে পিপীলিকার হাটের মত মানুষের হাট বসিল।

এইরূপ মানুষের হাট ভক্তের দুয়ারে তখনও পরিলক্ষিত হইত, এবং এখনও গ্রামে, নগরে,—গ্রামের বাহিরে,—নগরের উপকণ্ঠে,—অথবা পাহাড়ে ও প্রান্তরে প্রতিদিন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে ভক্তের কোন মহিমা নাই, মহিমা এক দিকে মনুষ্যের প্রকৃতিনিহিত ভক্তির, আর এক দিকে ভক্তির পরমারাধ্য ও চরমভোগ্য ভগবান জগদীশ্বরের। কারণ, জীবের সহিত জগদীশ্বরের সম্বন্ধ বড় গাঢ়,—বড় ঘনিষ্ঠ। মাতৃ-স্তন্যের সহিত শিশুর,—মৃত্তিকার সহিত তৃণ-লতার, অথবা জলের সহিত মৎস্যাদি জলজন্তু মাত্রের যে সম্বন্ধ, জীবের সহিত জগজ্জীবন ও জগন্নিবাস জগদীশ্বরের তাহা অপেক্ষাও অনন্ত গুণে ও অনন্ত প্রকারে অধিকতর নিকট সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ এত বেশী দৃঢ়বদ্ধ,—এমন অনির্ব্বচনীয়, এমনই সুখ-সুন্দর ও মধুর যে, মানুষের আত্মা তাহার মর্ম্ম বুঝিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে, কিন্তু কোন শাস্ত্রই প্রকৃত তত্ত্বের শেষ সীমায় পঁহুছিতে পারে নাই ; এবং যাহা বা আত্মায় অনুভূত হইয়াছে, মনুষ্যের ভাষা তাহাও অদ্য পর্য্যন্ত সম্যক্ পরিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই।

যুগান্তর হইল, পুরাতন ঋষিরা, জীব ও জগদীশ্বরের নিকট-সম্বন্ধ-জনিত মহাতত্ত্ব আত্মায় কতকটা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং এই হেতুই তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই আরাধনার ধনকে কখনও প্রাণের প্রাণ—চক্ষুর চক্ষু—শ্রোত্রের শ্রোত্র ও মনের মন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; কখনও বা তাঁহাকে পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে অধিকতর প্রীতিকর এবং সংসারের অন্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থ হইতেই অধিকতর আনন্দপ্রদ ও আত্মার অন্তরতম বস্তু বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যাহাদিগের অন্তরে সামান্য একটুকু ভক্তির

স্ফুরণ আছে, তাহারা এখনও এই মহাসত্য সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কেমন এক প্রকার অতৃপ্তির ভাবে অধীর হয়, এবং এই পৃথিবীর কোথায় যাইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে—হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া অবসন্ন রহে।

মনুষ্য তাহার প্রাণ, মন এবং হৃদয় ও আত্মার সূত্রে সূত্রে ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জগদীশ্বরের সহিত জড়িত রহিয়াও যে সংসারের সুখের ক্ষণিক মোহে তাঁহাকে ভুলিয়া রহে, ইহাও কৃপাসিন্ধু জগদীশ্বরেরই কৃপার নিদর্শন। কারণ, সদ্যোজাত শিশুর অশক্ত, অপটু ও অতি কোমল চক্ষু সহসা যদি সূর্য্যরশ্মির সন্নিহিত হয়, তাহা হইলে উহা সেই মুহূর্ত্তেই বিপন্ন হইয়া পড়ে, এবং মনুষ্যের আত্মাও যদি জীবনের স্তরে স্তরে, কর্ম্মজন্য শিক্ষার সাহায্যে, উপযুক্ত শক্তি লাভ না করিয়া, সহসা সেই জগৎসূর্য্য জগদীশ্বরের অনন্ত তেজোময় অনন্ত প্রভাবের সন্নিহিত হয়, তাহা হইলে তাহার উন্নতির পথে ঘোরতর বিঘ্ন ঘটে। নহিলে মনুষ্য, জগদীশ্বরের দর্শনলাভে বঞ্চিত রহিবে কেন? মনুষ্যের প্রাণটা যেখানে রহিয়াছে, সেই প্রাণের প্রাণ পূর্ণস্বরূপও ঠিক সেই খানেই পিতা মাতা পরিত্রাতা এবং সর্ব্বসম্পদ্-বিধাতা সুহৃদের ন্যায়, সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। মনুষ্য তাহার এমন জনকে একবারেই উপলব্ধি করিতে পারে না কেন?

কিন্তু, যদিও চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কর্ণ তাঁহার কথা শুনিতে অধিকারী হয় না, তথাপি মনুষ্য তাঁহারই জন্য অজ্ঞাতসারে আকুল রহে, এবং যেখানে তাঁহার কোনরূপ আবির্ভাবের লক্ষণ দেখে, তাঁহার কোনরূপ পরিচয় পাওয়ার আশা পায়, অথবা তাঁহার বিশেষ কোন কৃপার চিহ্ন থাকা অনুমান করে, মনুষ্য সেখানেই মধুলুব্ধ পিপীলিকার মত ঝুকিয়া পড়ে। এই জন্যই তীর্থে তীর্থে লোকারণ্য, যেখানে অলৌকিকতার অনুমাত্র গন্ধ, সেখানেই লোকের ভিড়, এবং এই জন্যই ভক্তের দুয়ারে

চিরকাল মানুষের হাট। ভক্তের কথা দূরে থাকুক, যাহারা আকারে প্রকারে, আহারে ও আচারে অথবা পরিচ্ছদাদির বিচিত্রতায় ভক্তির কোন না কোনরূপ কৃত্রিম ভেক ধারণ করিয়া, পদ-প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব ও স্বর্গ, অথবা অন্যবিধ পার্থিব সুখসম্পদের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, মনুষ্য সে সকল ভক্তিব্যবসায়ীরও সঙ্গ ছাড়ে না। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভক্তের দুয়ারে সর্ব্বত্রই যে মানুষের হাট যোটে, ইহাতে ভক্তের কোন মহিমা নাই, মহিমা এক দিকে ভক্তির, আর এক দিকে ভগবানের। হরিদাসের সে কুটীরের দুয়ারেও, অল্প সময়ের মধ্যেই হাট মিলিল। কিন্তু যাহারা সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিল, তাহারা জগদীশ্বরের কৃপায় ধীরে ধীরে প্রাণে শীতল হইল। কেন না, হরিদাস প্রকৃত ভক্ত। তাঁহার ভেক ছিল না; ছিল শুধুই ভক্তি।

হরিদাস তাঁহার কুটীরের নিকট একটি তুলসী তরু রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যোদয়ের একটুকু পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করিতেন, এবং তারপর তুলসীর মূলে জল সেচন করিয়া তাঁহার সেই তৃণ-কুটীরে নামজপে নিবিষ্ট হইতেন। তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্য যেমন পাপিষ্ঠ হউক না কেন, সে যদি অন্য মনে কিংবা নিতান্ত অনিচ্ছায়ও তাহার জিহ্বায় অমৃতময় হরিনাম উচ্চারণ করে, তাহার পাপতাপ তাহা হইলে ভস্মীভূত হয়। হরিদাসের এই সজীব বিশ্বাস স্বর্গ-সম্পদ্ হইতেও অধিকতর মূল্যবান্। এ সংসারে কয় জনে এমন বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে?

লোকে নামজপ করে নীরবে, হরিদাস জপ করিতেন পরিশ্রুত স্বরে। তিনি কুটীরে বসিয়া এমন সুমধুর ধ্বনিতে হরিনাম উচ্চারণ করিতেন যে, লোকের প্রাণে তাহা সঙ্গীতের ন্যায় সুখজনক হইত এবং সেই এক প্রকার নাম-সংকীর্ত্তন শুনিবার জন্য, দিবসের প্রায় সকল সময়েই বহু

লোক তাঁহার আশ্রমের অদূরে বসিয়া থাকিত। হরিদাসের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, যাহারা দৈবাৎও কদাপি পরের মুখে হরিনাম শুনিতে পায়, তাহারাও পাপের শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভব-সাগর তরিয়া যায়। তিনি যে পরিশ্রুত স্বরে জপ করিতেন, ইহাই তাহার মুখ্য কারণ।

ঠাকুর হরিদাস সমস্ত দিন নাম জপের এইরূপ নির্ম্মল আনন্দে অতিবাহিত করিতেন, এবং সন্ধ্যার খানিক আগে, বনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী মুষ্টিমিত অন্ন ভিক্ষা স্বরূপ চাহিয়া লইতেন। যথা, চরিতামৃতে—

"নির্জন বনে কুটীর, করি তুলসী সেবন,
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহন,
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।"

হরিদাসের নিয়ম ছিল, প্রতি মাসে এক কোটি জপ। সুতরাং প্রতি দিন অন্ততঃ তিন লক্ষ নাম জপ না হইলে তাহার সংখ্যা পূর্ণ হইত না। ইহা দিবামানের দ্বাদশ ঘটিকায় অসম্ভব। হরিদাস এই নিমিত্ত সন্ধ্যার পর আবার আসনে বসিয়া নাম-জপ অথবা উল্লিখিত রূপ নাম-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিতেন এবং যতক্ষণ না তাঁহার সেই সঙ্কল্পিত তিন লক্ষ সংখ্যা সম্পূর্ণ হইত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান-স্তিমিত মহাযোগীর ন্যায় উপবিষ্ট রহিতেন।

এইরূপ নাম-জপ গীতা ও ভাগবতে জপ-যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। মনুসংহিতা গীতার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। মনস্বিকুলের অগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী মনুও ভগবানের নাম-জপকে জপ-যজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহাকে তৎকাল-প্রচলিত অশ্বমেধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঈদৃশ জপের

প্রকৃত অর্থ কি? ইহাতে কি জীবনের কোনরূপ সার্থকতা ঘটে, অথবা ইহা কি সাধনার পথে কোন অংশেও জীবের সহায় হইয়া থাকে?

প্রশ্ন সহজ, উত্তর একটুকু কঠিন। যাঁহারা প্রেমভক্তির অনন্ত পিপাসায় উন্মাদিত হইয়া ভগবানের অনন্ত স্বরূপে ডুবিয়া রহিয়াছেন, এ সকল কথার নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহারা ভিন্ন অন্যে ভালরূপ বুঝিতে পারে না। তথাপি সামান্য বুঝিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহাই এখানে সংক্ষেপে বুঝাইতে যত্নবান্ হইব।

ভগবান্ জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বান্তর্যামী, এবং সর্ব্ব মঙ্গলালয়। এ সংসারে এমন স্থান কোথায় আছে, যেখানে তিনি নাই? এমন ঘটনা কি হইতে পারে, যাহা তাঁহার চক্ষে পড়ে না? এমন জন কে আছে, যাহার প্রাণের কথা তিনি পরিজ্ঞাত নহেন? আর, এমন অধমই বা কে আছে, যে তাঁহার কাছে আশ্রয় পাইবে না? তবে আবার জগদীশ্বরের কাছে জীবন সাংসারিক জীবনের সুখ-সম্পদ্ অথবা মুক্তির জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই যুক্ত করে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে কেন? তুমি প্রার্থনা করিবার অনন্তকাল পূর্ব্ব হইতেই যখন তিনি প্রার্থিত বিষয়ের সকল কথা জ্ঞাত হইয়া রহিয়াছেন, তখন তুমি তাঁহার কাছে আবার নূতন একটা প্রার্থনা করিবে কি? বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর। কিন্তু ভক্তি, বিজ্ঞানের অনধিগম্য ঊর্দ্ধ জগতে আলোকের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া, মনুষ্যকে ভগবানের নিকট সতত প্রার্থনা করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে, এবং যাহারা বিজ্ঞানকে ভক্তির আলোকে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহা বুঝাইয়াছেন যে, ঐ প্রার্থনাতেই, রুদ্ধ গৃহের দ্বারমোচনের ন্যায়, জীবাত্মার পাপমোচন। তুমি যদি ঘরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখ, তাহা হইলে সূর্য্যের রশ্মি কিরূপে সেখানে প্রবেশ করিবে? অথবা তুমি যদি তোমার প্রাণটাকে ক্ষণকালের তরেও প্রাণ-জীবন জগদীশ্বরের দিকে

উন্মুখ হইতে না দেও, তাহা হইলে কিরূপে সেখানে তাঁহার করুণার জ্যোতিঃ নিপতিত হইবে? ইহাই প্রেমময়ের অনন্তবিস্তারিত প্রেমের বিধি, সুতরাং ইহাতেই প্রার্থনার প্রত্যক্ষ সাফল্য। কিন্তু প্রার্থনাও যে কথা, জপও প্রকারান্তরে সেই কথা। জীব প্রার্থনাদ্বারা কামনা জানায়, জপের দ্বারা জগদীশ্বরকে সতত স্মরণ করে। জপের যদি এতটুকু সার্থকতা না থাকিত, তাহা হইলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক ও ভক্তেরা কখনও উহাতে সমাহিত রহিতে পারিতেন না। হরিদাসের পক্ষে জপ ও জীবন এক হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন উল্লিখিতরূপ জপ-যজ্ঞে নিমগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার নয়নে ধারা বহিত, শরীর মুহুর্মুহুঃ কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে রোমাঞ্চিত হইত, মুখশ্রীতে দেবতার মাধুর্য্য ফলিত, এবং তিনি যবনের ঘরে না কোথায় জন্মিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া লোকে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। হরিদাস যে অদ্যাপি বঙ্গের সাহিত্য ও সমাজে বহু লোকের হৃদয়ে আসন যুড়িয়া বসিয়া আছেন, এ বিষয়ে এইক্ষণ আর কাহার বিস্ময় জ্ঞান হইতে পারে?

ঠাকুর হরিদাসের এ প্রভাব, যেন মনুষ্যপ্রকৃতির আর একটা ভাব মনুষ্যকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য অল্পকালের মধ্যেই আশে পাশে অনেকের অসহ্য হইয়া উঠিল; এবং যেমন একদিকে অনেক লোক তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতেছিল, আর একদিকে তেমনই অনেক লোক তাঁহার মত নির্লিপ্ত, নিরুপদ্রব ও নিস্পৃহ ভক্তকেও হৃদয়ের সহিত ঘৃণা ও বিদ্বেষ করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহারা এই পৃথিবীতে সাধারণের অনধিগম্য, এইরূপ বিড়ম্বনাই সকল দেশে ও সকল কালে, তাঁহাদিগের উচ্চতর জীবনের ব্রতদক্ষিণা। মনুষ্য-সমাজের এক হস্ত তাঁহাদিগের মস্তকে প্রীতির পুষ্পবৃষ্টি করে, আর এক হস্ত তাঁহাদিগের বক্ষঃস্থলে ক্রূরতার কুঠার লইয়া আঘাত করিতে থাকে,—এক ভাগ্য

তাহাদিগকে ভালবাসার অমৃত আনিয়া উপহার দেয়, আর এক ভাগ তাঁহাদিগের মুখে ঈর্ষার বিষ তুলিয়া দিবার জন্য, সক্রেতিশের সমসাময়িক গ্রীক্‌দিগের ন্যায় উন্মত্ত হয়। ফলতঃ, উন্নতমনা ও উর্দ্ধচর মহাত্মাদিগের ভাগ্যে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, হরিদাসের ভাগ্যেও অচিরেই তাহা ঘটিল, এবং বনগ্রাম প্রদেশের বিজ্ঞ যোগ্য লোকদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য বিবিধ উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অহল্যা বাই।

(শ্রীযুত যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু।)

১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মালবদেশের অন্তর্গত পাথরডী নামক গ্রামে অহল্যা বাইএর জন্ম হয়। অহল্যার পিতার নাম আনন্দ রাও শিন্দে। স্বনামখ্যাত মহ্লাররাও হোল্‌করের একমাত্র পুত্র খণ্ডেরাওয়ের সহিত পুনানগরীতে অহল্যার শুভবিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে তিনি স্বামীবিরহিতা হন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহ্লাররাও পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পৌত্র, অহল্যার পুত্র, মালেরাও রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মালেরাও নিতান্ত অপটু ও অতিশয় অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। সুতরাং পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেও, রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার, প্রকৃত-প্রস্তাবে, অহল্যা বাইয়ের স্কন্ধে পতিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময়ে অহল্যার পতিবিয়োগ হয়, সুতরাং সাংসারিক সুখ তাঁহার জীবনে অতি অল্পই ঘটিয়াছিল। ইহার উপর পুত্র, দুহিতা, জামাতা এবং দৌহিত্র ইত্যাদির মৃত্যুতে তিনি একেবারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। কোনরূপ সাংসারিক সুখভোগ যে তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না, ইহা তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন। তাদৃশ অবস্থায় সংসারের প্রতি বিরাগ উৎপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। অন্য অনেক নরপতি এরূপ অবস্থায়, মন্ত্রিগণের উপর রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া, শান্তি অন্বেষণ করিয়াছেন। কিন্তু অহল্যার কর্ত্তব্যজ্ঞান এরূপ কঠোর এবং প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার অনুরাগ এরূপ অকপট ছিল যে, তিনি কিছুতেই সেরূপ বৈরাগ্য-অবলম্বন উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার স্বদেশীয় কবি তুকারাম তাঁহার একটি অভঙ্গে, (কবিতায়) এইরূপ

বলিয়াছেন যে, "যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন করিবে।" অহল্যার জীবনে তুকারামের এই উপদেশ সম্যক্‌রূপেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। বাস্তবিকই তিনি, কর্ত্তব্যপালনের জন্য, বিপদকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও আসক্তি ছিল না, অথচ তিনি এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজ্য সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেন যে, ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও সেরূপ পারেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার সময় হোল্‌কর রাজ্য যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। তাঁহার প্রজাগণ এখনও যে তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্র কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়, এবং লোকে এখনও যে তাঁহাকে দেবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার যথেষ্টই কারণ আছে।

অহল্যা ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মান্ধা ছিলেন না। হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণই তাঁহার রাজ্যে সমান শান্তিতে বাস করিতেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য তাঁহার রাজ্যে কাহাকেও অনুগ্রহ বা কাহাকেও নিগ্রহ করা হইত না। ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহার ভক্তির সীমা ছিল না; ব্রাহ্মণগণই তাঁহার দানের অধিকাংশ ভোগ করিতেন বলিয়া কোন ঐতিহাসিক তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজন হইলে, সেই ব্রাহ্মণেরও দোষ প্রদর্শনে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন না। একবার অনন্ত-ফন্দী নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া, উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি সু-কবি ও সু-পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু কোন মুসলমান ঐন্দ্রজালিকের সংসর্গে ব্রাহ্মণোচিত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রজাল দেখাইয়া বেড়াইতেন। অহল্যা তাঁহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া,

তিনি যে ব্রাহ্মণের অযোগ্য ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাঁহাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, অহল্যার সস্নেহ অথচ কঠোর উপদেশ, অনন্ত-ফন্দীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

অহল্যার দেবভক্তির ও জীবানুরাগের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃতিতে আরও এমন একটি গুণ ছিল যে, পৃথিবীর অতি অল্প রাজায় ও রাজ্ঞীতে তাহা লক্ষিত হয়। যাঁহারা ধন ও প্রভুত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তোষামোদ তাঁহাদিগের নিকট অন্ন-জলেরই ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ অবস্থাতে চাটুবাদের অস্পৃশ্য থাকেন, তাঁহাদিগের প্রকৃতি দেবতুল্য সন্দেহ নাই। অহল্যার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই ছিল যে, তিনি তোষামোদের অস্পৃশ্যা ছিলেন। একবার কোন ব্রাহ্মণ অহল্যার অনুগ্রহভাজন হইবার প্রত্যাশায়, তাঁহার গৌরব-বাণী-পূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতদিগের অভ্যাসানুরূপ তিনি, তাহাতে অহল্যার অতিরিক্ত প্রশংসাবাদ করিয়া, সেই গ্রন্থ অহল্যাকে শুনাইয়াছিলেন। অহল্যা যথাসাধ্য ধৈর্য্যের সহিত গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন, এবং তাহার পর ব্রাহ্মণকে বিনীত বচনে বলিলেন, "আমি অতি পাপীয়সী রমণী, আপনার এইরূপ অতিরিক্ত প্রশংসাবাদের যোগ্য নই।" এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পুস্তকখানি লইয়া, নর্ম্মদার জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন এবং তোষামোদকারী ব্রাহ্মণের আর কোন সংবাদই লইলেন না। প্রশংসার আকর্ষণ এতই মধুর যে, প্রশংসাকারীর বাক্য অসঙ্গত বলিয়া বুঝিলেও তাহার প্রতি আমাদিগের অনুকম্পা জন্মে, এবং তাহার অভিলাষ অপূর্ণ রাখিতে ক্লেশ বোধ হয়। কিন্তু অহল্যা এই ঘটনা উপলক্ষে যে মহত্ত্ব ও যে দৃঢ়চিত্ততা দেখাইয়াছিলেন, পৃথিবীর অতি অল্প মনুষ্যই তাহা

দেখাইতে পারেন। সার্ জন ম্যালকম যথার্থই বলিয়াছেন যে, "অহল্যার ন্যায় রাজ্ঞী পৃথিবীর ইতিহাসে অতীব বিরল।"

অহল্যার জীবনের ইতিহাস হইতে আমরা অনেক সুন্দর উপদেশ লাভ করিতে পারি। মানসিক শক্তি যে কেবল পুরুষেরই একাধিকার নহে, ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্ট অনুমান করিতে পারা যায়। নারী হইয়াও তিনি যেরূপ সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলার সহিত আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যে কোন পুরুষেরই পক্ষে তাহা গৌরবজনক। উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে, রমণীও যে পুরুষসুলভ অনেক সদ্গুণের পরিচয় দিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে রমণী এক্ষণে অশিক্ষিতা ও অনাদৃতা। স্বামী পুত্রের কার্য্যে সহায়তা করিতে অক্ষমা ভাবিয়া, পুরুষ তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিতা করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এদেশে রমণীর শক্তি ও সামর্থ্য সাগর-গর্ভস্থিত রত্নের ন্যায় নিষ্প্রভ ও নিরর্থক হইয়া রহিয়াছে। যাহারা রমণীকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিতা করিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে, নারী-প্রকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন; রমণীর পক্ষে কোমলতা এবং পুরুষের পক্ষে কাঠিন্য স্বাভাবিক; সুতরাং রমণীকে সংসারের কঠোরতার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম কোমলতা বিনষ্ট হইয়া সংসারের অকল্যাণ সাধিত হইবে। এ কথা যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কোমলতার ও কাঠিন্যেরও একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। পুরুষপ্রকৃতিতে যেমন কেবল কাঠিন্য থাকিলে তাহা রুদ্রভাবে পরিণত হয়, নারীপ্রকৃতিতেও তেমনই কেবলমাত্র কোমলতা থাকিলে, তাহা সাংসারিক কর্ত্তব্যসম্পাদনের অনুপযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। বীণার প্রত্যেক তন্ত্রী হইতে একই মাত্র সুর সমুৎপন্ন হইলে, তাহা প্রীতিকর হয় না; নরনারীর হৃদয়েরও ভিন্ন ভিন্ন

বৃত্তি হইতে কঠোরতাই হউক বা কোমলতাই হউক, একমাত্র ভাব উৎপন্ন হইলে তাহা আনন্দ ও তৃপ্তি দান করিতে পারে না। এই জন্য কঠিনের সহিত কোমলের এবং কোমলের সহিত কঠিনের সম্মিলন, নর নারী উভয়েরই প্রকৃতির পক্ষে আবশ্যক। এই সম্মিলনের অভাব ঘটিলে মানসিক বৃত্তি সমূহের সম্পূর্ণ পরিস্ফুরণ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশের অনেকেই এ কথা স্মরণ রাখেন না। সেই জন্য তাঁহারা নারী-প্রকৃতিতে কেবলমাত্র কোমলতারই বিকাশ দেখিতে চান। সাহস, তেজস্বিতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি গুণ, পুরুষোচিত ভাবিয়া তাঁহারা রমণীতে তাহাদিগের পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। নারী-প্রকৃতিসম্বন্ধে এই আদর্শ অপেক্ষাকৃত আধুনিক; প্রাচীন ভারত-সমাজে এ আদর্শ ছিল না। প্রাচীন ভারতের যিনি গণেশ-জননীরূপে মাতা এবং যিনি অন্নপূর্ণারূপে গৃহিণী, মহিষ-মর্দ্দিনীরূপে তিনিই আবার সমরাঙ্গণ-বিহারিণী। সেই আদর্শ হইতেই মহাশক্তির হস্তে পাশাঙ্কুশ ও বরাভয় যুগপৎ বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। নারী-প্রকৃতিসম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত প্রভৃতি বীরজাতিগণের আদর্শও বঙ্গবাসিগণের আদর্শ হইতে বিভিন্ন। বঙ্গসন্তান কেবলই কোমলতার পক্ষপাতী; কোমলতার প্রতি তাঁহার অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ বঙ্গরমণী স্নেহ, দয়া, সহিষ্ণুতা, প্রেম প্রভৃতি গুণে পৃথিবীর অপর কোন দেশের রমণীর অপেক্ষা নিকৃষ্টা না হইলেও সাধারণতঃ তেজোহীনা ও আত্মরক্ষণে অসমর্থা। অহল্যার প্রকৃতিতে তেজস্বিতার সহিত কোমলতার তাদৃশ সামঞ্জস্য হইয়াছিল বলিয়াই আমরা তাঁহার এরূপ প্রশংসা করিয়াছি এবং সেই জন্যই তাঁহাকে নারী-সমাজের আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

আধুনিক শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে বিচার করিয়া অহল্যার দোষ-গুণ পর্য্যালোচনা করা সঙ্গত হইবে না। সে আদর্শ অনুসারে বিচার

করিলে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, বুদ্ধের, সক্রেটিশের বা খ্রীষ্টের ন্যায় মহাপুরুষকেও কেহ কেহ, অজ্ঞ ও কুসংস্কারান্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। অহল্যা যে জ্ঞান ও যে ধর্ম্মালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন কি না, এবং আত্মজীবন তদনুসারে ভগবানের ও ভগবানের সৃষ্ট জীবগণের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন কি না, তাহাই আমাদিগের বিবেচনার বিষয়। খ্রীষ্ট কেন চৈতন্যের ন্যায় কার্য্য করেন নাই, সীতা বা সাবিত্রী কেন কুমারী নাইটিঙ্গেলের ন্যায় পরোপকার-ব্রতে নিযুক্তা হন নাই, এ কথা বলাও যেমন সঙ্গত, দেব-ব্রাহ্মণ-সেবিকা অহল্যা আধুনিক কোন একেশ্বরবাদিনীর ন্যায় কার্য্য করেন নাই কেন, সে কথা বলাও তেমনই যুক্তিযুক্ত। বিধাতার দানের তিনি যে অপব্যবহার করেন নাই, আপনার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে তিনি যে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রধান গুণ। তাহার স্রষ্টা তদনুসারেই তাঁহার কার্য্যের বিচার করিবেন। বিদ্যা, বুদ্ধি ক্ষমতা এবং কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি গুণে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা অনেক রাজ্ঞী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এক দিকে সতী-ধর্ম্ম, অপর দিকে ভগবদ্ভক্তি, নিঃস্বার্থতা, সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা, এবং বিনয় প্রভৃতি গুণে তাঁহার সমকক্ষা রাজ্ঞী পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন, বিবেচনা হয়। রাজ্ঞী শব্দে হিন্দুর যাহা আদর্শ, তাহা যেন তাঁহাতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। রাজ-সংসারের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও তিনি সর্ব্বত্যাগিনী, এবং সর্ব্বজনপূজ্যা রাজ্ঞী হইয়াও তিনি সকলের সেবিকা ছিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময় তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। সে বয়সে সাধারণতঃ ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু সংযম, সেবা এবং আরাধনাদ্বারা অহল্যা নিজের হৃদয়ে এরূপ কঠোর বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়াছিলেন যে, তপস্বিনীগণেরও

পক্ষে তাহা প্রার্থনীয়। সংসারের প্রত্যেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি, অথচ কোন বস্তুতেই আসক্তি নাই, ইহাই হিন্দুর সংসার-ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। অহল্যার জীবনে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। রাজ্ঞীরূপে তিনি আপনার কর্ত্তব্য কিরূপ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহা আলোচিত হইয়াছে। তিনি যদি দরিদ্রের গৃহিণী হইতেন, তাহা হইলেও যে তিনি, নিজের ব্যবহারে, তাঁহার স্বামী, পুত্রের জীবন আনন্দময় করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কোন অবস্থাতেই হউক, কর্ত্তব্য প্রতিপালনে ইচ্ছুক ও সক্ষম ব্যক্তিই পূজার্হ। অহল্যা সুখে, দুঃখে, সকল অবস্থাতেই, আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদিগের এরূপ শ্রদ্ধার পাত্রী। অহল্যার সমকালবর্ত্তিগণ তাঁহাকে জীবন্মুক্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শূদ্রাণী হইয়াও তিনি, জীবদ্দশায় ব্রাহ্মণগণের বন্দনীয়া হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বদেশীয়গণের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, নিম্নলিখিত একটি মহারাষ্ট্রীয় কবিতার অনুবাদ হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। কবিতাটি অহল্যার সমকালবর্ত্তী, পুনার রাজকবি ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত ময়ূরপন্তের বিরচিত;—

"হে দেবি!—অহল্যে! তুমি ধরণীর ভূষণস্বরূপা; বরেণ্যা ও হরিহরের প্রতি সমান ভক্তিমতী; সূর্য্যসম তেজস্বী ব্যক্তিরা তোমার সৎকীর্ত্তি খ্যাপন করিয়া থাকেন; তাঁহারা বাণ-কন্যা উষা অপেক্ষা তোমাকে সমধিক গুণশালিনী বলিয়া বর্ণনা করেন।

দেবি!—অহল্যে! তুমি ত্রিভুবনে ধন্যা হইয়াছ। কলিকালে তোমার ন্যায় ধর্ম্মনিরতা কোনও রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন শুনি নাই।

যাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রুত হইয়াও তাহার আচরণ করে না, সেই সকল পণ্ডিতন্মন্য ব্যক্তির কে প্রশংসা করে? (তাই বলিতেছিলাম) তোমার ন্যায় প্রকৃত ধর্ম্মনিরতা রমণীর কথা কলিযুগে শ্রুত হওয়া যায় না।

পার্ব্বতী অথবা সীতারূপে তুমি অবতীর্ণা হইয়াছ। রাজন্যবর্গের যোগ্য সৎকীর্ত্তিজনিত খ্যাতি তুমি অল্প দিনের মধ্যেই লাভ করিয়াছ।

হে দেবি! তুমি নর্ম্মদাতীর পরিত্যাগ করিতেছ না; কারণ, নর্ম্মদা তোমার প্রিয় সখী। নর্ম্মদা গঙ্গারও সখী। সেই সখিত্বসূত্রেই কি তুমি এরূপ পূতহৃদয়া হইয়াছ?

গয়ার শ্রীবিষ্ণু-পদের অর্চ্চনার সহিত তোমারও প্রতি সম্মানপ্রকাশ ভক্তগণের কর্ত্তব্য। সমগ্র বিশ্ব যাঁহার বন্দনা করে, কবি ময়ূর কেন না তাঁহার বন্দনা করিবে?"

তাঁহার কৌষেয়-বসন-পরিহিতা, ব্রতখিন্না, ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার প্রজাগণের হৃদয় মাতৃভক্তিতে বিগলিত হইত। স্বভাবতঃ করুণাময়ী রমণী রাজ্ঞী হইলে তাঁহার দ্বারা প্রজাপুঞ্জের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এবং সর্ব্বত্যাগিনী হিন্দুবিধবা, আত্মসুখ নিরপেক্ষ হইয়া কিরূপে সর্ব্বভূতের মঙ্গল-সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। সহস্র সহস্র নর-নারীর সুখ-দুঃখের গুরুভার তাঁহার হস্তে অর্পিত ছিল; কিন্তু তাঁহার গৌরবের বিষয় এই যে, আত্মসুখের জন্য তিনি কখনও কাহাকেও অসুখী করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, ভারতীয় পৌরাণিক রমণীগণের চরিত্র যে কেবল কবিকল্পনা নহে, অহল্যার ন্যায় ঐতিহাসিক রমণীই তাহার প্রমাণ। ভারতবর্ষ অনেক মনস্বিনী রমণীর জন্মভূমি; তাঁহাদিগের সকলের নামের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া অহল্যারও নাম এ দেশে চিরস্মরণীয় হইবে।

উড়িষ্যার মঠ।

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ।)

উড়িষ্যায়, বিশেষতঃ পুরী জেলায় অনেকগুলি মঠ আছে। এত অধিক মঠ বোধ হয়, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই। এই সকল মঠ উড়িষ্যাবাসিগণের ধর্ম্মপরায়ণতা ও দয়াদাক্ষিণ্যের পরিচয় দেয়। এই মঠগুলি নিয়মিতরূপে ঠাকুরসেবা, অতিথিসৎকার ও অভ্যাগত সাধু-সন্ন্যাসিগণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন একজন বিশিষ্ট সাধু বা বৈষ্ণব ইহার এক একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক মঠের প্রতিষ্ঠাতা, নিজের অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য দেশের সর্ব্বসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে মঠের জন্য ভূমিসম্পত্তি ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার অধিকাংশ ধনসম্পত্তিশালী হিন্দু গৃহস্থ এই সকল মঠের জন্য জমি "খঞ্জা" * করিয়া দিয়াছেন। উড়িষ্যাদেশে সাধারণতঃ গৃহস্থ-বাড়ীতে অতিথি সৎকারের প্রথা নাই; ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-কুটুম্ব ভিন্ন কেহ কাহারও গৃহে স্থান পায় না। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি উপস্থিত হইলে তাহাকে মঠের পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু উড়িষ্যাবাসীদিগের অতিথি-সৎকারের এই ত্রুটির জন্য তাহাদের বড় দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, অনেক গৃহস্থ মঠে জমি দান করিয়া সেই সঙ্গে অতিথি-সৎকারের কর্ত্তব্যটাও মঠের প্রতি অর্পণ করিয়াছে।

এই সকল মঠে কোন একটি বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। পুরী সহরে যতগুলি মঠ আছে, অধিকাংশ মঠে জগন্নাথ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি

* চারি দিকে দেওয়াল-বেষ্টিত গৃহকে "খঞ্জা" বলে।

বিরাজমান। দাতারা জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবা-পূজার জন্যই পুরীর মঠ-সকলে সম্পত্তি দান করিয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের সেবা-পূজার জন্য প্রদত্ত দেবোত্তর ভূমিকে "অমৃতমনহি" বলে। সেই দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে প্রত্যহ জগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরে ভোগ দেওয়ার কথা; ভোগ যে একেবারে না দেওয়া হয়, তাহা নহে। জগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরে অন্নভোগ নিবেদন করিয়া আনিয়া, তাহা মঠের মোহান্ত ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ভোজন করেন; উপস্থিত-মত অতিথি-অভ্যাগতদিগকেও দান করা হয়। পুরীর মঠ-সকলে রন্ধনের কারবার প্রায়ই নাই। পল্লীগ্রামের মঠে অন্যান্য বিষ্ণুমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি মঠে একজন মোহান্ত বা অধিকারী আছেন। কোন কোন বড় মঠে মোহান্ত ও অধিকারী উভয়ই আছেন। বলা বাহুল্য, মোহান্তই মঠের অধিপতি। তাঁহার সাহচর্য্যের জন্য পূজারি, টহলিয়া ও অন্যান্য পরিচারক থাকে।

পুরীর কতকগুলি বড় মঠে "রামাইত" মোহান্ত আছেন। ইঁহারা পশ্চিমদেশবাসী,—শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ মোহান্তই শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত, শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলিয়া পূজা করেন। উড়িষ্যার অধিকাংশ হিন্দু-পরিবারে শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত। অনেক মঠে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মূর্ত্তির পূজা হয়। তবে সেটা অধিকন্তুভাবে; বিষ্ণুর কোন না কোন মূর্ত্তিই সকল মঠে প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ পূজনীয়।

মঠের মোহান্তগণ চির-কুমার। কিন্তু চির-কুমার-ব্রত গ্রহণ করিলে কি হয়, সেই ব্রত রক্ষা করিতে কয় জন পারে? এই জন্য অনেক সময়ে অনেক মহাপ্রভুর নামে অনেক কলঙ্ক শুনা যায়। অনেক মোহান্ত, এমন কি প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত! তাঁহাদের বিলাসিতাও কম নহে।

তাঁহাদের চালচলন রাজারাজড়ার মত। একজন মোহান্ত বা বাবাজীকে সাহেব সাজিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি! বৈরাগ্য-ব্রত ভুলিয়া গিয়া এখন তাঁহারা ঘোর সংসারী অপেক্ষাও অধমভাবে জীবন যাপন করিতেছেন; অনেক মঠে এখন অতিথি-অভ্যাগতের স্থান হয় না, দরিদ্র-দুঃখী কোনও সাহায্য পায় না, সাধু-সন্ন্যাসীর আদর নাই, কিন্তু মোহান্ত-মহারাজগণ বিলাস-ব্যসনে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। কেহ কেহ মামলা-মোকদ্দমায় জলের মত অর্থ ঢালিয়া দেন। বেশী দিনের কথা নয়, পুরীর কোন বড় মঠের একজন মোহান্ত বিলাত পর্য্যন্ত একটি মামলা চালাইয়া, প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

সাধারণের সম্পত্তির এইরূপ অপব্যবহারের প্রতি অনেক দিন হইতে গবর্ণমেণ্টের ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। গত ১৮৬৮ সনে উড়িষ্যার মঠ-সকলে দেবোত্তর সম্পত্তির কি প্রকার অপব্যবহার ঘটে ও তাহা নিবারণের উপায় কি, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য, গবর্ণমেণ্ট হইতে একটি কমিটী গঠিত হয়। সেই কমিটীর সদস্যগণ স্থির করেন, উড়িষ্যার মঠ-সকলের দেবোত্তর সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় সাত লক্ষ টাকা। এতগুলি টাকা মোহান্তগণ নানাপ্রকার বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন; দাতারা যে মহৎ উদ্দেশ্যে ইহা দান করিয়া গিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে প্রায় ইহা ব্যয় করা হয় না। সেই জন্য তাঁহারা এই দেবোত্তর সম্পত্তির যথোচিত সংরক্ষণ ও যথোদ্দেশ্যে ব্যয় করা সম্বন্ধে কতকগুলি পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত তাহার কোনটাই কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

কিন্তু সকল মোহান্ত সমান নহে। ঐরূপ ঘোর বিলাসিতা ও জঘন্য ব্যভিচারের মধ্যেও উক্ত কমিটীর সদস্যগণ দুই একটি যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ

সাধু-মহাত্মার দর্শন পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়া, তাঁহাদিগকে সাধারণ মোহান্তশ্রেণী হইতে খারিজ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা সেইরূপ এক মহাত্মাকে পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিব।

পুরী নগরীর ৫ মাইল উত্তরে কুশভদ্রা (পুষ্পভদ্রা) নদীর কূলে গোপালপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটির পশ্চিমভাগে, লোকালয় হইতে কিছু দূরে একটি বিস্তৃত আম্রকানন। সেই আম্রকাননের উত্তরভাগে একটি রমণীয় উদ্যান আছে। উদ্যানটির মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীগোপাল জীউর মঠ প্রতিষ্ঠিত। এই ঠাকুরের নাম হইতে গ্রামের নাম গোপালপুর হইয়াছে।

গোপালপুরের মঠ বহু প্রাচীন। প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন সিদ্ধপুরুষ পুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতে আসিয়া এখানে এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠের মোহান্ত গোকুলানন্দ বাবাজী শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন, এবং তিনি একজন মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ সহ এই মঠে ভিক্ষা করিতে আসিয়া গোকুলানন্দ বাবাজীর সহিত প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। এই মঠের বর্ত্তমান মোহান্ত নরোত্তম দাস বাবাজীও একজন প্রকৃত সাধু-পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ; এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা সেই সিদ্ধপুরুষ, ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, এ পর্য্যন্ত সকল মোহান্তই ব্রাহ্মণ-চেলা রাখিয়া গিয়াছেন। নরোত্তম দাস বাবাজীর গুরু বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী একজন দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। নরোত্তম দাস বাবাজী তাঁহার নিকট অনেক দিন পর্য্যন্ত নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরিশেষে বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীধামে ও ভাগবত অধ্যয়ন

করিবার জন্ম শ্রীবৃন্দাবনে, বার বৎসর অবস্থিতি করিয়া, এই সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই সকল তীর্থস্থানে অনেক সাধু-মহাত্মার সঙ্গ লাভ করিয়া তিনি নিজের চরিত্রও যথোচিতরূপে সংগঠিত করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী চেলা মাধবানন্দ দাসও এখন বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

এই মঠের সম্পত্তি বড় বেশী কিছু নাই। ভূমি-সম্পত্তির মধ্যে দুই "বাটী" (৪০ মান বা একর) জমি দেবোত্তর নিষ্কর আছে। তাহাতে বৎসর বৎসর যে ধান্য পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ঠাকুর-সেবা ও সাধু-সন্ন্যাসী অতিথি-অভ্যাগতের সেবা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যে বৎসর শস্য কম জন্মে, সে বৎসর কিছু অনাটন হয়, আবার যে বৎসর ভাল রকম জন্মে, সে বৎসর কিছু কিছু ধান্য মজুতও থাকে। মোহান্ত বাবাজী মঠের সম্পত্তিকে ঠাকুরের সম্পত্তি ও আপনাকে কেবল তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক জ্ঞান করিয়া কার্য্য করেন। সুতরাং তাঁহার কোন অপব্যয় নাই। বরং তাঁহার উত্তম তত্ত্বাবধানে মঠের এই সামান্য সম্পত্তিদ্বারা ঠাকুরের দৈনিক সেবা ও দোলযাত্রাদি পার্ব্বণ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া, কিছু কিছু অর্থ সঞ্চিত থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোহান্তগণের আমল হইতে এই মঠে অনেক ধান্য মজুত হইয়া আসিতেছিল। "নয়—অঙ্ক" দুর্ভিক্ষের * বৎসর বর্ত্তমান মোহান্ত বাবাজী দেখিলেন, প্রায় দুই হাজার টাকা মূল্যের ধান্য মজুত আছে। তখন শত শত লোক অনাহারে মরিতেছিল। বাবাজী মনে করিলেন, "গোপালজীর ভাণ্ডারে এতগুলি ধান্য মজুত থাকিতে যদি এখানকার লোক না খাইয়া মরিল, তবে এ ধান্য থাকিয়া

* Great Famine of Orissa, 1866.

"নয়—অঙ্ক" অর্থাৎ পুরীর মহারাজার রাজত্বের নবম বৎসর। উড়িষ্যায় সচরাচর পুরীর রাজার রাজ্য-প্রাপ্তি হইতে বৎসর গণনা হয়।

ফল কি? আমার গোপাল যখন সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মারূপে বিরাজমান, তখন এই ধানগুলি দ্বারা যদি অন্ততঃ কয়েকটি লোকেরও প্রাণ রক্ষা করিতে পারি, তবে তাহাতেই গোপালের সেবা হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সেই ধান্যগুলি অকাতরে দান করিয়াছিলেন। তদবধি মঠের কিছু দিন হীনাবস্থা ঘটিয়াছিল, পরে বাবাজীর তত্ত্বাবধানের গুণে ও কোন রকম অপব্যয় না থাকাতে, এই ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে আবার প্রায় দুই হাজার টাকার ধান্য সঞ্চিত হইয়াছে।

এই ধান্যগুলি কি বাবাজীর "পালগাদায়"* আবদ্ধ থাকিয়া পচিতেছে?—তাহা নয়। বাবাজী এই মজুত ধান্য দিয়া অনেক কৃষকের উপকার সাধন করেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের কৃষকগণ অভাবে পড়িলে বাবাজী তাহাদিগকে ধান্য কর্জ্জ দিয়া থাকেন। অন্যান্য মহাজন অপেক্ষা তিনি অনেক কম সুদ লইয়া থাকেন, সে জন্য অনেক লোক তাঁহার নিকট হইতে ধান্য ও টাকা কর্জ্জ লয়। তাঁহার নিকটে কর্জ্জ পাইলে আর কোন মহাজনের নিকট বড় কেহ যায় না। ইহার মধ্যে অনেক ধান্য ও টাকা একেবারে আদায় হয় না, সে জন্য সময় সময় মঠের ক্ষতি হয় বিবেচনা করিয়া, সেই ক্ষতি পূরণের জন্য মোহান্ত বাবাজী অল্প সুদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন দরিদ্র কৃষক আসিয়া তাহার দুঃখের কাহিনী জানাইলে, বাবাজী একেবারে গলিয়া যান, সে ব্যক্তি যাহা কর্জ্জ লইবে, তাহা ভবিষ্যতে পরিশোধ করিতে পারিবে কিনা, ইহা বিবেচনা না করিয়াই, তাহাকে ধান্য কিংবা টাকা কর্জ্জ দিয়া ফেলেন। এ কারণেও অনেক সময়ে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

যাহারা কর্জ্জ লয়, তাহাদের নিকট হইতে ধান্য কি টাকার জন্য কোন

* খড়ের মধ্যে রক্ষিত ধান্যের স্তূপ। বাহির হইতে দেখিলে খড়ের গাদা বলিয়া বোধ হয়।

তমসুক লওয়া হয় না। তাহারা কেবল গোপালজীর মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া কর্জ্জ লইয়া যায়। একবার এক ব্যক্তি এইরূপে ধান্য কর্জ্জ লইয়া পরিশেষে অস্বীকার করিয়াছিল। তাহার পরেই সে কলেরা রোগে মারা যায়। তদবধি গোপালজীকে সকলে ভয় করে, এখান হইতে ধান কিংবা টাকা কর্জ্জ লইয়া কেহ অস্বীকার করিতে সাহসী হয় না। যে যখন যাহা কর্জ্জ লয়, তাহা সুবিধা হইলেই শোধ করে। সুদ অত্যন্ত কম, অন্য কোনও মহাজনের নিকট এত কম সুদে কেহ টাকা কি ধান কর্জ্জ পায় না; এখানে একবার জুয়াচুরি করিলে আর কখনও কর্জ্জ পাইবে না; এ কারণেও কেহ এখানে প্রতারণার কাজ করে না। এই সকল কারণে কর্জ্জ আদায়ের জন্য বাবাজীকে কখনও মামলা মোকদ্দমা করিতে হয় না। এইরূপে মঠের এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডারটিকে বাবাজী একটি কৃষিভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছেন।

সাধু-সন্ন্যাসী ও অতিথি-অভ্যাগতের এ মঠে অবারিত দ্বার। অনেক পুরীর ফেরতা সাধু-সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া অতিথি হইয়া থাকেন। মঠের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড আম্রকানন আছে, তাহার মধ্যে আসিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ডেরা করেন। কিন্তু অনেক সময় পশ্চিমদেশীয় "সাধুসন্ত"দিগের অত্যাচারে মোহান্ত বাবাজীকে বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। তাঁহারা মনে করেন, এই সকল মঠ কেবল তাঁহাদের জন্যই হইয়াছে, এগুলি যেন তাঁহাদের লুটের মহাল। এখানে আসিয়া ময়দা, আটা, ঘি প্রভৃতির ফরমাস করিয়া বসেন। যথাসময়ে না পাইলে বড়ই মুস্কিল উপস্থিত হয়। কেহ কেহ জুলুম করিয়া বাবাজীর নিকট হইতে পথ-খরচের টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিতে চেষ্টা করেন। বাবাজী কিন্তু এ সকল অত্যাচার "তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ এবং তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুভাবে" অম্লানচিত্তে সহ্য করেন।

এই মঠটি শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ দিকের

সেই বিস্তৃত আম্রকাননটি বড়ই রমণীয়, সর্ব্বদা বিহঙ্গকুলের কলরবে মুখরিত। এই কাননের উত্তরে মঠের উদ্যান। উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্তে এক শ্রেণী বক, বকুল, চম্পক, নাগেশ্বর (নাগ-কেশর), করবী, অশোক, শেফালিকা, পলাশ প্রভৃতি বড় বড় ফুলগাছ অতি উত্তম শৃঙ্খলার সহিত রোপিত। পলাশ গাছটি মালতী লতায় আচ্ছাদিত। এই বৃক্ষশ্রেণী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, তাহার মধ্যস্থলে মঠের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য একটি সদর দরজা আছে। এই দরজা হইতে মঠের ঘর পর্য্যন্ত উত্তর দিকে যাইবার জন্য একটি রাস্তা গিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে চারিটি ফুলের কেয়ারি। তাহাতে রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, চামেলী, যুঁই, নবমল্লিকা, অপরাজিতা, জবা প্রভৃতি ফুলগাছসকল চতুষ্কোণাকারে রোপিত হইয়াছে। মঠগৃহটি একটি বড় "থঞ্জা"—তাহার সিঁড়ি ও সম্মুখের "পিণ্ডা"টি (বারান্দা) প্রস্তর দিয়া বাঁধান। মন্দিরের সম্মুখে, প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত তুলসীমঞ্চ। মন্দিরের মধ্যে বেদীর উপরে শ্রীশ্রীগোপালজীর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত উজ্জ্বল সুঠামমূর্ত্তি, নানাবিধ রজত ও সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাঁহার সম্মুখে শালগ্রাম শিলা ও বামভাগে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর পিত্তলনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজমান।

প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে দুইটি ঘর ; তাহার উত্তরের ঘরে এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা সেই মহাপুরুষের সমাধি রহিয়াছে। দক্ষিণের ঘরটিতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে তিনটি ঘর আছে, তাহার উত্তরেরটি রন্ধনশালা, মধ্যেরটি মোহান্ত বাবাজীর শয়ন-ঘর, দক্ষিণেরটিতে মোহান্ত বাবাজী পূজাপাঠাদি করেন। একখানা বাঁশের তাকের উপরে অনেকগুলি গ্রন্থ সুসজ্জিত রহিয়াছে। "থঞ্জা"র মধ্যে প্রবেশের পথে যে "দাণ্ড" * ঘরটি আছে,

* দাণ্ড=রাস্তা। দাণ্ডঘর=যে ঘর রাস্তারূপে ব্যবহৃত হয়।

সেখানে মঠের ভৃত্য ও অতিথি-অভ্যাগতগণ শয়ন করে। "খন্ধার" পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। বাবাজী তাহার নাম দিয়াছেন "রাধাকুণ্ড"। পূর্ব্বদিকে গোশালা ও একটি ধানের "পালগাদা"। খন্ধার উত্তরে একটি বাগান। তাহাতে অনেকগুলি আম, কাঁঠাল, নারিকেল, "পুনাঙ্গ" (পুন্নাগ) প্রভৃতি ফলের গাছ ও কয়েকটি বাঁশের ঝাড় আছে।

বলা বাহুল্য, মোহান্ত বাবাজী চির-কুমারব্রতধারী। মঠে তিনি ছাড়া একজন পূজারি, একজন টহলিয়া ও একজন চাকর আছে। পূজারির কাজ ঠাকুরের বেশ-ভূষা করা, পূজার সামগ্রীর আয়োজন করা, ভোগ রন্ধন করা ও মোহান্ত বাবাজীর অনুপস্থিতি সময়ে ঠাকুর পূজা করা। সাধারণতঃ বাবাজী নিজেই ঠাকুর পূজা করেন। টহলিয়া সাধারণতঃ ভৃত্যের কাজ করে, পূজার সময়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়, সঙ্কীর্ত্তনের সময় খোল কিংবা করতাল বাজায়। আর আবশ্যকমত তলব তাগাদায়ও বাহির হয়। এতদ্ভিন্ন আর একজন চাকর আছে, সে ১০।১২টা গরু রাখে ও জমিচাষসম্বন্ধীয় অনেক কাজ করে।

প্রত্যহ প্রভাতে গোপালজীকে একবার "ক্ষীর-নবনী", "খই-উখুড়া" (মুড়কী), কলা প্রভৃতি দ্বারা বালভোগ দেওয়া হয়। পরে দুই প্রহরের পূজা অতীত হইলে অন্নভোগ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কোন মঠেই নিরামিষ ভিন্ন আমিষের কারবার নাই। সন্ধ্যা-আরতির পর, আর একবার রুটি ও মাখন দিয়া "বৈকালী" ভোগ দেওয়া হয়। এতদ্রূপ নিত্যসেবা ভিন্ন দোলযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে বিশেষ-রকম ভোগরাগের বন্দোবস্ত আছে। এই সকল নিবেদিত দ্রব্য উপস্থিত অতিথিদিগকে আগে দান করিয়া পরে বাবাজী ও মঠের ভৃত্যগণ ভোজন করেন। যে দিন কোন অতিথি উপস্থিত থাকেন না, সে দিন বাবাজী গ্রাম হইতে ২।৪ জন গরীব লোক ডাকিয়া আনিয়া

তাহাদিগকে কিছু কিছু প্রসাদ দিয়া অবশিষ্ট নিজে ও অন্যান্য সকলে গ্রহণ করেন।

নরোত্তম দাস বাবাজী চিরকুমার হইলেও সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি কৈশোর কাল হইতেই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। চির-অভ্যাস বশতঃ নারীমাত্রকেই তিনি আদ্যাশক্তির অবতার বলিয়া গণ্য করেন। বাবাজী অতি পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন ও প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ধ্যানমগ্ন থাকেন। সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয়। তখন তিনি বাহিরে আসিয়া মঠের যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। বাবাজী পশ্চিম দেশে বাস করিবার সময়ে একজন সন্ন্যাসীর নিকট অনেকগুলি কঠিন দুরারোগ্য রোগের অমোঘ ঔষধ শিখিয়াছিলেন। সে ঔষধগুলি কেবল গাছগাছড়া, তাহাতে বুজরুকি একটুও নাই। প্রত্যহ প্রভাতে অনেক রোগী তাঁহার নিকট ঔষধ পাইবার জন্য আসে। তিনি প্রত্যেকের অবস্থা বিশেষরূপে শুনিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করেন। যাহারা তাঁহার নিকট আসিতে পারে না, তিনি তাহাদের বাড়ীতে গিয়া ঔষধ দিয়া আসেন।

রোগী দেখিবার পর, বাবাজী মঠের গরুগুলির তত্ত্বাবধান করেন। যাহাতে তাহারা যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে খড়, ঘাস ও জল পায়, তাহা নিজে দেখেন। তাঁহার যত্নে মঠের গরুগুলি হৃষ্টপুষ্ট ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাহাদের আহারের জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে অনেক খড় মজুত করিয়া রাখেন। গো-সেবার পর বাবাজী মঠের বাগানে বেড়াইতে বাহির হন। বাগানের অধিকাংশ গাছ তাঁহার স্বহস্তে রোপিত। তিনি প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া বেড়ান। যদি কোন গাছ বন্যলতা দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে তিনি লতা কাটিয়া দিয়া গাছটিকে রক্ষা করেন। কোন চারা-গাছ জল অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে দেখিলে,

তাহাতে জল-সেচনের ব্যবস্থা করেন। কোনও একটি গাছে প্রথম ফুল কিংবা ফল ধরিলে, বাবাজীর আনন্দের সীমা থাকে না, তিনি তাহা স্বহস্তে তুলিয়া আনিয়া গোপালজীকে উপহার দেন।

বাবাজী বেড়াইয়া আসিয়া স্নান করেন। ইতিমধ্যে যদি কোনও ব্যক্তি অভাবে পড়িয়া আসিয়া কোন কথা জানায়, তখন তিনি তাহার বিষয় "বুঝাপনা" করেন। স্নানের পর ঠাকুর-পূজা আরম্ভ করেন, তাহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হয়। ইতিমধ্যে ভোগরন্ধন শেষ হয়; পূজা-শেষে ভোগ নিবেদন করিয়া দেন ও অতিথিসেবা হইলে নিজে আহার করেন। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন; তৎপরে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পাঠ করেন। ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতির পর বাবাজী সঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত হন। সঙ্কীর্ত্তনের পর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মালা জপ করিয়া ভোগ নিবেদনের পর আহারাদি করিয়া শয়ন করেন।

মোহান্ত বাবাজীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, তাঁহার শরীর দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর, শান্তিপূর্ণ। চক্ষু দুইটি কোমল, স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রুরাজি বক্ষঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মস্তকের লম্বা কেশরাশিও পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পরিধানে কৌপিন ও বহির্ব্বাস। গলায় একছড়া মোটা তুলসীর মালা। বাবাজীর বল অসাধারণ। তিনি যৌবনকালে রীতিমত মল্লদিগের সহিত কুস্তি করিতেন। এখনও মুগুর লইয়া ব্যায়াম করেন। তাঁহার দুইটি শিশু কাঠের মুদ্গর আছে, তাহার এক একটি ওজনে অর্দ্ধ মণ হইবে। এখনও তিনি পদব্রজে একদিনে ২৫।৩০ মাইল পথ চলিতে পারেন।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আজ শুক্ল প্রতিপদ তিথি। চন্দ্রের খোঁজখবর নাই। আকাশে এক একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিতেছে। সমুদ্রের হাওয়া প্রবলবেগে বহিতেছে; কিন্তু সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন এখন

আর শুনা যায় না। পুরীর মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির বাদ্যধ্বনিতে তাহা নিমগ্ন হইয়াছে। প্রবল বাতাসে মঠের চারিদিগের বড় বড় গাছ থাকিয়া থাকিয়া আন্দোলিত হইতেছে; যেন প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছে, আর গাছ সকল কোমর বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে লড়াই করিতেছে। মঠের ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। মোহান্ত বাবাজী, পূজারি ও টহলিয়ার সঙ্গে মন্দিরের প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া এখন সেই তুলসী-বেদীর পশ্চাৎ ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ভাবে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে, তাই দুই চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত প্রেমাশ্রু বহিতেছে। পূজারি খোল বাজাইতে বাজাইতে ও টহলিয়া করতাল বাজাইতে বাজাইতে এখনও সঙ্কীর্ত্তনের আবেশে—

"দীনদয়াল গৌরহরি, মোরে দয়া কর হে।"

বলিয়া গান করিতে করিতে নাচিতেছে; আর তাহাদের নৃত্যের তালে তালে বাবাজীর শরীরও নাচিতেছে।

বাপ্পারাও।

(রাজস্থান।)

রাজা শিলাদিত্যের অনেকগুলি মহিষী ছিলেন। সকলেই অনুমৃতা হইলেন, কেবল একটীমাত্র রাণী বাঁচিয়া রহিলেন; সেই রাণীর নাম পুষ্পবতী। বিন্ধ্যাচলতলে তৎকালে চন্দ্রাবতী নামে এক নগরী ছিল। প্রমারবংশীয় নরপতিগণ তথায় রাজ্য করিতেন। সেই প্রমার-রাজকুলে রাণী পুষ্পবতীর জন্ম। শিলাদিত্য যখন রণশায়ী হন, পুষ্পবতী তখন গর্ভবতী। যুদ্ধঘটনার পূর্ব্বে তিনি পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। পিতৃকুলের অধিষ্ঠাত্রী ভবানীদেবীর মন্দিরে উপনীত হইয়া প্রতিদিন ষোড়শোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন, পুত্রকামনায় ভবানীর নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রতপূর্ণ হইলে আর তথম পিত্রালয়ে বাস করা অপরামর্শ ভাবিয়া পতিগৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ঐ সর্ব্বনাশ-কর যুদ্ধসংবাদ ও রাজাসহ রাজ্যনাশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। শিরে যেন বজ্রপাত হইল, সমস্ত আশা-ভরসা ফুরাইয়া গেল, সেই স্থানেই তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। সহচরীগণের শুশ্রূষায় মূর্চ্ছা অপনোদন হইলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। গর্ভে সন্তান না থাকিলে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি আত্মঘাতিনী হইতেন, সন্তানের স্নেহের অনুরোধে তাহা পারিলেন না; পতিগৃহেও গেলেন না, পিত্রালয়েও ফিরিয়া আসিলেন না, নিকটবর্ত্তী মালিয়া শৈলমালার এক গহ্বর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই গিরিগুহামধ্যেই একটী নবকুমার প্রসূত হইল।

মালিয়া শৈলমালার অতি নিকটেই বীরনগর নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী। সেই পল্লীতে একটী ব্রাহ্মণী বাস করিতেন; তাঁহার নাম কমলাবতী। রাণী পুষ্পবতী সেই কমলাবতীর গৃহে গমন করিয়া তাঁহার হস্তে সেই

নবপ্রসূত শিশুটীকে সমর্পণ পূর্ব্বক আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। চিতাপ্রবেশের পূর্ব্বে কমলাবতীর চরণে ধরিয়া সবিনয়ে তিনি বলিলেন, "দেবি! প্রাণকুমারকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম, আপন গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় ইহার লালনপালন করিবেন। ব্রাহ্মণকুমারগণের যেরূপ শিক্ষা হয়, এই শিশুকে সেইরূপ শিক্ষাপ্রদান করিয়া উপযুক্ত সময়ে একটী ক্ষত্রিয়কুমারীর সহিত ইহার বিবাহ দিবেন।"

কমলাবতী উহা স্বীকার করিয়াছিলেন। পুষ্পবতীর জীবনান্তের পর কমলাবতী সেই শিশুর জননীস্থানীয়া হইয়া অপত্যস্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। গুহায় জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কমলাবতী সেই পুত্রের নাম রাখিলেন গুহ। পুত্রনির্বিশেষে লালনপালন করিলেন বটে, কিন্তু কমলাবতী তাহাতে সুখী হইতে পারিলেন না, পুত্রটী অতিশয় অশান্ত ও অবাধ্য হইয়া উঠিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই দৌরাত্ম্য ক্রমে ক্রমে আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কমলাবতীর নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া গুহ সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়াইত, বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিত না, নাড় হইতে বিহগশাবক অপহরণ করিয়া নির্দ্দয়রূপে বধ করিত. কখন বা নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পশু-শীকারে প্রবৃত্ত হইত।

বালকের বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ। সেই সময়ে তাহার দৌরাত্ম্য এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, কেহই তাহাকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। এতৎসম্বন্ধে ভট্টকবি বলিয়াছেন, রাজপুত্রের শৈশববীর্য্য দিবাকরের প্রচণ্ড তেজের ন্যায় দুর্দ্দমনীয়।

মিবারের দক্ষিণপার্শ্বস্থ শৈলমালার অভ্যন্তরে ইদর নামে একটী জনপদ আছে। মাণ্ডলিক নামে একজন ভীলরাজা সেই জনপদের অধিকারী। রাজপুত্র গুহ সেই ভীল-বালকদিগের সহিত মিলিত হইয়া

প্রতিদিন কেবল বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। শান্তভাব তাহার ভাল লাগিত না। শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্র বাস করিতে সে বালক কদাচ ভাল বাসিত না। গুহের প্রতি ভীল-বালকদিগের এতদূর অনুরাগ জন্মিল যে, ক্রমে তাহারা গুহ ভিন্ন আর কাহাকেও আদর করিতে পারিল না। শৈলকাননকুন্তলা সেই ইদরভূমি ভীলেরা আগ্রহ পূর্ব্বক গুহকুমারের করে সমর্পণ করিল। আবুলফজলের গ্রন্থে এবং ভট্ট-কবিকুলের কাব্যে গুহকুমার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য বিবরণ লিখিত আছে।

গুহকুমার একদিন ভীলকুমারগণের সহিত খেলা করিতেছে, এমন সময়ে ভীলকুমারেরা বলিল, "আমাদের মধ্যে একজন রাজা হউক।" কে রাজা হইবে, এই তর্ক উঠিল; তর্কে তর্কে ক্রমে ক্রমে সকলেই একমত হইয়া বলিল, গুহকেই রাজা করিব। তাহাই স্থির হইল। একজন ভীলবালক তৎক্ষণাৎ আপন করাঙ্গুলি ছেদন পূর্ব্বক শোণিত লইয়া গুহকুমারের ললাটে রাজতিলক অঙ্কিত করিল। বিধাতার লিখন কে খণ্ডন করিবে! নির্জ্জন কাননে ভীলকুমারেরা একটী রাজপুত-কুমারের ললাটে রাজটীকা দিল, কেহ আর মোচন করিতে পারিল না। বৃদ্ধ ভীলরাজ মাণ্ডলিক ইহা অবগত হইয়া গুহকেই রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিলেন।

ভীলেরা বন্য, তাহারা যেরূপে ভালবাসার পরিচয় দিল, ক্ষত্রিয়কুমার গুহ সেরূপে তাহার প্রতিশোধ দিতে পারিল না। মাণ্ডলিক আপন ঔরসজাত পুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া গুহকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। গুহ কি করিল? হায় হায়! গুহ সেই সরল প্রকৃতি বৃদ্ধ ভীলরাজের প্রাণসংহার করিল। কাহার পরামর্শে কি অভিসন্ধিতে গুহ এরূপ নৃশংস কার্য্য করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর। গুহের নাম

তাহার বংশধরগণের প্রধান গোত্রাখ্যানরূপে ব্যবহৃত হইল। গোহের বংশধরেরা "গোহিলোট" অথবা "গিহ্লোট" উপাধিতে বিখ্যাত।

গোহের পর, সেই বংশের আটপুরুষ ঐ গিরিকাননপূর্ণ ইদরপ্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলগণ চিরদিন রাজপুতচরণে স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া পরাধীনতা সহ্য করিয়াছিল। আট পুরুষের পর, ভীলেরা আর তাহা পারিল না। অধস্তন অষ্টম পুরুষে নাগাদিত্য নামে এক রাজপুত্র রাজা হন। তিনি একদা বনমধ্যে মৃগয়া করিতেছিলেন, ভীলেরা তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া আপনাদের পৈতৃকরাজ্য আপনারা গ্রহণ করিল।

নাগাদিত্য-নিধনের পর, তাঁহার পরিবার মধ্যে হাহাকার পড়িল; চারিদিকে ভীল, চারিদিকে বিপদ, চারিদিকে বিভীষিকা, চারিদিকেই ভীলগণের ক্রোধমূর্ত্তি। তাহাদের কবল হইতে রাজপুতমহিলাগণকে রক্ষা করিবে কে? রাজপুতেরা এই চিন্তায় আকুল হইল। নাগাদিত্যের তখন তিনবর্ষবয়স্ক একটী শিশুপুত্র ছিল; তাহার নাম বাপ্পাদিত্য। বাপ্পার নিমিত্তই অধিক ভাবনা। কে রক্ষা করিবেন? বিধাতাই রক্ষাকর্ত্তা। বিধাতা কখনও সূর্য্যবংশ ধ্বংশ করিবেন না, ইহাই সূচিত হইল। সেই বীরনগরবাসিনী ব্রাহ্মণকুমারী কমলাবতী, যিনি অসহায় অবস্থায় সুভাগা কুমার গুহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধরেরা এই সঙ্কটকালে বাপ্পাদিগকে বাঁচাইলেন। তাঁহারা গিহ্লোট রাজপরিবারের কুলপুরোহিত। নাগাদিত্যের শিশুপুত্র বাপ্পাকে লইয়া তাঁহারা ভাণ্ডীর দুর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় যদুবংশীয় একজন ভীল তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। সে স্থানও সম্পূর্ণ নিরাপদ হইল না। সত্যপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বাপ্পাকে তথা হইতে পরাশরারণ্যে লইয়া গেলেন। সেই স্থানেই ত্রিকূট পর্ব্বত; ত্রিকূটতলে নগেন্দ্র নামে একটী সামান্য

নগর। সেই নগরের ব্রাহ্মণেরা সকলেই শান্তিপ্রিয় এবং ভগবান্ শঙ্করের উপাসক। বাপ্পাদিত্য সেই শান্তশীল বিপ্রগণের রক্ষণাধীনে অর্পিত হইল।

পঞ্চ ষষ্ঠবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাপ্পাদিত্য সেই সকল আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের ধেনুচারণ করিত। সূর্য্যবংশীয় রাজকুমারের বনে বনে গো-চারণ বিস্ময়কর ব্যাপার, ইহা কেহই ভাবিত না। বাপ্পাদিত্য পরিণামে কি হইবেন, তাহাও কেহ ভাবিত না। ভট্টকবিগণ সেই সময়ে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন।

ঝুলন-পূর্ণিমা রাজপুতগণের একটী সুপ্রসিদ্ধ আনন্দোৎসব। সেই উৎসবকাল উপস্থিত হইলে বালকবালিকাগণ মহানন্দে মত্ত হয়। নগেন্দ্রনগরে শোলান্কী-বংশীয় এক রাজা ছিলেন। ঝুলনপর্ব্ব সমাগত হইলে সেই রাজার একটী কন্যা সহচরীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া-কৌতুকার্থ কুঞ্জকাননে গমন করেন। ঝুলনমঞ্চে দুলিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু দোলা-রজ্জুর অভাবে তাঁহারা চিন্তিতা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় বাপ্পা সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হন। বালককে দেখিবামাত্র বালিকাগণ তাঁহাকে বলিল, "তুমি একগাছ রজ্জু আনিয়া দাও।" বাপ্পা অতি চঞ্চলস্বভাব, অথচ কৌতুকপ্রিয়; বালিকাগণের কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি রজ্জু দিতে পারি।" বালিকাগণ তাহাতেই সম্মত হইল। ক্রীড়াচ্ছলে কৌতুকবিবাহ সেই স্থলেই সুসম্পন্ন হইল। রাজকুমারীর ওড়্নার সহিত বাপ্পার পরিহিত বসনাগ্র একত্র সম্বদ্ধ হইল। সমস্ত বালিকাগণ পরস্পর পরস্পরের করধারণ পূর্ব্বক বাপ্পার সহিত একত্রে একটী প্রকাণ্ড সহকার-তরুর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিল। কি হইল, বাপ্পা তখন কিছুই বুঝিলেন না; পরিণামে কি হইবে, তাহা ভাবিতেও পারিলেন না।

শীঘ্রই বিচ্ছেদ হইল। বাপ্পা আর অধিক দিন নগেন্দ্রনগরে থাকিতে পারিলেন না; অচিরে তাঁহাকে নগেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করিতে হইল। সেই রাজপুত-বালিকাগণ তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়িল। সেই মহিলা-গণের গর্ভে যে সকল পুত্র-কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল, তাহাদের বংশাবলী এখন পর্য্যন্ত রাজপুতানায় আছে। পূর্ব্বকথিত লীলাপরিণয়-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া তাহারা আপনাদিগকে বাপ্পাকুলসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে দিন সেই লীলাবিবাহ, রাজপুত-বালিকাগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিয়া সে দিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিয়দ্দিন অতীত হইলে সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারী বিবাহের উপযুক্তা হইলেন। তাঁহার পিতা একটী সু-পাত্র স্থির করিলেন। বিবাহের অগ্রে পাত্রগৃহ হইতে একজন সামুদ্রিক ব্রাহ্মণ সেই রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যার করপত্রিকা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। রাজা কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া কন্যাটীকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দিলেন। কন্যার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া আগ্রহ সহকারে ব্রাহ্মণ তাহার পাণিতল পরীক্ষা করিলেন;—বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি! পূর্ব্বেই ইহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে!"

রাজা মহা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পুরীশুদ্ধ সমস্ত লোক বিস্ময়াপন্ন। "কোথায় কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, কন্যা তাহা কিছুই বলিতে পারিলেন না। বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য রাজা অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরিত হইল। ঘটনাক্রমে বাপ্পাও ক্রমে ক্রমে তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, ছন্দাংশেও সে কথা প্রকাশ পাইলে তিনি বিপদে পড়িবেন; অতএব কোন গতিকে কিছু প্রকাশ না হয়, তদর্থে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া রহিলেন। বাপ্পার সহিত যে সকল রাখালবালক ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকেও তিনি সাবধান

করিয়া দিলেন। বালকেরা তাঁহার যেরূপ অনুগত, তাঁহার প্রতি তাহাদের যে প্রকার ভক্তি, তাহাতে আদেশ লঙ্ঘনের কিছুমাত্র আশঙ্কা ছিল না, তথাপি বাপ্পা তাহাদিগকে এক কঠিন অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ করিলেন। স্বহস্তে একটী সঙ্কীর্ণ কূপ খনন করিয়া হস্তে এক শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বালকগণকে তিনি কহিলেন, "আইস, শপথ কর, সম্পদে বিপদে তোমরা আমার চিরানুগত থাকিবে। আমার সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না; আমার নামে যেখানে যাহা শুনিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমাকে আসিয়া জানাইবে। এই অঙ্গীকার যদি পালন করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমস্ত সৎকার্য্য এই শিলাখণ্ডের ন্যায় রজককূপে নিক্ষিপ্ত হইবে।" রাজপুত-বিশ্বাসে রজককূপ অতি অপবিত্র স্থান। বালকগণকে ঐরূপে অঙ্গীকারাবদ্ধ করাইবার নিমিত্ত বাপ্পা সেই প্রস্তরখণ্ডটী পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র কূপে নিক্ষেপ করিলেন। বালকেরা তৎক্ষণাৎ সমস্বরে সেইরূপ শপথ গ্রহণ করিল। এত সতর্কতা স্বত্ত্বেও বাপ্পা সঙ্কল্পিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অল্পদিন মধ্যেই গুপ্ত-বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। শোলান্‌কিরাজ বিশেষ প্রমাণে বুঝিতে পারিলেন, লীলাবিবাহে বাপ্পাই প্রধান নায়ক।

রাখালবালকেরা জনশ্রুতিতে এই বিষয় জানিতে পারিয়া বাপ্পার নিকটে সমাচার দিল। বাপ্পা তচ্ছ্রবনে বিপদাশঙ্কা করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। অধিক দূরে গমন করিতে হইল না, সেই পর্ব্বতমালার এক নিভৃততম বিজনস্থলে সঙ্গোপনে তিনি আশ্রয় লইলেন। দুইটী ভীলবালক তাঁহার সঙ্গে রহিল। তাহাদের নাম বালীয় এবং দেব। উহারা বন্য ভীলকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু হৃদয় পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ। গৃহবাস, আত্মীয়-স্বজন এবং শারীরিক সুখ-

স্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তাহারা বাপ্পার সহিত বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। কতবার কত বিপদে পতিত হইয়াছে, কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় দিবা-যামিনী যাপন করিয়াছে, তথাপি অঙ্গীকার-পালনে তাহারা পরাঙ্মুখ হয় নাই; মুহূর্ত্তের জন্যও বাপ্পাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা বাপ্পার জীবন সহচর। বাপ্পা যদি সেরূপ বন্ধু না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যে অনেক দুর্গতি হইত; তাঁহার নামটী পর্য্যন্ত হয় ত মিবারের রাজকুলের কুলপঞ্জী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

সেই ভীল-বন্ধুযুগলের সহবাসে বাপ্পা অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়াছে, কালচক্রের অসংখ্য পরিবর্ত্তনেও বাপ্পার পরবর্ত্তী বংশধরগণ অভিষেক-কালে অদ্যাপি সেই ভীলদিগের পুত্রপৌত্রাদির প্রদত্ত রক্ততিলক সাদরে ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন।

বাপ্পার পলায়ন এবং পলায়নের প্রকৃত কারণ যুক্তিপথে সুসঙ্গত বোধ হয়; কিন্তু ভট্টকবিগণ ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করেন নাই। তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ যে, দৈবনির্দ্দেশবশতঃই বাপ্পা তখন নগেন্দ্রনগর পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভট্টকবিগণের কাব্যগ্রন্থে বাপ্পাদের জীবনী নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে মিবারবাসিগণের এতদূর দৃঢ় অনুরাগ যে, সে সকল অলঙ্কার উন্মোচন করিবার প্রয়াস পাইলে তাঁহাদের মতে দেবগণের অপমান করা হয়। কবিরা বলেন, সূর্য্যবংশীয় শিলাদিত্যের বংশধর বাপ্পাদিত্য বনমধ্যে ব্রাহ্মণগণের গোরু চরাইয়া বেড়াইতেন; সেই গাভীগণের মধ্যে একটী পয়স্বিনী গাভী ছিল। দিনান্তে সেই গাভী আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে তাহার স্তন হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও দুগ্ধ নির্গত হইত না। ইহাতে ব্রাহ্মণদের মনে বিষম

সন্দেহের উদয় হইত। তাঁহারা ভাবিতেন, বাপ্পা বিজনে গাভীস্তনের সমস্ত দুগ্ধ পান করিয়া আইসে; এই সন্দেহে তাঁহারা সর্ব্বদা সতর্কভাবে বাপ্পার প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করেন। বাপ্পা তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কি করিবেন, যতদিন তাঁহাদের সেই সন্দেহ নিরাকৃত করিবার প্রকৃত উপায় অবধারিত না হয়, ততদিন মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া মৌন থাকিতে হইবে, ইহাই স্থির করিলেন। তাঁহার মনেও একটী সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, সেই সন্দেহবশেই তিনি উক্ত পয়স্বিনী গাভীর গতিক্রিয়ার প্রতি সর্ব্বক্ষণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। বনমধ্যে গাভী যে দিকে যায়, বাপ্পাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দিকে গমন করেন। গাভী একদিন একটী নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে প্রবেশ করিল, বাপ্পাও গুপ্তভাবে তথায় গমন করিলেন। অদ্ভুত দৃশ্য! বাপ্পা দেখিলেন, এক নিবিড়-লতাগুল্মের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া পয়স্বিনী বর্ষাধারার ন্যায় পয়োরাশি বর্ষণ করিতেছে। বাপ্পার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, লতামণ্ডপ-সমীপে গমন করিয়া তিনি দেখিলেন, তন্মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। সেই শিবলিঙ্গের মস্তকেই দুগ্ধধারা সিঞ্চিত হইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য ব্যতীত আর একটী দৃশ্য সেই সময় বাপ্পার নেত্রগোচর হইল। সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে এক বেতস-বন; তাহার অভ্যন্তরে একজন যোগী নেত্র নিমীলন করিয়া সমাসীন;—ধ্যানমগ্ন। বাপ্পা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল।

অসময়ে যোগিগণের ধ্যানভঙ্গ হইলে ক্রোধের উদয় হয়; কিন্তু এই যোগিবর উন্মীলিত-নয়নে বাপ্পাকে দেখিলেন, ধ্যানবিঘ্নকারী জানিলেন, তথাপি কিছুমাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। বাপ্পা কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সম্মুখে করপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই গিরিকন্দর নির্জ্জন, অভ্যন্তরভাগ চিরশান্তির নিলয়, যোগী ও তপস্বী ভিন্ন অপরে

সেই পবিত্রস্থল কখন দেখিতে পায় না; পুণ্যবলে বাপ্পা তাহা দেখিলেন। শিবলিঙ্গের মস্তকে পয়স্বিনীর যে পয়োধারা বর্ষিত হইত, যোগিবর তাহা পান করিতেন। ইতিহাস-প্রমাণে সেই যোগীর নাম হারীত।

রাজকুমার বাপ্পা হারীতের পদতলে প্রণিপাত করিলেন। হারীত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ণপরিচয় বাপ্পার পরিজ্ঞাত ছিল না, যতদূর জানা ছিল, অকপটে তাহাই তিনি যোগিবরকে কহিলেন। সে দিন আর অন্য প্রসঙ্গ কিছুই উপস্থিত হইল না, যথাসময়ে বাপ্পা ধেনুপাল লইয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

যে দিন গিরিগুহামধ্যে হারীতের সহিত বাপ্পার প্রথম সাক্ষাৎ, তাহার পরদিন হইতে বাপ্পা প্রতিদিন তাঁহার নিকট গমন করিতেন; প্রতিদিনই ভক্তিসহকারে তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিয়া দিয়া পানার্থ দুগ্ধ উপহার দিতেন। যোগিবর হারীত ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বরের উপাসক; কাননমধ্যস্থ সেই শিবলিঙ্গের পূজা করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। বাপ্পা প্রতিদিন শিবপূজার উপযোগী কুসুম চয়ন করিয়া আনিতেন। বাপ্পার অকপট ভক্তি দর্শনে হারীত নিত্য নিত্য পরম প্রীতি লাভ করিতেন; অবকাশক্রমে তাঁহাকে নানারূপ নীতিশিক্ষা প্রদান করিতেন, তাঁহার কৌতুক হইত।

কিছুদিন অতিক্রান্ত হইল। ক্রমে ক্রমে বাপ্পার প্রতি হারীত এতদূর প্রসন্ন হইলেন যে, তাঁহাকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার গলদেশে পবিত্র যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দিলেন। তদবধি বাপ্পার উপাধি হইল, "একলিঙ্গকা দেওয়ান।"

বাপ্পার অকপট ভক্তিতে ভগবতী পার্ব্বতীও প্রীত হইয়াছিলেন। একদা তিনি শূন্যমার্গ হইতে কেশরী আরোহণে বাপ্পার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত শূল, খড়্গ, ধনুঃ-শর, তূণীর এবং অসি-চর্ম্ম প্রভৃতি

বহুতর দিব্যাস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভূতনাথের কৃপায় ভবানী-প্রদত্ত বিস্বাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাপ্পা শত্রুকুলের অজেয় হইয়া উঠিলেন।

যোগিবর হারীতের মহাপ্রস্থানের দিন সমাগত হইল। যে দিন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, সেই দিন অতি প্রত্যুষে বাপ্পাকে ঐ গিরিগুহায় উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাপ্পা সে দিবস ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত থাকাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নিরূপিত সময় উত্তীর্ণ হইলে বাপ্পা তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, যোগিবর হারীত এক দীপ্তিময় রথে আরোহণ পূর্ব্বক শূন্যপথে কিয়দ্দূর উপস্থিত হইয়াছেন। প্রিয় শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত যোগিবর ইচ্ছানুসারে রথের গতিরোধ করিলেন, এবং বাপ্পাকে তৎসমীপে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। অকস্মাৎ বাপ্পার দেহ বিংশতি হস্ত বাড়িয়া উঠিল; তাহাতেও তিনি গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যোগিবর তাঁহাকে মুখব্যাদান করিতে কহিলেন। বাপ্পা আদেশপালনে বিরত হইলেন না। হারীত তাঁহার মুখবিবরে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলেন। ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বাপ্পা মুখ অবনত করাতে সেই নিষ্ঠীবন তদীয় চরণতলে নিপতিত হইল। যদি তিনি ঘৃণা না করিতেন, তাহা হইলে অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন। যদিও অমর হইতে পারিলেন না, কিন্তু যোগিবরের প্রসাদে তাঁহার দেহ সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের অভেদ্য হইবে, এইরূপ বরলাভ হইল। হারীতের রথ অচিরকালমধ্যে সুনীল নভোমণ্ডলে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কবিগণের কাব্যগ্রন্থে বাপ্পার সম্বন্ধে অনেক প্রকার অদ্ভুত কথা বর্ণিত আছে। তাঁহার পরিধেয়-বসন অর্দ্ধ সহস্র হস্ত দীর্ঘ ছিল এবং ভগবতী ভবানীর নিকটে যে তরবারিখানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ বত্রিশ সের।

বাপ্পা যে দিন ঐরূপে গুরুদত্ত বরে অনুগৃহীত হইলেন, সেই দিন

হইতে তিনি মূল-মন্ত্রের সাধনায় কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বরদায়িনী মূর্ত্তিতে সিদ্ধি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। বাপ্পা একদা জননীর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি চিতোরের তদানীন্তন মৌর্য্য-নৃপতির ভাগিনেয়। সেই সম্বন্ধবন্ধনের বিষয় স্মরণ করিয়া বাপ্পা ইষ্টমন্ত্রসাধনে দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইলেন। তদবধি কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে তিনি সেই আরণ্যবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকালয়ে দর্শন দিলেন। লোকালয় দর্শন তাঁহার সেই প্রথম। লোকালয়ের জীবন্ত-ভাব অবলোকন করিয়া তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বননিবাস হইতে বহির্গত হইবার সময় প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ নামক সিদ্ধপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সেই মহাপুরুষ তাঁহাকে একখানি সুদীর্ঘ তরবারি প্রদান করিলেন। সেই মহাস্ত্রের উভয় দিক সুশাণিত। মন্ত্রপূত করিয়া সেই প্রচণ্ড তরবারি-সাহায্যে দুর্ভেদ্য গিরিগাত্র বিদারণ করা যায়। যাঁহার প্রদত্ত সেই তরবারি, সেই সিদ্ধপুরুষ ব্যাঘ্রমেরু পর্ব্বতে অবস্থান করিতেন। উদয়পুরের পূর্ব্বদিকস্থ গিরিপথের সাত মাইল দূরে ব্যাঘ্রমেরু পর্ব্বত। সিদ্ধপুরুষ-প্রদত্ত সেই পবিত্র তরবারি আজিও উদয়পুরে আছে। রাণা আপন সামন্তদলের সহিত প্রতিবর্ষে ভক্তি-সহকারে সেই তরবারির পূজা করিয়া থাকেন। খড়্গাশুদ্ধির মন্ত্র এইরূপ ;—"গুরু গোরক্ষনাথ, দেবদেব একলিঙ্গ তক্ষক, মহর্ষি হারীত এবং ভগবতী ভবানীর আজ্ঞাক্রমে আঘাত কর।"

প্রমার-বংশের একটী শাখা মৌর্য্যবংশ। সেই বংশের নরপতিগণ ইতিপূর্ব্বে মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা তদানীন্তন ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতি। বাপ্পা যে সময় চিতোরে উপস্থিত হন, তৎকালে চিতোরে যে মৌর্য্য নরপতি রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নাম মান। বাপ্পার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মানরাজ তাঁহাকে পরমাদরে গ্রহণ করিলেন

এবং তাঁহাকে আপন অধীনস্থ সামন্ত-সমিতির নায়কত্বে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মানসিংহের শাসনসংক্রান্ত যে প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয়, রাজস্থানে তৎকালে সামন্তপ্রথা বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল। রাজপুত-সামন্তগণ বিপুল ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়া রাজার সাহায্যার্থ বিপক্ষসমরে অবতীর্ণ হইতেন। বাপ্পার আগমনের পর হইতে সামন্তগণের প্রতি রাজার অনুরাগ ও যত্ন হ্রাস হইতে লাগিল। বাপ্পাই সমরবিভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। সামন্তেরা বাপ্পাকে শত্রু বিবেচনা করিয়া হিংসাবশে তাঁহার অনিষ্ট-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এই সময় এক মহাবল বৈদেশিক বৈরীকর্ত্তৃক চিতোরপুরী আক্রান্ত হয়। রাজা মানসিংহ আপন অধীনস্থ সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধার্থ অনুজ্ঞা প্রদান করেন। সামন্তেরা সগর্ব্বে আপনাদের বৃত্তিমূল সনন্দপত্র-গুলি তাচ্ছিল্যভাবে দূরে নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আমরা কোন কার্য্যের নহি,—আমাদিগকে আহ্বান কেন? আপনার প্রিয় সেনানী বাপ্পাকেই সমররঙ্গে বরণ করুন।" রাজা মানসিংহ সামন্ত-গণের এইরূপ উক্তিতে ক্ষুণ্ণ হইলেন, তাঁহার অন্তরে কিছু ভীতিসঞ্চারও হইল; কিন্তু বীরবর বাপ্পা সামন্তগণের সদর্পবাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বয়ং সুদৃঢ়-বর্ম্মাবৃত শরীরে সেনাপতি হইয়া অগ্রসর হইলেন। গর্ব্বিত সামন্তগণ রাজবৃত্তি পরিহার করিলেও সুসজ্জিত সেনাপতির অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেন। বাপ্পার বিপুল পরাক্রমে বিপক্ষদল পরাজিত হইল। সামন্তগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। রাজা মানসিংহের বিজয়নিনাদে নগরডঙ্কা বাদিত হইতে লাগিল। মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাপ্পা সেই রণজয়ীবেশে চিতোর নগরে মাতুলসমীপে গমন না করিয়া আপন পিতৃপুরুষদিগের রাজধানী গজনী নগরে গমন করিলেন। একজন

ম্লেচ্ছরাজ তৎকালে গজনীর অধিপতি ছিলেন ;—তাঁহার নাম সেলিম্। বাপ্পা সেই সেলিমকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সূর্য্যবংশীয় একজন সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সেনাদল সমভিব্যাহারে সগৌরবে চিতোরে ফিরিয়া আসিলেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, সেলিমকে পরাজিত করিয়া সেলিমের একটী কন্যাকে বাপ্পা স্বয়ং বিবাহ করিয়াছিলেন।

বাপ্পার বীরত্বে ও গৌরবে ঈর্ষান্বিত হইয়া চিতোরের পুরাতন সর্দ্দারগণ চিতোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলেন। রাজা মানসিংহ তাহাতে সুখী হইলেন না। সর্দ্দারগণকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত তিনি বারংবার দূত প্রেরণ করিলেন, সমস্তই বিফল হইল। সামন্তগণ কিছুতেই বিষম বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অধিক কি, গুরুর অনুরোধ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইল। একজন রাজদূতকে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আমরা মানসিংহের নিমক খাইয়াছি, বহুদিন তাঁহার অধীনে সসম্মানে দিনপাত করিয়াছি, এক বৎসর বিশ্বাস নষ্ট করিব না, এক বৎসরকাল প্রতিশোধ লইতে নিবৃত্ত থাকিব।"

চিতোরের গৌরব নষ্ট করা চিতোরের সামন্তগণের ব্রত হইয়া উঠিল। তাঁহারা একজন উপযুক্ত অধিনায়কের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিহিংসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি না হইলে তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না, ইহাই তাঁহাদের ঘোষণাবাক্য। প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধীভূত হইয়া তাঁহারা এক অনার্য্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, যে বাপ্পাকে পাইয়া রাজা আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই বাপ্পাকেই আমরা বৈরনির্য্যাতনের সহায় করিয়া লইব ;—সেই সঙ্কল্পই স্থির হইল। অবশেষে বাপ্পার অসীম শৌর্য্য ও গুণগৌরবের বশীভূত হইয়া তাঁহারা সম্মানসহকারে বাপ্পাকেই আপনাদের সেনাপতি নির্ব্বাচন

করিলেন। অহো! রাজ্যলিপ্সা কি ভয়ঙ্করী! ইহার মোহিনীমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মনুষ্যেরা হিতাহিতবিবেক পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দেয়, পবিত্র কৃতজ্ঞতাকে দলন করিয়া চির-উপকারী সুহৃজ্জনের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সামন্তেরা রাজ্যলিপ্সায় প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয় নাই, কিন্তু বীরবর বাপ্পা রাজ্যলোভেই দুরাকাঙ্ক্ষ সামন্তগণের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিলেন। মানরাজ তাঁহার মাতুল, তাঁহার অনুগ্রহই তাঁহার সৌভাগ্যোদয়ের প্রধান হেতু। তিনি তাঁহার জন্য আপন সামন্তগণের বিষনয়নে পতিত, অথচ বাপ্পা তৎসমস্ত বিস্মৃত হইয়া, তৎকৃত উপকার বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকেই সিংহাসনচ্যুত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মাতুলকে বিনাশ করিয়া বিদ্রোহী সামন্তগণের সহায়তায় চিতোরের সিংহাসন অধিকার করা তাঁহার সঙ্কল্প হইল। বাপ্পা তখন দৈববলে বলীয়ান্, দেবদত্ত অসি তাঁহার সহায়, ধর্ম্মবিরোধী হইলেও তাঁহার সেই সঙ্কল্পসাধনের বিলম্ব হইল না। বাহুবলে মান-সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনি চিতোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া তিনি সর্ব্বসম্মতিক্রমে "হিন্দুমুকুট" "হিন্দুসূর্য্য" "রাজগুরু" "সার্ব্বভৌম" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

সৌভাগ্যের সময় অনেক প্রকার সহায় লাভ হয়। বাপ্পাসিংহ চিতোরাধিপতি হওয়াতে চিতোরের সামন্তগণ তাঁহার অনুবল হইয়া রহিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য; তদতিরিক্ত রাজস্থানে অপরাপর রাজা হইতেও অনেক বীরপুরুষ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অপর কোন বলবান্ রাজা কিছুদিন চিতোর আক্রমণে সাহসী হইলেন না। বাপ্পা নিরুদ্বেগে নিরুপদ্রবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল।

কতকগুলি পুত্র তাঁহাদের পৈতৃকরাজ্য সৌরাষ্ট্রদেশে গমন করিল। তাঁহাদের সন্তানগণ পর্য্যায়ক্রমে ঘোরতর প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল আইন-আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বাপ্পাবংশের পঞ্চাশৎ সহস্র বীর আক্‌বর শাহের সময়ে মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া নানাস্থলে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। বাপ্পার পাঁচটী পুত্র মারবাররাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় গোহিল নামে প্রসিদ্ধ হন। প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অধিকদিন তাঁহারা মারবারে থাকিতে পারেন নাই; শীঘ্রই বিপক্ষকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাঁহারা বল্লভীপুরে ধ্বংসশেষ পুরীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন। তথায় তাঁহারা দীনভাবে কাল-যাপন করিতেছেন। আপনাদিগের পবিত্র কুলগৌরবে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা এখন আরবদিগের সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

পরিণতবয়সে বাপ্পারাজ আপন মাতৃভূমি, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতীচ্য খোরাসানরাজ্যে উপস্থিত হন খোরাসান জয় করিয়া তিনি তত্রত্য অনেকগুলি ম্লেচ্ছকামিনীকে বিবাহ করেন। সেই সকল কামিনীর গর্ভে বাপ্পার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

শতবর্ষ বয়ঃক্রমে বীরকেশরী বাপ্পা মানবলীলা সম্বরণ করেন। কৈলবারার রাজনিকেতনে একখানি প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহার নির্ঘণ্টমধ্যে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাণ, তুরাণ ও কাফ্রিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় নানা প্রদেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়া বাপ্পা তাঁহাদিগের দুহিতৃগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সকল রাণীর গর্ভে বাপ্পার ঔরসে একশত ত্রিংশৎ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। সেই সকল পুত্র "নৌসেরা পাঠান" নামে বিখ্যাত। তাঁহারা আপনাদের জননীর নামানুসারে এক একটী স্বতন্ত্র

বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। হিন্দুমহিষীগণের গর্ভে বাপ্পার অষ্টনবইটী পুত্র সঞ্জাত হইয়াছিল; তাহারা সকলেই সূর্য্যবংশী অগ্নি-উপাসক।

ভট্টগ্রন্থে বর্ণিত আছে, বাপ্পার মৃত্যু হইলে পর তাঁহার দেহের সৎকারসম্বন্ধে তদীয় হিন্দু ও ম্লেচ্ছ সন্তানগণের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুপুত্রেরা দাহ করিতে অনুরাগী, মুসলমান-পুত্রেরা ভূগর্ভে নিহিত করিবার জন্য ব্যগ্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও ঘটিয়াছিল, কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে পারেন নাই; দাহ কি সমাধি, এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসাও হয় নাই। দ্বন্দ্বকালে পুত্রেরা পিতার দেহাবরণ উত্তোলন করিয়া দেখিয়াছিল, পঞ্চভূতাত্মক দেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম বিরাজ করিতেছে। সেই সকল পদ্ম তলা হইতে মৃণালসহ উৎপাটন করিয়া মানস-সরোবরে স্থাপন করা হইয়াছিল। একজন কবি লিখিয়াছেন, যবনকন্যাগণকে বিবাহ করিবার পর বাপ্পা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুমেরু-শিখরে তপস্যা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, শিলাদিত্যের রাজত্বকালে ২০৫ সম্বতে বল্লভীপুরী উৎসন্ন হয়। বাপ্পারাও শিলাদিত্যের অধস্তন নবম পুরুষ। রাণার প্রাসাদে যে সকল ভট্টগ্রন্থ রক্ষিত আছে, তাহার সহিত এ বর্ণনার মিল নাই। সে সকল গ্রন্থে লিখিত আছে, ১৯০১ সম্বতে বাপ্পারাওয়ের জন্ম। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতুলকর্ত্তৃক সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়া সামন্তগণের আনুকূল্যে মাতুলকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। এই সকল বিরোধিমতের মধ্যে কোন্‌টী পরিশুদ্ধ, ইতিহাস দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিবার উপায় ছিল না। উদ্যমশীল টড সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল বিরোধিমতে যথাসম্ভব সমন্বয়সাধন করিয়াছিলেন। শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, ক্ষোদিত স্তম্ভ প্রভৃতি নিদর্শনে

মিবার রাজ্যের যতদূর সত্য পরিচয় পাওয়া যায়, অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে টড সাহেব সেই সকল ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

বহু অনুসন্ধানের পর টড সাহেব সৌরাষ্ট্রনগরে সোমনাথ দেবের মন্দিরগাত্রে একখানি শিলালিপি দর্শন করেন। সেই লিপিখানির সাহায্যে তিনি নানাপ্রকার সত্য-সামঞ্জস্য স্থির করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সেই শিলালিপিতে "বল্লভী-সম্বৎ" নামে একটী বর্ষ-গণনার উল্লেখ আছে। বিক্রমাদিত্য-সম্বতের তিনশত পঁচাত্তর বৎসর পরে তাহা প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ২০৫ সম্বতে বল্লভীপুরী বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সেই সম্বৎ বিক্রমাদিত্য-সম্বৎ নহে, বল্লভী-সম্বৎ।

বাপ্পা যৎকালে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্র। মিবার রাজ্যের মধ্যে আইতপুর নামে একটী প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সে নগর এক্ষণে অসভ্য ভীল ও বন্য পশুকুলের আশ্রয়স্থান হইয়াছে। আইতপুরের ধ্বংসরাশির মধ্যেও একখানি স্মারকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহারাজ শক্তিকুমার পর্য্যন্ত মিবারের চতুর্দ্দশ নৃপতির বংশবিবরণ সেই লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাপ্পার নামও তাহাতে আছে। সে লিপিতে তিনি শৈল নামে বর্ণিত। রাজপরিবারের কোষ্ঠীপত্রিকার সহিত উক্ত শিলালিপির প্রায় সকল বিষয়েই ঐক্য আছে, কেবল একটীমাত্র নাম শিলালিপিতে অধিক; ভট্টগ্রন্থেও ঐরূপ।

হিউম সাহেব বলিয়াছেন, ভট্টকবিরা যদিও আপনাদের কল্পনাবলে প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করেন, যদিও তাঁহারা ইচ্ছানুসারে সত্য ঘটনার অঙ্গে অদ্ভুত অদ্ভুত অলঙ্কার জড়িত করিয়া দেন, তথাপি তাঁহারাই প্রাচীন জগতের একমাত্র ইতিহাসবেত্তা। তাঁহাদের অতিরঞ্জনের অভ্যন্তরেও

প্রকৃত সত্য সর্ব্বদা বিরাজ করে। কবিকল্পনার মহিমাকে যাঁহারা অনাদর করেন, তাঁহারা পণ্ডিতবর হিউম সাহেবের ঐ সারকথাগুলি স্মরণ করিবেন। আদিত্যপুরীর ধ্বংসরাশির সহিত যে নৃপনামাবলী লোকলোচন হইতে অন্তরিত হইতেছিল, কবিকল্পনার মহিমায় নিবিড় আবরণেও সেই সকল নাম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে।

বাপ্পারাওয়ের সমসময়েই মুসলমানেরা সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতভূমি আক্রমণ করিয়াছিল। পঞ্চনবতিতম হিজিরা-শকে খলিফা ওয়ালীদের সেনাপতি মহম্মদ বীন কাশিম সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ভাগীরথীর সৈকতভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আরব-গ্রন্থকারেরা এই সকল বিষয় পরিষ্কাররূপে লিখিয়াছে। আজমীরাধিপতি মাণিক রায়ের রাজ্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে একদল বৈরীকর্ত্তৃক উৎসন্ন হইয়াছিল। সেই বৈরীদল সমুদ্রপথে পোতারোহণে আগমন করিয়া আঞ্জর নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়। অনেকে অনুমান করেন, সেই আক্রমণকারী বৈরী দুর্দ্ধর্ষ বীরকেশরী বীন কাশিম। আবুলফজল লিখিয়াছেন, হিজিরা ৯৫ অব্দে কাশিম সদর্পে সিন্ধুরাজ দাহিরকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য নষ্ট করেন। দাহিরের পুত্র চিতোরে পলায়ন করিয়া মৌর্য্য-নৃপতির নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন।

বাপ্পা ও শক্তিকুমারের রাজত্বকালের মধ্যবর্ত্তী সময় দুইশত বৎসর। ইহাদের মধ্যে নয়জন নৃপতি চিতোরের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজন প্রধান;—কনকসেন, শিলাদিত্য, বাপ্পারাও এবং শক্তিকুমার।

সিরাজদ্দৌলা।

(শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।)

বাল্যলীলা।

রোমক-সভ্যতার তিরোভাবে ইউরোপখণ্ড অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। শিল্প-বিজ্ঞানের অভাবে শিক্ষা-দীক্ষার দুর্দ্দশায়, ইউরোপীয়-গণ একপ্রকার অসভ্য বর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধ্যযুগের অবসানে আবার ইউরোপের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইল, শিক্ষার জ্যোতিতে আবার চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, উৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়নায় ধনরত্নের সন্ধানে লোকে দেশে দেশে ছুটিতে আরম্ভ করিল; পুরাতন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থাবলীর জরাজীর্ণ কীটদষ্ট দুই এক পাতা যে যেখানে কুড়াইয়া পাইল, তাহাই লোকে আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত হইল। এইরূপে কালক্রমে ভারতবর্ষের নাম ইউরোপে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সেকালে "স্বর্ণখনি" বলিয়া ভারতবর্ষের সুখ্যাতি ছিল; অধ্যবসায়ী ইউরোপীয়গণ সেই স্বর্ণখনি হস্তগত করিবার আশায় নানা পথে সমুদ্র যাত্রা করিলেন, এবং অধ্যবসায়গুণে কালক্রমে ভারতবর্ষের সন্ধান লাভ করিলেন। দলে দলে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই স্বর্ণখনি সহসা হস্তগত করিবার সেরূপ সম্ভাবনা না দেখিয়া তাহার ধনরত্ন কুক্ষিগত করিবার আশায় দেশে দেশে বাণিজ্যালয় খুলিয়া, পণ্যদ্রব্য সাজাইয়া, ডাকহাঁক আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য কতকগুলি কাচের পুতুল,—এদেশের লোক তাহাতে ভুলিল না। ইংরাজ বণিক গ্রামে গ্রামে সেই সকল পণ্যদ্রব্য লইয়া "বহুত আচ্ছা মাল যাতা হায়" বলিয়া অনেক চীৎকার

করিলেন, কৌতুক দেখিবার জন্য কেহ কেহ বোঝা নামাইতে বলিল, কিন্তু একজনেও 'সওদা' করিল না! সওদাগরেরা অবশেষে কুঠি খুলিয়া এদেশের কার্পাস এবং পট্টবস্ত্র বিলাতে রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিলেন; কারবার বেশ জাঁকিয়া উঠিল, দেশের লোকের সঙ্গেও একটু আধটু করিয়া আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল।

মুসলমান নবাব বিদেশীয় বণিকের সৌভাগ্য-গর্ব্বে সেরূপ আনন্দ অনুভব করিলেন না। ইংরাজেরা কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানটী নামক তিনখানি গণ্ডগ্রাম লইয়া ছোট-খাট একটী দুর্গ ও বাণিজ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; দিল্লীর নাম-সর্ব্বস্ব বাদশাহের "ফরমাণ" দেখাইয়া জলে স্থলে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং আরও ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার ক্ষমতাপত্র আনাইয়াছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ জমিদারদিগকে শাসন করিয়া দিলেন, কেহ ইংরাজের নিকট সূচ্যগ্র ভূমিও বিক্রয় করিতে সাহস পাইলেন না, অগত্যা ইংরাজ-বণিক দেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিল্লীর বাদশাহের বাহুবল ক্রমেই টুটিয়া আসিতেছিল। অযোধ্যায় এবং দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য গঠিত হইতেছিল। শিবাজীর পদানুসরণ করিয়া মহারাষ্ট্র সেনা হিন্দুসাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতেছিল, দেখা দেখি বাঙ্গালার নবাবেরাও বাদশাহকে রাজকর প্রদানের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছিলেন। বাঙ্গালাদেশ প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বাধীন, কেবল কাগজপত্রে দিল্লীর অধীন বলিয়া পরিচিত হইতেছিল।

এই সময়ে সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার নবাব। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই লোকের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রিয়লালসাই তাঁহার কাল হইল! তিনি মোহান্ধ হইয়া একদিন জগৎশেঠের পুত্রবধূকে ধরিয়া আনিলেন; দেশের লোক একেবারে শিহরিয়া উঠিল! রাজা ও

জমীদারবর্গ সকলে মিলিয়া সরফরাজকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

সেকালের জমীদারদিগের ক্ষমতা ছিল, পদগৌরব ছিল, দিল্লীর দরবারে পরিচয় ছিল। তাঁহারা দশজনে মিলিয়া বাদশাহকে ধরিয়া বসিলে ইচ্ছামত লোককে নবাব করিতে পারিতেন। সরফরাজের অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া সকলে মিলিয়া সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, কিছু দিনের মধ্যেই বাদশাহের অনুমতি আসিল।

সরফরাজের পিতা সুজা খাঁর নবাবী আমলে হাজি আহ্‌মদ ও আলিবর্দ্দী খাঁ নামে দুইজন সুশিক্ষিত প্রতিভাসম্পন্ন মুসলমানের বড়ই প্রাধান্য হইয়াছিল। তাঁহারা দুই সহোদর সুজা খাঁর দক্ষিণ বাহু হইয়া প্রথমে মুর্শিদাবাদের মন্ত্রভবনে, পরে উড়িষ্যা ও পাটনার রাজধানীতে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী পাটনার নবাব বলিয়া পরিচিত ছিলেন; লোকে তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। সরফরাজ সেই গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ পাইয়া পাটনা অভিমুখে চলিলেন, আলিবর্দ্দীও বাদশাহের ফরমাণ পাইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গিরিয়ার প্রান্তরে উভয় নবাবের যুদ্ধ হইল। সরফরাজ নিহত হইলেন, আলিবর্দ্দী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

আলিবর্দ্দী হিন্দু-মুসলমানের প্রিয়পাত্র, শুদ্ধ, শান্ত, উৎসাহশীল, ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু নরপতি বলিয়া পরিচিত। তিনি হিন্দুদিগকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন; লোকে বলে, তিনি যখন পাটনার নবাব, তখনই একজন হিন্দু সাধুপুরুষ নাকি তাঁহার সিংহাসন লাভের কথা গণনা করিয়া দিয়াছিলেন। মূল কাহিনী যাহাই হউক, আলিবর্দ্দী যে বাপুদেব শাস্ত্রী ও তাঁহার শিষ্য নন্দকুমারকে সবিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন, এরূপ জনরব এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।

আলিবর্দ্দীর তিনটি মাত্র কন্যা, একটিও পুত্রসন্তান নাই। তিনি নিজ ভ্রাতা হাজি আহম্মদের তিন পুত্র নওয়াজেস্ মোহম্মদ, সাইয়েদ আহম্মদ এবং জয়েনউদ্দীনের সঙ্গে আপন তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; এবং সিংহাসন লাভ করিলে, যথাকালে তিন জামাতাকে তিন প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে জয়েনউদ্দীন পাটনায়, সাইয়েদ আহম্মদ পূর্ণিয়ায় এবং নওয়াজেস্ মোহম্মদ ঢাকায় থাকিয়া নবাবী করিতেন।

আলিবর্দ্দী যে সময়ে পাটনার শাসনভার প্রাপ্ত হন, সেই শুভ সময়ে তাঁহার কন্যা আমিনা বেগমের গর্ভে মিরজা মোহম্মদ নামে তাঁহার এক দৌহিত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী সেই শুভ দিনের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে নবজাত শিশুকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ যে বালক, কাল সে যুবা হয়; আজ সূতিকাগৃহের ধাত্রীক্রোড় যাহার একমাত্র ক্রীড়াভূমি, কালে সমগ্র পৃথিবীও তাঁহার জন্য যথেষ্ট বিহারক্ষেত্র দেখাইয়া দিতে পারে না! আজ যে আলিবর্দ্দীর স্নেহ-পুত্তল পোষ্যপুত্র, সময়ে সেই বালকই যে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা নামে জগতের নিকট চিরপরিচিত হইবে, তাহা কে জানিত?

বাল্যকাল বড়ই সুখের কাল; কিন্তু বাল্যকালই আবার ভবিষ্যতের অনেক দুঃখ যন্ত্রণার মূল। যেভাবে যাঁহার সহবাস, যেরূপ শাসনে বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়, পরজীবনে তাহার দাগ একবারে বিলীন হয় না। মানব-চরিত্র বুঝিতে হইলে, লোকে সেই জন্য বাল্যজীবনের আলোচনা করিয়া থাকে;—আমরাও বালক সিরাজদ্দৌলার বাল্যজীবনের আলোচনা করিব।

সিরাজদ্দৌলা মাতামহের স্নেহ-পুত্তল, সেই মাতামহ আবার

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপান্বিত নবাব ;—সুতরাং বালক সিরাজদ্দৌলা যখন যাহা ধরিয়া বসেন, "সাগর ছেঁচিয়া সাত রাজার ধন এক মাণিক" আনিতে হইলেও, মাতামহ তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া হাজির করেন! তাড়না নাই,—স্নেহ-সম্ভাষণ আছে; শাসন নাই,—আব্‌দারপূরণটুকু পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে; ইহাতে আব্‌দার দিন দিনই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। আব্‌দার পুরণ করিয়া শিশুর মুখে সাময়িক উৎফুল্লতা দেখিতে কোন্ মাতামহের না ইচ্ছা হয়? তাহাতে আবার আলিবর্দ্দীর পুত্রসন্তান নাই।

শিশু যাহা ধরিয়া বসে, তাহা প্রায়ই অকিঞ্চিৎকর অথবা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। সে কখন হাতী চায়, কখন বা ঘোড়া চায়, কখন বা একেবারে চাঁদখানা হাতের মধ্যে ধরিতে চায়! গরীব লোকে আর কি করিবে? শোলার হাতী, মাটীর ঘোড়া কিনিয়া দেয় এবং "আয় আয়, চাঁদ আয়" বলিয়া আকাশের চাঁদকে সাদর সম্ভাষণে আবাহন করে। বড় লোকে সত্য সত্যই হাতী ঘোড়া কিনিয়া দেয়, চাঁদ ধরিবার জন্য লোক লস্করের উপর হুকুম জারি করে ;—শিশু ভবিষ্যতে চাঁদ হাতে পাইবার আশায় আশ্বস্ত হয়। এ সকলি অতি তুচ্ছ বিষয়; কিন্তু এই সকল তুচ্ছ বিষয় হইতেই শিশুর একটি প্রবল কুশিক্ষার আরম্ভ হয় এবং একটি প্রয়োজনীয় সুশিক্ষার অভাব জন্মে। সে প্রবৃত্তি দমন করিতে শিখে না; ইচ্ছামাত্রে বাঞ্ছিত বস্তু হাতের কাছে না পাইলে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে না। মাতামহের আদরে সিরাজের তরল হৃদয়ে এইরূপ অনেক কুশিক্ষার বীজ পতিত হইতে আরম্ভ করিল। বালক সিরাজদ্দৌলা প্রবৃত্তি দমনের শিক্ষা পাইলেন না; বাল্যকাল হইতেই মনোবৃত্তির বেগ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই বালক যে একদিন বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার "মসনদে"

উপবেশন করিবে, সে কথা লোকের কাছে বেশী দিন গোপন রহিল না। দাসদাসী এবং আত্মীয়-বন্ধুদিগের শিষ্টাচারে এবং কথোপকথনে বালক সিরাজদ্দৌলাও বুঝিলেন যে, তিনি একটি ক্ষুদ্র নবাব! শৈশব-জীবনেই বিলাসের বীজ পতিত হইল; পার্শ্বচরেরা প্রাণপণ যত্নে তাহাকে অঙ্কুরিত ও ফলফুলে সুশোভিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

রাজ-প্রাসাদের আশে-পাশে যাহাদের গতিবিধি, তাহারা একেবারে স্বার্থশূন্য নহে। কেহ পরের খরচে বাবুগিরি চালাইবার আশায়, কেহ বা পরের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া ডুব দিয়া জল খাইবার ভরসায় রাজকুমারদিগের সহবাসে মিলিত হইতে আরম্ভ করে; আলিবর্দ্দীর ধর্ম্ম-জীবন এই শ্রেণীর লোকের নিকট চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিল। আলিবর্দ্দী কর্ত্তব্যপরায়ণ;—কর্ত্তব্যপালনে ধর্ম্ম আছে, পুণ্য আছে, যশো-গৌরব আছে; কিন্তু নিয়ত কর্ত্তব্যপালনে আমোদ কোথায়? নবাব হইয়াও যদি একটিমাত্র মহিষী এবং রাজ্যচিন্তা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবেন, তবে আলিবর্দ্দী নবাব হইলেন কেন? আলিবর্দ্দীর উন্নত জীবন যাঁহাদের নিকট এই সকল কারণে নিতান্ত উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা পছন্দমত নবাব গড়িবার আশায় গায়ে পড়িয়া সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত হইতে লাগিলেন।

*   *   *   *   *

আলিবর্দ্দীর বুড়া বয়সের অসঙ্গত স্নেহপ্রবণতায় সিরাজদ্দৌলার শাসন-কার্য্যের সময় হইয়া উঠিল না!

বাল্য ফুরাইল, কৈশোর আসিল; কৈশোরও ফুরাইল, যৌবন আসিল;—কেবল শাসনের সময় আসিল না! সিরাজ ক্রমে ক্রমে কুক্রিয়াসক্ত যুবকদলের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদের দলপতি হইয়া উঠিলেন।

কৃত্তিবাস।

(স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী)

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান্, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত? কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়নরঞ্জন হইবে? কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্রের স্মরণপূর্ব্বক কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই কেবল বাল্মীকির আদর্শই তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজনমত অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্যকবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসরণে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য ততই অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণ গ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণভাবে সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই অধ্যায়গুলির মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদ রায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর "রামরসায়নের" অশোকবন বর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সরলভাষা এবং সুস্পষ্টভাব,—এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে



স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায়, তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই।

যে কবি যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জল ভাষায় মনের ভাবরাশি, তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার "রামায়ণ" অপরাপর "রামায়ণ" অপেক্ষা ভাবুক-সমাজে অথবা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সমাজেই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এই গুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকালে হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তরচরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য সহকারে বর্ণসংযোগ করিয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সতর্কহস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, তৎ তৎ চিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের অনুগতভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের গুরুভারে বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্টা হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া বলিয়া গিয়াছে। আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা

তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণী-সঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সর্ব্বজনসেব্য হইয়াছে।

* * * * *

আনুমানিক ১৩০৬ শক, ১৩৮৫ খৃঃ অব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতি গৃহে যেদিন বীণা-পাণির চরণকমল অর্চ্চিত হইয়াছিল, "সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নমঃ" বলিয়া যে দিন ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে স্তব করিতে করিতে হিন্দু তাহার চিরপ্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছিল, সেই শুভক্ষণেই যাঁহার জন্ম, তাঁহার জীবন যে সেই বাগ্দেবতার অনুগ্রহে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে তাহাতে আর কথা কি?

৭৩২ খৃঃ অব্দে আদিশূর কণোজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের অন্যতম ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন নরসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদানুজ সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন। আন্দাজ ১২৪৮ অব্দে এই নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্পে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফুলিয়ার তখন বড় স্পর্দ্ধার দিন! কৃত্তিবাস নিজেই স্বীয়-বংশ পরিচয়ের সময়ে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এখানে "মালঞ্চ" ছিল, নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম হয় "ফুলিয়া"। এই ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বীচি-মালিনী ভাগীরথী রজত-ধারায় প্রবাহিত ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের ইহা লীলানিকেতন ছিল। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ নরসিংহ তাঁহার তদানীন্তন পদোচিত বিভবাদির সহিত এই মনোহর স্থানে আসিয়া একেবারে জুড়িয়া বসিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষায়—

"ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥"

ফুলিয়া "চাপিয়া" তাঁহার বসতি হইল। এই নরসিংহের পরম দয়ালু পুত্র গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি ওঝা, কৃত্তিবাসের পিতামহ এক অতি প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার কোন গ্রন্থাদির পরিচয় পাই না সত্য, কিন্তু কবি কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাস মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এই মুরারি ওঝার পৌত্র কৃত্তিবাসের নিজের উক্তিতেই দেখিতে পাই, বাল্যে প্রথমতঃ চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষাই তদীয় সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের সোপান। পাঠ সমাপ্তির পর তদানীন্তন প্রথা অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় আত্মপরিচয়ার্থ উপস্থিত হন। রাজা তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। "তথাস্তু" বলিয়া কৃত্তিবাস যখন সগর্ব্বে বাহির হইলেন, তখন সকলে "ধন্য ধন্য" বলিয়া কবির অভ্যর্থনা করিলেন।

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥"

বলিয়া সহস্রমুখে কৃত্তিবাসের প্রশস্তি সঙ্গীত উচ্চারিত হইল। কৃত্তিবাস স্বয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন, আত্মবংশের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে কত বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমি আর বিশেষ কি বলিব! এখনও "ফুলিয়ার মুখটি" বলিয়া আমরা তাঁহারই বংশের স্পর্দ্ধা করি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রধান এবং মুখ্য বংশ "ফুলিয়ার মুখটি" কৃত্তিবাসেরই অনুস্মৃতি মাত্র।

* * * * *

তুমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায় তখন যদি তোমার হৃদয়ে কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পার। অন্যথা, তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে? তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত নিজকে মিশাইতে না পার, তবে কদাচ তদ্দেশীয় ও তৎ-কালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসীগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপকরাগের সময়ে তুমি বেহাগ-পুরবীতে আলাপ করিলে তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এ দেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসীগণের হৃদয়ের ভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার করিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার বসন্তের পিক-ঝঙ্কারের ন্যায় বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ, একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান্, কতটুকু চান্, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরঞ্জিত হইবে, তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে,—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কাব্য বিদ্যাবিশারদই হও না কেন,

তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে, তোমার সামাজিক বর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে, তদীয় দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়,—থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্য্য রামায়ণ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ তন্মধ্যে যে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিককাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর-ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণ ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুন্ গুন্ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনি সেই গুন্ গুন্ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা, কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক একপদে তাঁহার কর্ম্মফল দীর্ঘদিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মানিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন; আর আজও যেন সেই

গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বর-লহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইয়া ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে, সেইরূপ কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুল কুল গীতির সুরে সুর মিলাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন, আজ সে ফুলিয়া নাই, সেই ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যেন শেষ লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা, কিছুই নাই, তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও; তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই; কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি, বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রামসীতার পাদস্পর্শে অযোধ্যা চিরকালের মত তীর্থ হইয়া রহিয়াছে, কৃত্তিবাসের পাদস্পর্শে ফুলিয়া বঙ্গের সাহিত্য সাম্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়াছে। ফুলিয়ার মুখটী, শুধু ফুলিয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরবস্থান, পরম স্পর্দ্ধার ভাজন হইয়াছেন। জন্মজন্মান্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে তপস্যার ফলে তিনি ত অমর হইয়াছেনই, তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমরী করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের স্বর্ণ মন্দিরের তিনিই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যে দেশে এবং যে জাতিতে কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি আবির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য, সে জাতি বরেণ্য। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া দিয়াছেন; তিনি যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, আজ এই পাঁচশত বৎসর ধরিয়া যিনি যতটুকু পারেন, সেই সঙ্গীতের "তানপ্রদান" করিতেছেন। তাঁহার স্বজাতির জাতীয় সাহিত্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে, ততই তাহারা তাহার আদর করিতে শিখিতেছে।"

"এস কৃত্তিবাস, তোমার বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার ফিরিয়া এস, এই দেখ, তোমার উদ্দেশে, কতশত ভক্ত আজ সজল-নেত্রে ফুলিয়ায় উপস্থিত, তুমি তাহাদিগের সারস্বত-ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছ, সেই রত্নের গৌরবে তাহারা আজ গৌরবিত, কৃত্তিবাসের স্বজাতি বলিয়া আদৃত। এস কবি, আবার আসিয়া—

পবন নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীম বলে
সাগর ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী ;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সবঙ্গমণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।"

শাহ্‌জাহানের রাজ্যনাশ।

(শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।)

বাদশাহ ও কুমারগণ।

৭ই মার্চ্চ, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্‌ শাহ্‌জাহানের রাজ্যাভিষেকের ৩১ বৎসর আরম্ভ হইল। মহাসমারোহে শুভদিন কাটিয়া গেল। এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে প্রজাগণ শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছিল। কেবল শেষের দিকে একটা বিপদের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল,—কুমারগণের বড়ই অমিল ও ঈর্ষা; বাদশাহ তাঁহাদিগকে খুব দূরে দূরে রাখিয়া কোন রকমে শান্তি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ কুমার দারা শিকো পিতার বড়ই প্রিয় ছিলেন। তিনি বাদশাহের সঙ্গে থাকিতেন; তাঁহার উচ্চ উপাধি (শাহ্‌-ই-বুলন্দ্‌-ইক্‌বাল), ৬০ হাজার অশ্বারোহীর সেনাপতি এই সর্ব্বোচ্চ পদ এবং প্রতিপত্তি দেখিয়া প্রজা ও সৈন্যগণ তাঁহাকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিত। বাদশাহও যেন তাহাই ইচ্ছা করিতেন। একখান মণিখচিত স্বর্ণ-আসন বাদশাহের সিংহাসনের সম্মুখে রাখা ছিল; যখন দারা দরবারে আসিতেন, উহার উপরে বসিতেন। রাজ্যের কোন কাজই দারাকে না জানাইয়া করা হইত না। কুমার আদর্শপতি ও পিতা ছিলেন; তাঁহার জ্ঞানও গভীর, কিন্তু সুদীর্ঘকাল রাজসভায় থাকায় যুদ্ধবিদ্যা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; ফকির ও যোগীদের সঙ্গ এবং সুফী ও উপনিষদের গভীর দর্শনের আন্তরিক চর্চ্চা তাঁহার বিষয়বুদ্ধি লোপ করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় কুমার সা-সুজা, বাঙ্গালার সুবাদার, বড়ই বিলাসী এবং

অকর্ম্মণ্য ছিলেন। ১৭ বৎসর বাঙ্গালার জল-বায়ু তাঁহার শরীর ও মন নিস্তেজ করিয়া দিয়াছিল; রাজকার্য্যে ও সৈন্য-বিভাগে চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা ও শ্লথতা রাজত্ব করিত।

তৃতীয় কুমার আওরাংজীব, অক্লান্ত পরিশ্রমী, দ্রুত-অশ্বারোহী, অসীম কৌশলী, স্থির, গম্ভীর, সংযমী, বিলাসত্যাগী, দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। তাঁহার সংযত সাহস ও অনিদ্র-সতর্কতা কেবল তাঁহার প্রগাঢ় রাজনৈতিক চতুরতা ও কপটতার সঙ্গেই তুলনা করা যাইতে পারে। সত্য বটে, তাঁহার মনে ঔদার্য্য বা বিস্তৃতি ছিল না; কিন্তু মন সঙ্কীর্ণ হওয়ায় এই সুবিধা হয় যে, উদ্দেশ্যটী সতত সর্ব্বশক্তি দ্বারা অনুসরণ করা যায়। ইহা তাঁহার বিজয়ের একটী কারণ। দয়া-দাক্ষিণ্য, কৃতজ্ঞতা, বাৎসল্য প্রভৃতি "হৃদয়ের দুর্ব্বলতা" তাঁহার চাণক্যনীতির সফলতার বিঘ্ন করিত না। সুদূর দাক্ষিণাত্যে তাঁহার সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ও দক্ষ অবস্থায় রাখা হইত। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আওরাংজীব সেখানেই অনেক-গুলি কর্ম্মপটু এবং বিশ্বাসী ভৃত্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; যথা—খলিলল্লা খাঁ জমান্, মীর আস্করী (আকিল খাঁ রাজী), মুর্শিদকুলী খাঁ এবং রণ ও মন্ত্রণায় অদ্বিতীয় কুশলী মীরজুম্‌লা।

কনিষ্ঠ কুমার মুরাদ বখ্‌স, অন্ধ-সাহসে যুদ্ধ করা ও বিলাসে গা ঢালিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। বুদ্ধি-বিদ্যার কোনই ধার ধারিতেন না। এ সময় গুজরাট প্রদেশ তাঁহার শাসনে ছিল।

বাদশাহের স্বাস্থ্যভঙ্গ।

হঠাৎ দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন হইল, ৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে শাহ্জাহান কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্র ও তাহার উপসর্গে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। রাজ-বৈদ্যগণ কোনই উপকার করিতে পারিলেন না। বাদশাহের এতটুকু

শক্তি রহিল না যে, দরবারে আসেন অথবা "দর্শনের জানালায়"(ঝারোখা-ই-দর্সন্) বসিয়া ভক্ত প্রজাবর্গকে একবার মুখ দেখান। দারা অক্লান্ত যত্নে দিবানিশি পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। রোগ-গৃহের বাহিরের ঘরটী তাঁহার বাসস্থান হইল। ভ্রাতাগণ সংবাদ না পান, এইজন্য সভাসদ্গণের বাদশাহ-দর্শন বন্ধ করিয়া দিলেন। আওরাংজীবের প্রতিনিধি (উকীলকে) কয়েদ করিলেন এবং রাজধানীর বাহিরের পথ ও খেয়াঘাটে পাহারা বসাইয়া রাখিলেন, যেন কোন দূত না যাইতে পারে; কিন্তু ইহার ফল ঠিক বিপরীত হইল। সংবাদ না পাইয়া কুমারগণ ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। রাজ্যময় অদ্ভুত গুজব প্রচার হইতে লাগিল; চারিদিকে দুষ্ট লোক গোলমাল বাধাইয়া স্বার্থলাভের সুযোগ পাইল। কিছুদিন পরে বাদশাহ একটু সুস্থ হইয়া জানালায় দেখা দিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? লোকে বলিতে লাগিল যে, আসল বাদশাহ মরিয়া গিয়াছেন, ওটা একটা দাস, বাদশাহের পোষাক পরিয়া তাঁহার আকৃতির অনুকরণ করিয়া জানালায় বসিয়া দূর হইতে লোকের সালাম লইতেছে ও প্রতিদান করিতেছে!

সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ আর থামাইয়া রাখা অসম্ভব হইল। ছোট তিন কুমার সসৈন্যে আগ্রার দিকে ধাবমান হইলেন। বাদশাহ নিজ হস্তে লিখিত ও নিজ মোহরযুক্ত চিঠি পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা এইরূপ উত্তর পাঠাইলেন, "আমরা সিংহাসনাকাঙ্ক্ষী বিদ্রোহী নহি, ভক্ত প্রজা ও বিনীত পুত্র। ভীষণ জনরব শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। একবার শুধু বাদশাহের নিকট গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক ও মন নিশ্চিন্ত করিব, তার পর বাদশাহের যাহাই আজ্ঞা হয়, তাহাই পালন করিব।" দারা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলেন। আত্মরক্ষার জন্য দুই দল সৈন্য সুজা ও

আওরাংজীবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন এবং পিতাকে ধীরে ধীরে দিল্লী হইতে আগ্রায় আনিলেন।

দারার পরাজয়।

পথে আওরাংজীব ও মুরাদ একত্র হইলেন এবং উজ্জয়িনীর যুদ্ধে দারার প্রেরিত সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। দারা সর্ব্বস্ব এক যুদ্ধের ফলে সঁপিয়া আগ্রা হইতে সৈন্য লইয়া স্বয়ং যুদ্ধে আসিলেন। ২৯শে মে ১৬৫৮ খৃঃ, অসহ্য রৌদ্র ও গরম বাতাসের মধ্যে, আগ্রার ১৩ মাইল দক্ষিণে সামুগড় গ্রামে, দুই সৈন্যের সংঘর্ষ হইল। বিপক্ষের সুচালিত তোপের সম্মুখে দারার সৈন্যগণ শস্যের মত কাটা পড়িতে লাগিল। তাঁহার প্রবল আক্রমণগুলি ব্যর্থ হইল; তাঁহার নায়কগণ (রুস্তম্ খাঁ, রাও ছত্রশাল প্রভৃতি) যুদ্ধ করিতে করিতে মারা গেলেন। অবশেষে দারা, দ্বিতীয় পুত্র সিপিহর শিকো এবং জনকতক অনুচর সঙ্গে দ্রুত অশ্বে চড়িয়া পলায়ন করিয়া, সন্ধ্যার পর আগ্রায় নিজ বাটীতে পঁহুছিয়া একেবারে শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদের রোল পড়িয়া গেল এবং এই দুঃসংবাদ চারিদিকে প্রচার হইল। শাহ্‌জাহান জানিতে পারিয়া সেই রাত্রে দারাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "দৈবক্রমে তোমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে; তুমি কি করিবে? এখন একবার দুর্গে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করা এবং কয়েকটী আবশ্যকীয় কথা শুনা তোমার পক্ষে ভাল। তারপর যেখানে ইচ্ছা যাইও এবং যাহা তোমার কপালে থাকে ঘটিবে।" কিন্তু দারা মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; মান, সম্পত্তি, ক্ষমতা সব হারাইয়া তাঁহার আর মুখ দেখাইবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি পিতাকে উত্তর পাঠাইলেন,—"আর কোন্ মুখে, কি দশায় আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি? এ

সহরে দেরি করিলে শত্রুগণ আমার চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিবে। এ অপমানিত হতভাগ্য পুত্রকে দেখার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিন। শুধু আমার সম্মুখে যে সুদীর্ঘ বিপদপূর্ণ ভ্রমণ রহিয়াছে, তাহার আরম্ভে আপনার আশীর্ব্বাদ চাই।" এ সংবাদে বাদশাহ ও অন্তঃপুরের মহিলাগণ শোকে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। প্রভাতে ৩টার সময় দারা স্বীয় পত্নী নাদিরাবানু বেগম (যুবরাজ পর্ভেজের কন্যা) এবং অপর কয়েকটী স্ত্রীলোক এবং কয়েকটা হস্তী বোঝাই ধনরত্ন লইয়া আগ্রা হইতে দিল্লীর দিকে পলাইলেন।

আগ্রার দুর্গ অবরোধ।

যুদ্ধ জিতিয়া সে রাত্রে আওরাংজীব রণক্ষেত্রের পশ্চাতে দারার পরিত্যক্ত শিবিরে কাটাইলেন। তিন দিন পরে (১লা জুন) আগ্রা সহরতলীতে নূরমঞ্জিল বা ধারা নামক বাগানে আসিয়া তাঁবু ফেলিলেন। পুরবাসীগণ মহা ভয় ও চিন্তায় রহিল। মুরাদের সৈন্যগণ বড়ই উচ্ছৃঙ্খল; সহরে ঢুকিয়া লুট ও অত্যাচার আরম্ভ করিল। তৃতীয় দিবস আওরাংজীব তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতানকে, খাঁ খানান্ ও একদল সৈন্যসহ সহরের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে ও প্রজাবর্গকে আশ্বস্ত করিতে পাঠাইলেন। প্রতিদিন দলে দলে বাদসাহী কর্ম্মচারী ও ওমরাহগণ নূরমঞ্জিলের বাগানে আসিয়া "উদীয়মান সূর্য্য"কে উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং আওরাংজীবের অধীনে কর্ম্ম লইলেন।

শাহ্জাহান দুইজন প্রবীণ কর্ম্মচারীকে চিঠি দিয়া আওরাংজীবের নিকট পাঠাইলেন; কিন্তু কোনই সন্তোষজনক উত্তর আসিল না। অবশেষে হতাশার বলে বলীয়ান্ হইয়া বৃদ্ধ নরপতি দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া অবরোধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আওরাংজীব, জুলফিকার খাঁ ও বাহাদুর খাঁকে দুর্গ জয় করিতে

পাঠাইলেন। তাহারা রাত্রে পৌঁছিয়া আক্রমণ করিল, কিন্তু সেই অজেয় দুর্গের উপর দন্তস্ফুট করিতে পারিল না। সেকালে অবরোধে বড় দেরি হইত, তার উপর আওরাংজীব দাক্ষিণাত্য হইতে কোনই অবরোধের সরঞ্জাম আনেন নাই। সেনাপতিদ্বয় যমুনার তীরে দারার বাড়ীতে রহিল, সৈন্যগণ অনেকেই দুর্গ-দেওয়ালের ও বাহিরের গাছের নীচে বেশ আশ্রয়ে রহিল; দুর্গে তীর ও গোলা তাহাদের মাথার উপর দিয়া উঁচায় চলিয়া গেল। আওরাংজীবের একটী তোপ জাহানারার মস্জিদের উপর দাঁড় করান হইল; ইহার প্রথম গোলাতে দুর্গদ্বারের উপরের তোপটীর মুখ খণ্ড খণ্ড হইল। আর একটী তোপ দারার বাড়ীর ছাদ হইতে গোলা চালাইয়া দুর্গ-প্রাসাদের দোতালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দুর্গরক্ষীদের কামান ভাল চালান হয় নাই। ঐতিহাসিক ঈশ্বরদাস নাগর বলেন যে, ইহার দারোগা ইতিকাদ খাঁ ঘুষ খাইয়া ফাঁকা বারুদের আওয়াজ করিয়াছিল এবং রাত্রে দ্বার খুলিয়া আওরাংজীবের লোকদিগকে মধ্যে আসিতে দিয়াছিল। কিন্তু দুর্গের ১৫০০ পদাতিক কালমক্, হাবশী ও তুর্ক—বিশ্বাসী ও বীর যোদ্ধা ছিল; তাহাদের বন্দুকের চোটে কেহ দুর্গের বাহিরে মাথা দেখাইতে পারিল না। দুর্গমধ্যের অনেক ওমরাহ ও মন্সবদার অবরোধ ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথম দিন সন্ধ্যার সময়, যে ভিস্তিরা যমুনা হইতে একটী ছোট দ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে জল আনিত, তাহাদের তদারক করিবার ভাণ করিয়া, বাহিরে গিয়া পলায়ন করিল।

তবুও দুর্গ জয়ের কোনই আশা দেখা দিল না। তখন আওরাংজীব মন্ত্রণা করিয়া এই ফন্দি বাহির করিলেন যে, যমুনার জল লওয়া বন্ধ করিয়া দুর্গবাসীদিগকে পিপাসায় মারিয়া দুর্গ জয় করিবেন। পরদিন তাহার সৈন্যগণ হাজরি দরজা অবধি আগাইয়া জল লইবার পথ করিল

এবং নদীর ধারে দিনরাত পাহারা দিতে লাগিল। দুর্গের মধ্যে যে কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা সহজে কল্পনা করা যাইতে পারে। বাদশাহ ও ওমরাহগণ চিরদিন "গলিত তুষার" যমুনার বিশুদ্ধ জল পান করিয়া আসিয়াছেন, এখন কি আর দুর্গের পুরাতন অব্যবহৃত কূপ কয়টীর কষায় জল খাইতে পারেন ?

পিতাপুত্রে।

তখন শাহ জাহান এই মর্ম্মস্পর্শী চিঠিখানি আওরাংজীবকে পাঠাইলেন :—

"বাবা আমার! বীর আমার! এইমাত্র কাল আমি ৯ লক্ষ অশ্বারোহীর অধীশ্বর ছিলাম। আর আজ আমার একটী জল দেবার চাকরের অভাব!

হিন্দুদের, যাহা হউক, ধন্য বলি,
তাহারা মৃত (আত্মীয়)কে জল দান করে।
কিন্তু, হে পুত্র! তুমি এমন অদ্ভুৎ মুসলমান
যে, আমি জীবিত থাকিতে জল হইতে বঞ্চিত করিয়াছ!"

আওরাংজীব চিঠির পৃষ্ঠে উত্তর লিখিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আর বেশী লেখা বে-আদবী।"

বাদশাহ নিরুপায় হইয়া এই গম্ভীর চিঠি তাঁহার বিজয়ী নির্ম্মম পুত্রকে পাঠাইলেন, "পিতৃ-ভক্তি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ! আমাকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা কর এবং আমাকে যে সব কষ্ট দিতেছ, তাহাতে তোমার ইহ-জগতে লজ্জা ও পরকালে সর্ব্বনাশ হইবে! শেষ-বিচারের দিন কি বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে? যুদ্ধ জয় করিয়াছ বলিয়া উন্মত্ত হইও না। আশা করিও না ভাগ্য চিরকাল তোমার পক্ষে থাকিবে।

কারণ, ভাগ্য বড় পরিবর্ত্তনশীল। যাহাতে নিজের ক্ষতি হইবে, এরূপ কাজ করিও না। জগৎজন আমার রাজত্বের গৌরব ও সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ ছিল, ইহার শেষ অংশ তুমি বিষময় করিও না। সাধু পুত্রের মত কার্য্য কর, যেন তোমার নাম ও যশ চিরস্থায়ী হয়।"

আওরাংজীব উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমি বাধ্য পুত্র। অধুনা যাহা করিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, ভয় ও নিরাশায় আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরিতে বাধ্য হইয়াছি। নচেৎ আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া চরণে উপস্থিত হইতাম।

এখন দুর্গটা আমার লোকের হাতে ছাড়িয়া দিন; তার পর আমি বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিব।"

শাহ জাহান সম্মত হইলেন। অবরোধের তৃতীয় দিন তাঁহার লোকগুলি দুর্গ ছাড়িয়া দিল, এবং আওরাংজীবের পুত্র মহম্মদ সুলতান সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া দখল লইলেন (৮ই জুন)। এইরূপে আগ্রা দুর্গ ও তাহার অসীম ধনরাশি, যাহা বাদশাহেরা তিন পুরুষ ধরিয়া জমা করিয়াছিলেন,—অতি সহজে হস্তান্তর হইল।

শাহজাহান বন্দী।

বিজিত "শাহান্ শাহ্" এই ভ্রাতৃদ্রোহী যুদ্ধ থামাইবার এক শেষ চেষ্টা করিলেন; তিনি এখনও আশা ধরিয়া রহিলেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্য চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া শান্তিস্থাপন করিবেন। বয়োবৃদ্ধ মান্যবর উজীর জাফর খাঁ, জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী জাহানারা, দু'জনে ক্রমান্বয়ে আওরাংজীবের নিকট গিয়া বাদশাহের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা আওরাংজীবকে জানিতেন না। তাঁহারা জানিতেন না যে—

"রাজধর্ম্মে ভ্রাতৃ-ধর্ম্ম, বন্ধু-ধর্ম্ম নাই, শুধু জয়-ধর্ম্ম আছে।"

আওরাংজীব উত্তর করিলেন যে, তিনি পিতার অত্যন্ত বাধ্য বটে; কিন্তু তাঁহার মত ধার্ম্মিক মুসলমানের পক্ষে "কাফির" দারাকে দূর করিয়া দেওয়া "লোক-হিতের জন্য" অবশ্য কর্ত্তব্য।

১১ই জুন আওরাংজীব নূর মঞ্জিল বাগান হইতে মহাসমারোহে রওনা হইলেন, ইচ্ছা বাদশাহের সঙ্গে দেখা করা। এমন সময় শায়েস্তা খাঁ ও সেখ মির আসিয়া অনেক রকম যুক্তি দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। একখান বাদশাহী চিঠিও ধরা পড়িল, যাহা হইতে বুঝা গেল যে, বৃদ্ধের হৃদয় এখনও জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য কাঁদিতেছিল। সুতরাং সাক্ষাৎ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আওরাংজীব গিয়া আগ্রা সহরে দারার প্রাসাদ অধিকার করিলেন।

জীবনে আর পিতা পুত্রের দেখা ঘটিল না। ১২ই জুন হুকুম হইল যে, শাহ জাহানের কয়েদ আরও কঠিন করিতে হইবে; তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা লোপ করা হইল এবং আগ্রা দুর্গের অন্দরের বাহিরে আইসা বন্ধ হইল। এই প্রাসাদ-কারাগারে বৃদ্ধজীবনের শেষ আটবৎসর কাটাইলেন। একমাত্র সান্ত্বনার আধার সেই অবিশ্রান্ত সেবিকা দেবকন্যা জাহানারা "মোগলরাজ্যের এন্টিগনি"। কিন্তু বিজয়ী পুত্রের ব্যবহার ভুলিতে পারিলেন না। এই শেষ কয়বৎসরে তিনবার জাহানারা অত্যাচারী ভ্রাতার জন্য পিতার ক্ষমা ভিক্ষা করেন; দুইবার বাদশাহ অস্বীকার করিলেন। কিন্তু দয়া জগতে অজেয়; তৃতীয়বার তাঁহার চেষ্টা সফল হইল, শাহ জাহান আওরাংজীবকে ক্ষমা করিলেন।



স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত।

আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা।

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত।)

অনুমান চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্ব-খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে আদিম আর্য্যজাতির বসতি ছিল। হিন্দু, পারসিক, গ্রীক্, রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজ, জর্ম্মাণ, ওলন্দাজ, দিনেমার, স্পেনীয়, রুশীয় প্রভৃতি অনেক জাতি প্রাচীন আর্য্যজাতি হইতে উৎপন্ন।

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত আচার-ব্যবহার অনেক দূর নিরূপণ করিয়াছেন। মৃগয়া, পশুপালন ও ভূমিকর্ষণ এই তিন ব্যবসায় দ্বারা আর্য্যগণ জীবন যাপন করিত। মৃগয়াজীবী ও পালিত পশুজীবিগণ গৃহপ্রিয় ছিল না, এবং সর্ব্বদা এক স্থানে বাস করিত না; ফলতঃ, আধুনিক তাতার ও আরব জাতীয়গণ যেরূপ বহু পরিবার ও গৃহপালিত জীব-জন্তু-সমন্বিত হইয়া শিবির হইতে শিবিরান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ ভ্রমণপটু ছিল। কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত গৃহপ্রিয় ছিল, এবং স্বভাবতঃই নিজ নিজ ভূমিতে আসক্ত থাকিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকগণ এরূপে এক স্থানে বাস করিত না; পশুপালকগণ পশুর আবশ্যকীয় তৃণক্ষেত্র পাইবার জন্য এবং মৃগয়াব্যবসায়িগণ নূতন নূতন বন্য-পশুর অন্বেষণে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত। আর্য্যগণ স্বদেশে এরূপ ভ্রমণপটু না হইলে গঙ্গা হইতে টেম্‌স্ নদী পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিত না।

এইরূপ স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃই হউক, গৃহবিচ্ছেদ কারণেই হউক, খাদ্যের অভাবের জন্যই হউক বা পূর্ব্বদিকে তুরেণীয় জাতিদিগের

আক্রমণ কারণেই হউক, আর্য্যগণ সময়ে সময়ে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বহুদুর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া, নূতন বাসস্থান অন্বেষণ করিত এবং বর্ব্বর জাতিদিগকে জয় করিয়া নূতন নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিত। এইরূপে, গৃহনিষ্ক্রান্ত একদল আর্য্য-সন্তান আধুনিক ভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করে; হিন্দুগণ এই আর্য্যের সন্ততি।

পরাজিত আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে অতি অসভ্য জাতি বাস করিত। ফলতঃ, এক্ষণে যে ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ পর্ব্বতে ও জঙ্গলে বাস করে, তাহারাই ভারতবর্ষের আদিমবাসী; তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এককালে সমস্ত ভারতবর্ষে অধিবাস করিত। আর্য্যদিগের সহিত বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত ও দেশচ্যুত হইয়া, তাহারা উর্ব্বর প্রদেশ সমস্ত ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে। নবাগত আর্য্যগণের সিন্ধু পার হইবার অচিরকাল পরেই, এই আদিম অসভ্য জাতিদিগের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। আর্য্যগণ শ্বেতকায় ছিল, আদিমবাসিগণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সর্ব্বদাই ঘৃণা করিত; এবং এই কৃষ্ণকায় শত্রুর ধ্বংসের জন্য দেবতার নিকট সর্ব্বদাই আরাধনা করিত। বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধের পর আদিমবাসিগণ ক্রমে পরাজিত হইল, সিন্ধু হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ আর্য্যাদিগের হস্তগত হইল। বিজিত অসভ্য জাতিগণ অনেকেই আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, অবশিষ্ট অংশ অরণ্য বা পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল।

আদিম আর্য্যদিগের ধর্ম্ম আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, আর্য্যগণ সুসভ্যও ছিল না,—একেবারে বর্ব্বরও ছিল না। বর্ব্বর জাতিগণ বহু সংখ্যক মন্দপ্রকৃতি ভূত ও পিশাচে বিশ্বাস করে, সুসভ্য জাতিগণ সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। প্রাচীন আর্য্যজাতি এই

দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী। আর্য্যগণ বহু ঈশ্বরবাদী ছিল; প্রকৃতির মধ্যে যাহা সুন্দর বা মহৎ বলিয়া বোধ হইত, তাহারই পূজা করিত। অনন্ত নীল নভোমণ্ডলকে দ্যৌঃ বলিয়া পূজা করিত, কথনও বরুণ বলিয়া সম্বোধন করিত। সূর্য্য ও অগ্নি আর্য্যদিগের আরাধ্য-দেবতা ছিলেন। এই জাতির মধ্যে কোনরূপ মন্দির বা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণপ্রথা প্রচলিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না; বরং স্পষ্টতঃই প্রতীতি হয় যে, পুরোহিত বা পৃথক্ উপাসক-সম্প্রদায় ছিল না; আকাশ বা সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক পরিবারের শ্রেষ্ঠ ও বৃদ্ধ পুরুষ পূজামন্ত্র পাঠ করিত, এবং ফল-মূল বা দুগ্ধ দান করিয়া নিজ নিজ বাঞ্ছা প্রকাশ করিত।

ভারতবর্ষে আগমনের পর, এই ধর্ম্ম ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্যকেই সমধিক পূজা করিত। ইন্দ্র আকাশের দেবতা; তিনি সোমরস পান করেন এবং মনুষ্যের উপকারের জন্য সর্ব্বদাই বৃত্র ও পণি প্রভৃতি অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। অগ্নি অন্যান্য দেবগণকে আহ্বান করিয়া যাগযজ্ঞ সম্পাদন করেন। সূর্য্য মনুষ্যের হিতার্থ আলোক বিতরণ করেন। ফলতঃ, হিন্দুধর্ম্ম এক্ষণে যে আকার ধারণ করিয়াছে, সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণের নিকট সে আকারে পরিচিত ছিল না। স্থান, কাল ও সভ্যতা অনুসারে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়। কালের ও সভ্যতার গত্যনুসারে সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যদিগের সরল প্রকৃতিপূজা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত ও সুন্দর সুন্দর উপন্যাসে বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়াছে।

আদিম হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিবিচ্ছেদ ছিল না, ধর্ম্মঘটিত অসমতাও ছিল না। আরাধনা-পদ্ধতি সরল ছিল; উপাসক ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দান করিতেন, নিজের বা পরিবারের কুশল বা স্বাস্থ্যের জন্য

প্রার্থনা করিতেন, গোবৎস বৃদ্ধির জন্য আরাধনা করিতেন, অথবা কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে জয় লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজগৃহে পূজা নির্ব্বাহার্থ এক এক জন পুরোহিত নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। পূজার গৃহই মন্দির, ইহা ভিন্ন অন্য মন্দির ছিল না। প্রথম হিন্দুদিগের এইরূপ সরল ধর্ম্ম, এইরূপ সরল পূজা ও সরল বিশ্বাস ছিল।

কালক্রমে অনেক ধর্ম্মবিষয়ক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সমাজের প্রথমাবস্থায় সকলেই যেরূপ কৃষিকার্য্য, মেষপালন-কার্য্য ও যুদ্ধকার্য্য সম্পাদন করে, পরে সেরূপ থাকে না; প্রতি ব্যবসায় অবলম্বন-কারী লোক এক একটী ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়। হিন্দুদিগের সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত এই ঘটনা ঘটিল। জগতের অন্যান্য স্থানে যেরূপ, ভারতবর্ষেও সেইরূপ পূজকগণ একটী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইল, ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করিল, ক্রমে পূজাসম্পাদন-কার্য্য একচেটিয়া করিয়া লইল; সুতরাং আর কেহ ব্রাহ্মণকে না ডাকিয়া নিজের পূজা নিজে সম্পাদন করিতে পারিত না। পরাক্রান্ত গর্ব্বিত যোদ্ধা ও রাজগণও সামান্য লোক হইতে পৃথক্ হইয়া একটী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইল এবং ক্ষত্রিয় নাম ধারণ করিল। সামান্য কৃষি বা বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ যোদ্ধা বা পূজকদিগের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইত না; তাহারা একটী অধীন শ্রেণীভুক্ত হইয়া বৈশ্য নাম ধারণ করিল। পরাজিত কৃষ্ণকায় অসভ্যগণের মধ্যে যাহারা হিন্দুদিগের দাসত্ব স্বীকার করিল, তাহারা শূদ্র নাম ধারণ করিয়া আর্য্য-সন্তানদিগের দাস হইয়া রহিল।

এই জাতিবিচ্ছেদ সহসা বা একদিনে সম্পাদিত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া এই বৃহৎ ঘটনাটী সম্পাদিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম রচিত ঋগ্বেদের সংহিতায় চারি জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না, ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়ের উল্লেখমাত্র স্থানে স্থানে দেখা যায় ; কিন্তু অন্যান্য শেষরচিত বেদে উপরি-উক্ত চারি জাতির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু, জাতিবিচ্ছেদ সম্পাদিত হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্তও ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র-বিষয়ক প্রাধান্য সর্ব্বদা স্বীকার করিত না, ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয়দিগের শাস্ত্র-বিষয়ক প্রাধান্য স্বীকার করিত না, উপনিষদের অনেক স্থানে ক্ষত্রিয়গণ দর্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে, ব্রাহ্মণগণও বিনীতভাবে তাহাই শিখিতেছে, এরূপ লিখিত আছে। পক্ষান্তরে পরশুরামের উপাখ্যান হইতে উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধে অনেকবার পরাস্ত করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই সমস্ত বিরোধ লোপ পাইল, এবং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ নির্ণীত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অন্য ব্যবসায়ে উৎকর্ষ বা প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিল। এই জাতিবিচ্ছেদস্বরূপ ভিত্তির উপর হিন্দুদিগের নব্য সমাজ সংস্থাপিত হইল।

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। প্রত্যেক বেদে সংহিতা অর্থাৎ আরাধনার সরল মন্ত্র, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আড়ম্বর পরিপূর্ণ পূজার রীতি-পদ্ধতি, এবং উপনিষদ্ অর্থাৎ চিন্তাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনা, এই তিন অংশ আছে। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ঋগ্বেদের সংহিতা পরিবর্দ্ধিত বা রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য বেদের সংহিতা প্রণীত হয় এবং ক্রমে চারি বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ রচিত হয়।

যে সময়ে আর্য্যগণ প্রথমে সিন্ধুতীরে আসিয়া বাস করিল, যখন তাহাদিগের মধ্যে জাতিবিচ্ছেদ ছিল না, ধর্ম্মঘটিত অসমতা ছিল না, যখন পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দিয়া নিজের বা পরিবারের কুশলের জন্য বা গোবৎসাদির বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্র বা অগ্নি বা

সূর্য্যকে সরলচিত্তে আরাধনা করিত, তখন ঋগ্বেদের সরল ও কবিত্বপূর্ণ সংহিতা রচিত হয়। এই সময় আর্য্যদিগের জাতীয়-জীবনে বিশেষ বল লক্ষিত হয়। বেদের সংহিতা সেই বলের ছায়া মাত্র। সেই বলে বহু উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া, মেষপালক-সমাজ ক্রমে জাতিবিচ্ছেদ-মূলক সভ্য হিন্দুসমাজ রূপ ধারণ করে।

পরে যখন জাতিবিচ্ছেদ হইল, যখন পূজক বা ব্রাহ্মণজাতি প্রাধান্য লাভ করিল, যখন আড়ম্বরপূর্ণ পূজার বৃদ্ধি হইল ও ধর্ম্মান্ধতা বৃদ্ধি পাইল, তখন বেদের ব্রাহ্মণ-অংশ রচিত হইল। ব্রাহ্মণ-অংশে কবিত্ব নাই, সরলতা নাই, চিন্তা নাই, মানসিক ক্ষমতার পরিচয় নাই, কেবল আড়ম্বর। পূজক-প্রাধান্য বৃদ্ধির সহিত জাতীয়-জীবন ক্ষীণবল হইল ও চিন্তাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইল। আর্য্যজাতির নূতন ও স্বাস্থ্যকর উন্নতি পূজক-প্রাধান্য ও ধর্ম্মান্ধতা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পূজক-প্রাধান্য অধিক দিন রহিল না। বেদবর্ণিত কালের শেষাংশে ক্ষত্রিয়গণ প্রাধান্য লাভ করিল, তাহার প্রমাণ আছে। বেদের ব্রাহ্মণ-অংশে যেরূপ পূজক-প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তৎপর-রচিত উপনিষদ্-অংশে সেইরূপ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উপনিষদের অনেক অংশে ক্ষত্রিয়গণ দর্প করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছে, বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া গভীর বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় জাতীয়-চিন্তার পরিচয় দিতেছে, এরূপ দেখা যায়। কিন্তু কেবল শিক্ষা ও চিন্তায় ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়াছিল এরূপ নহে, যে জনক রাজা উপনিষদের একজন প্রধান শিক্ষা-গুরু, তাঁহার জামাতা রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বিনষ্ট করেন, পরে দাক্ষিণাত্য ভেদ করিয়া সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-বল ও প্রাধান্য বিস্তার করেন। রামচন্দ্রের আখ্যান সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ঐ আখ্যান

দ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, জনক রাজা ও উপনিষদ্ রচনার সময়ে অর্থাৎ বেদবর্ণিত কালের শেষাংশে ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রবলে ব্রাহ্মণ-বলকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করে।

এই সময়ে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের আরও প্রমাণ আছে। কুরুক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বলের পরিচয় দিতেছে। সকলেই জানেন যে, বেদ-ব্যাসের জীবিতকালেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়; বেদব্যাসের গল্প প্রকৃতই হউক বা নাই হউক, দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস নামে কোন লোক থাকুন বা নাই থাকুন, এই জনশ্রুতি হইতে প্রমাণ হইতেছে, যে কালে বেদ রচিত ও সঙ্কলিত হয়, সেই কালের শেষভাগে ক্ষত্রিয়-বলের অপরিসীম বিকাশ হইয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, বেদবর্ণিত কালের শেষ অংশে ক্ষত্রিয়-বল ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়-বলের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, অস্ত্রবল বিকাশ পাইয়াছিল, আর্য্যদিগের জাতীয়-জীবন উদ্দীপ্ত হইয়াছিল এবং অনার্য্য দাক্ষিণাত্য ভেদ করিয়া আর্য্যগৌরব প্রসারিত হইয়াছিল, এইরূপে হিন্দু-জাতীয়-জীবন দ্বিতীয়বার উৎকর্ষ লাভ করে; উপনিষদ্, রামায়ণ ও মহাভারত তাহার ছায়ামাত্র।

বহুকাল পরে একজন ক্ষত্রিয় পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন ও মনুষ্যের সমতা প্রচার করিলেন। বুদ্ধের সেই শিক্ষাবলে ভারতবর্ষ পুনরায় উন্নতি-সোপানে উঠিতে লাগিল। এই বৌদ্ধকালে অশোক আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় একচ্ছত্র করিলেন, এই কালে ষড়্দর্শন ও চিন্তাশক্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিল, এইকালে হিন্দু নাবিকগণ বঙ্গসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জাবা দ্বীপের আবিষ্কার করিল এবং এই কালে শিল্পবিদ্যা উৎকর্ষ লাভ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-অট্টালিকা ও শিল্পকার্য্যে আচ্ছাদিত করিল। হিন্দুজাতির চিত্ত এই তৃতীয়বার আলোড়িত হইল।

পরে যখন খ্রীষ্টের পর, পঞ্চম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভস্মরাশির উপর পৌরাণিক-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন চিন্তাক্ষমতা পুনরায় উৎকর্ষ লাভ করিল, সমগ্র ভারতবর্ষে চিন্তাস্রোতঃ বহিতে লাগিল। এইটী ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত বিপ্লব; এই বিপ্লবে ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ধীশক্তি, কল্পনা ও মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, আর্য্যভট্ট, বরাহ, মিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়েই ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শাস্ত্র পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং চীনভ্রমণকারী ভারতবর্ষের অর্থ ও সভ্যতা দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানসাগর মন্থন করিয়া অসংখ্য পুস্তক লিখিয়াছেন, বেদান্ত-দর্শনের নূতন রূপ দান করিয়াছেন, এবং দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। ইহার পরই ভাস্করাচার্য্য, লীলাবতী ও বীজগণিত প্রণয়ন দ্বারা আপন নাম চিরস্মরণীয় করেন। তাহার পর ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের করকবলিত হইল, হিন্দু-সূর্য্য অস্তমিত হইল; সেই অবধি হিন্দুদিগের মানসিক বেগের আর পরিচয় পাওয়া যায় না।

সূর্য্য সম্ভব।

(শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।)

সৃষ্টির আদিতে জড়জগৎ অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া পরমাণুরূপে বিরাজিতেছিল। বিধাতা বিশ্বসৃষ্টির প্রথম সূচনা করিয়া পরমাণুতে জড়শক্তি সঞ্চারিত করিলেন; তাহার বলে পরমাণু-জগতে গতি উৎপন্ন হইল। বিজ্ঞান এখনও এই শক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা দ্বারা গতি উৎপন্ন হয়; এই জন্য ইহাকে গতির "কারণ" কহা যায়। পরমাণুতে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া গতি উৎপাদিত হইলে, ঐ গতিবশে তাহারা কুণ্ডলীর আকারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। যেমন পরমাণু জড়স্বরূপের অতি শৈশব প্রতিকৃতি, তদ্রূপ কুণ্ডলিকাকার গতি জড়গতির শৈশবাবস্থা। জড়জগতে গতির প্রথম উদ্যম,—ঘুরিতে চেষ্টা। পরমাণু চাপিয়া এই বিশাল বাস্তব-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। কত শত কোটি বৎসর এই সৃষ্টিকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; কিন্তু এখনও সৃষ্টির আদিম স্বরূপ পরমাণু তাহার কুণ্ডলিকাকার গতি পরিহার করে নাই। সৃষ্টি-ব্যাপারে জগৎ-প্রকটন-প্রসঙ্গে ঐ কুণ্ডলিকার গতিই বিশ্বস্রষ্টার প্রথম কার্য্য, এবং নিরুদ্যম জড়ে ইহাই প্রথম শক্তি প্রকটন।

কুণ্ডলিকাকার গতিতে স্থানান্তর গমন বুঝায় না। একটী সর্পের পুচ্ছ তাহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহাকে চলিতে দিলে তাহার স্থানান্তর গমনের ক্ষমতা থাকিবে না, সে কেবল এক জায়গায় থাকিয়া ঘুরিতে থাকিবে, ইহাই কুণ্ডলিকাকার গতি। কিন্তু ইহা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না; অথচ পরমাণু স্বয়ং নিরুদ্যম, তাহাদ্বারা কোন কার্য্যই স্বতঃপ্রণোদিত হইতে পারে না। সৃষ্টির এ অবস্থায় বিধাতা

পরমাণুতে একটী গুণ প্রয়োগ করিলেন। তাহার নাম "আসক্তি" (ইহা Chemical affinityর পূর্ব্বরাগ)।

জড়কুণ্ডলী সকল ঘুরিতে ঘুরিতে পরস্পরের প্রতি "আসক্ত" হইতে আরম্ভ করিল। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের মতে এই আসক্তি কুণ্ডলিকাকার গতির ফল মাত্র। সে যাহা হউক, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত যে, কুণ্ডলিকাকার গতির কার্য্যকারিতা আসক্তিতে নিবদ্ধ। এই আসক্তিবশে জড়কুণ্ডলী সকল ঘুরিতে ঘুরিতে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, এবং সন্নিধানুক্রমে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, বহুপরমাণুর সমাবেশে এক একটী অণু সৃষ্টি করিতে লাগিল। পরমাণু সকল এক জাতীয় হইলেও অণুতে জাতিভেদ আছে; তাহার কারণ জড়কুণ্ডলীর বিভিন্ন স্থিতিবৈচিত্র্যে সমাবেশ। অণুতে পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিবৈচিত্র্য বশতঃ অণু সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর আসক্তির সমষ্টি দ্বারা অণুর আসক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সমষ্টি কেবলমাত্র পারমাণবিক আসক্তির যোগফল নহে, পরমাণু সকলের অবস্থিতিভেদে আণবিক আসক্তির পরিমাণ-বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। এ কারণ সমসংখ্যক পরমাণু দ্বারা গঠিত সকল অণুর আসক্তি সমান নহে। যে অণুর আসক্তি যত অধিক, তাহা সেই পরিমাণে তৎসন্নিহিত অপর অল্পাশক্তিবিশিষ্ট অণুকে আপনার দিকে টানিয়া লয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক অণুর একত্র সমাবেশ ঘটিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছে। যেমন, নির্ম্মল আকাশে দেখিতে দেখিতে বাষ্পকণা সকল ঘনীভূত হইয়া মেঘ উৎপন্ন করে, জড়জগতের আদি উৎপত্তির প্রথাও সেইরূপ।

পদার্থের উৎপত্তি সাধন করিতে গিয়া জড় পরমাণু যে আপনার স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করিয়া দেয়, তাহা নহে, তাহার কুণ্ডলিকাকার গতি চিরকাল

সংক্ষুব্ধ থাকে। এই হেতু পদার্থ সকল জন্ম হইতেই এক দুর্দ্দমা গতি-লিপ্সা প্রাপ্ত হয়।

অণুতে অণু মিশিয়া স্থানে স্থানে তাহাদের আকার ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে জড়জগৎ, পরস্পর হইতে ব্যবচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড নীহারিকাতে পরিণত হইল। এই সকল নীহারিকাতে গতির বিরাম নাই; বরং উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক অণুর সমাবেশে তাহাদের গতিলিপ্সা ও তদানুসঙ্গিক আসক্তি বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার ফলে এক একটী নীহারিকা বিপুল শক্তির আধার হইতে আরম্ভ করিল। জড় থাকিলে শক্তি প্রকটিত হইতে পারে না, একারণ জড়কে শক্তির "বাহন" কহে। আবার যেখানে জড় পদার্থ যত বেশী, সেখানে শক্তি প্রকটনের সুযোগ তত বেশী। আকাশে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের সমষ্টি হইতে ক্রমে বৃহৎ মেঘের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, নীহারিকা জগতেও তাহা ঘটিতে লাগিল। নীহারিকা যত আকারে বাড়িতে লাগিল, তত তাহার অণু সকলে গতি ও আসক্তি প্রবল হইতে লাগিল। ইহার বলে নীহারিকা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া পরিশেষে এক বিশাল পদার্থ খণ্ডরূপে ঘুরিতে লাগিল।

ক্রমে পরমাণু সকলের কুণ্ডলিকাকার গতি ভিন্ন, সমগ্র নীহারিকার একটী বিস্তীর্ণ আবর্ত্তন প্রকটিত হইতে লাগিল। অণু সকলে যত আসক্তি বাড়িতে লাগিল, তত তাহারা পরস্পর অধিকতর সান্নিধ্যে আসিতে লাগিল; এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে নীহারিকার আয়তন সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। এই সঙ্কোচনের অবশ্যম্ভাবী ফল নীহারিকার ঘনীভবন, এবং নীহারাবস্থা হইতে ঘন বাষ্প, তাহা হইতে তরল, তাহা হইতে কর্দ্দমবৎ এবং অবশেষে কঠিন অবস্থায় পরিণতি। ইহাই জড় জগতের উৎপত্তির ক্রম।

একটী তরল অথবা নমনশীল গোলককে ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়া যদি ক্রমে ক্রমে তাহার বেগ বৃদ্ধি করা যায়, তবে তাহার মধ্যভাগ ক্রমে স্ফীত হইয়া অবশেষে তাহা গোলক ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। নীহারিকা সকল যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই তাহারা স্ব স্ব আবর্ত্তন-গতিবলে ক্রমশঃ গোলাকার ধারণ করিতে লাগিল (এখনও জড়জগতে এমন নীহারিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ঘনীভবনের এরূপ মাত্রায় পৌঁছায় নাই, যে অবস্থায় তাহারা এক অখণ্ডিত পদার্থরূপে ঘুরিতে আরম্ভ করিতে পারে।) যখন নীহারিকা এক অখণ্ডিত পদার্থরূপে ঘুরিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার একটী কেন্দ্র জন্মাইতে থাকে এবং ঘনীভবনের ক্রম ঐ কেন্দ্রের দিকে প্রবল হয়। ইহারই ফলে কৈন্দ্রিক আকর্ষণের উৎপত্তি হয়, যাহা এক্ষণে মাধ্যাকর্ষণ নামে পরিচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, মাধ্যাকর্ষণ ভিন্ন ভিন্ন আণবিক আকর্ষণের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাই পারমাণবিক আসক্তির পরিণতি। ইহার ফলে অণু সকল কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট থাকিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তন করে। ঐ আবর্ত্তনের ফলে নীহারিকা যত ঘন হইতে থাকে, ততই তাহা গমনশীল গোলকের ন্যায় মধ্যভাগে স্ফীত হইয়া পড়ে। অবশেষে যখন স্ফীতাংশে গতির বেগ এত প্রবল হয় যে, তত্রস্থ জড়াংশ স্বীয় জড়ধর্ম্মবশে গতির মুখে চলিতে প্রয়াস পায়, এবং তাহার বেগ কৈন্দ্রিকাকর্ষণের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে, তখন ঐ স্ফীতাংশ দূরে ছড়াইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় তাহা মূল নীহারিকার কেন্দ্র হইতে দূরে অপসারিত হইয়া আপনা-অপানি আবার জড়ীভূত হইতে চেষ্টা করে। এই ঘনীভবনাবস্থায় তাহার আবার গোলাকার স্বরূপ প্রকটিত হইয়া তাহাতে স্বতন্ত্র কেন্দ্রের উৎপত্তি হয় এবং তাহা কখনও স্বতন্ত্র পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।

মূল নীহার-গোলক হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে খণ্ডবিশেষ বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র গোলকের উৎপত্তি জড়ধর্ম্মের প্রক্রিয়া মাত্র। কিন্তু তদ্দ্বারা মূল ও খণ্ড-গোলকের পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্যুতি ঘটে না;—তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আসক্তি, পরস্পরের কেন্দ্রের দূরত্বানুসারে হ্রাস পাইলেও, একেবারে বিলোপ পায় না। এ কারণ খণ্ড-গোলক মূল-গোলককে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে থাকে। এরূপ স্থলে, মূল গোলককে "সূর্য্য" ও খণ্ড-গোলককে "গ্রহ" কহে। গ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া চলিতে চলিতে যত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই তাহার কেন্দ্র-বেষ্টনী-গতি প্রবল হইয়া উঠে,—এবং ক্রমে ঐ গতির বৃদ্ধি হেতু তাহা গমনশীল গোলকের ন্যায় মধ্যভাগে স্ফীত হইতে থাকে। এইরূপে গ্রহ হইতে কালক্রমে ক্ষুদ্র বা "উপ" গ্রহের উৎপত্তি হয়।

উপরি-উক্ত প্রকারে যথাক্রমে বহুসংখ্যক গ্রহ ও উপগ্রহের উৎপত্তি হইয়া, কালে এক একটী সূর্য্যের চারিদিকে এক একটী বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি হয়। ইহার নাম "সৌর জগৎ"। এতাবৎকাল সূর্য্য-গ্রহ এবং উপগ্রহগণ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে; এবং তদবস্থায় যথাক্রমে গাঢ় বাষ্প হইতে তরল, কর্দ্দমবৎ ইত্যাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া কঠিনাবস্থায় পরিণত হয়। যে গোলক যত কাঠিন্যে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার আভ্যন্তরিক অণু সকলের পরস্পর ঘর্ষণে তাহাদের আণবিক গতির তত হ্রাস হয়। বিজ্ঞান আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে যে, ঐ আণবিক গতির ফল—উত্তাপ এবং আলোক। এ কারণ পদার্থখণ্ড যত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই তাহাদের আণবিক গতি ঘর্ষণবলে অধিকতর উত্তাপ বিকীর্ণ করিয়া থাকে; এবং যখন ক্রমে তাহা কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, তখন তাহার উত্তাপ বিকীরণের ক্ষমতা চলিয়া যায়।

আমরা যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছি, তাহার ন্যায় আরও কত সূর্য্য জগতে রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? এবং ইহা যে অপর কোন মহাসূর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া আসে নাই, তাহাই বা কে নির্ণয় করিতে পারে? পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, সূর্য্য কোন মূল নীহারিকার সঙ্কোচনসম্ভূত, তাহার স্থানান্তর গমনের প্রয়াস সম্ভবপর নহে। কিন্তু গণনা দ্বারা ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, আমাদের সূর্য্য শূন্যপথে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিতেছে। অতএব ইহা সহজে প্রতিপন্ন হয় যে, আমাদের সূর্য্য কোন মূল নীহারিকার সঙ্কোচন দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই; পরন্তু কোন এক মহাসূর্য্যের সঙ্কোচনের এবং আবর্ত্তনের ফলে স্খলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সৌর-জগতের গ্রহসকল যেমন ক্রমশঃ জমিতে জমিতে কঠিনাবস্থায় পরিণত হইতেছে, আমাদের সূর্য্যও যে এককালে সেইরূপ কঠিন পদার্থখণ্ডে পরিণত হইবে, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। তখন যে সূর্য্যের সূর্য্যত্ব ঘুচিয়া যাইবে, অর্থাৎ তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া একটী "অন্ধ সূর্য্যে" পর্য্যবসিত হইবে, তাহাও স্বীকার করা অসম্ভব নহে।

সৌর-জগতে কয়েকটী গ্রহ একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, যথা—বুধ এবং শুক্র; কয়েকটী গ্রহের আবরণভাগ নির্ব্বাপিত হইলেও অভ্যন্তরভাগ এখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে; যথা—পৃথিবী ও মঙ্গল। অপর কোন কোন গ্রহ এখনও কিঞ্চিৎ উত্তাপ বিকীরণের ক্ষমতা রাখে, যথা—বৃহস্পতি। ইহাদের স্বরূপ আলোচনা করিলে সৌর-জগতের ক্রমোৎপত্তিবিধান অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়।

এ স্থলে সূর্য্যের জন্মবৃত্তান্ত যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, সূর্য্য অমর নহে, তাহার বিনাশ না থাকিলেও নির্ব্বাণ আছে। এক্ষণে এই প্রশ্নের আলোচনা হওয়া আবশ্যক যে, সূর্য্য

একবার নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে তাহার পুনর্দীপ্তিলাভের সম্ভাবনা আছে কি না।

কয়েক বৎসর গত হইল, আকাশের এক প্রান্তে হঠাৎ একটী অত্যুজ্জ্বল নব তারকার আবির্ভাব হইয়াছিল। কিছুকাল পর্য্যবেক্ষণের পর দেখা গেল যে, তাহার প্রখর দীপ্তি হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ তাহা একটী সাধারণ তারার আকার ধারণ করিতেছে। প্রথমে যেরূপ দেখা গিয়াছিল, তাহাতে অনুমান করা যাইত, যেন আকাশের কতকগুলি তারা একত্র হইয়া একটী বৃহৎ তারা গঠন করিয়াছে। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, তত দেখা গেল যে, তাহার দীপ্তি ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া এক্ষণে তাহা একটী স্থির নক্ষত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। কিছুকাল যাবৎ তাহার আর কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে না। অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠ কিংবা কয়লা নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা প্রথমে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে; কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার উদ্দাম দীপ্তি কমিয়া গিয়া তাহা স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে। উক্ত নব তারকাতে এইরূপ প্রক্রিয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ মনে করিতেছেন যে, আকাশের যে স্থানে উক্ত নব তারকার প্রকাশ হইয়াছে, তথায় একদল উল্কা বিচরণ করিয়া একটী "উল্কাশয়" সৃষ্টি করিয়াছিল। কেবল একটা অপরিচিত নির্ব্বাপিত সূর্য্য আপন গন্তব্যপথে চলিতে চলিতে ঐ উল্কাশয়ে আসিয়া পড়িয়াছে; এবং এক ঝাঁক উল্কার সংঘর্ষে আসিয়া তাহার গতি প্রতিহত হওয়াতে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বায়ুর সংঘর্ষে উল্কা প্রজ্জ্বলিত হইতে সচরাচর দেখা যায়। এক ঝাঁক উল্কার সংঘর্ষে আসিয়া যে একটী অন্ধ সূর্য্য জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র নহে। আবার ঐ সূর্য্যের আঘাতে উল্কাশয়ের উল্কারাশি যে জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাতেও আশ্চর্য্যের

বিস্ময় কিছু নাই। পরন্তু, ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক যে, পৃথিবীর সান্নিধ্যে উল্কা আসিলে তাহা যেমন পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া ধরাতলে উল্কাপাত ঘটায়, উক্ত অন্ধ সূর্য্য উল্কাশয়ে নিপতিত হইয়া তাহার উল্কা-রাশিকে সেইরূপে আকৃষ্ট করিয়া আপনার সংঘর্ষে আনিয়াছে, এবং ঘর্ষণজনিত উত্তাপে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়াছে। ইহাই নব তারকার প্রথম উদ্দাম দীপ্তির কারণ। এক্ষণে ঐ নির্ব্বাপিত সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া একটী নব অথবা পুনর্জ্জীবিত সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ; এবং তাহাকে আমরা একটী নব তারকারূপে দেখিতে পাইতেছি। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, সূর্য্য একবার নির্ব্বাপিত হইয়া অসাড় জড়পিণ্ডে পরিণত হইলেই তাহাতে সৃষ্টির অবসান হইল না। নির্ব্বাপিত সূর্য্য পুনর্জ্জীবিত হইয়া তদ্দ্বারা নূতন সৌর-জগৎ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সূর্য্য জ্বলিয়া উঠিলেই তাহা একেবারে নীহারিকাতে না হউক, অন্ততঃ বাষ্প কিংবা তরলাবস্থায় পরিণত হইবে। তাহা হইলে ঐ সূর্য্য হইতে যথাক্রমে গ্রহ-উপগ্রহাদির উৎপত্তি ঘটিতে পারে। এইরূপে জীর্ণ বিশ্বের পুনঃ-সংস্কার বিধাতার মঙ্গল বিধানেরই পরিচায়ক।

বিজ্ঞানে সাহিত্য

(স্যার জগদীশচন্দ্র বসু)

কবিতা ও বিজ্ঞান।

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটী অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায়, সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাষে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায়, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন; শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায়, সেখান হইতেও তিনি কম্পমান্ বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন; এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন, সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদ্‌কে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিকের দেখা,

এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেওয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে, সেখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া দেয়। সেই জন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই—জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি, অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতেও প্রমাণ বাহির করিতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে "যেন" যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয়, তাহা একান্ত বন্ধুর, এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মেলে, সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান, তাহার কিছুমাত্র বেশী দাবী করিতে পারেন না বটে; কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখন কোন অংশে দুর্ব্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন, যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে, এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে, তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্ম-সংবরণ করিতে বিস্মৃত হন, এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।

অদৃশ্য আলোক।

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণ স্বরূপ আপনা-দিগকে এক অত্যাশ্চর্য্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম-রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দু-একটী কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহুরঙ্গে রঞ্জিত আলোক-সমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটী রং তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই অসীম আলোকের সাত সমুদ্র পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে ?

এইরূপ অচিন্তনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে, তাহার পথ জার্ম্মাণীর অধ্যাপক হার্টজ প্রথমে দেখাইয়া দেন।

* * * বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল, যাহা অস্বচ্ছ মনে করি, তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে, যাহা এক দিক ধরিয়া

দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচবর্ত্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ মৃৎবর্ত্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহুদূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, দৃশ্য-আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য-আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

আকাশ-সঙ্গীতের অসংখ্য সুর-সপ্তকের মধ্যে একটা সপ্তক মাত্র আমাদের দৃশ্যেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্যরাজ্য। আমরা কতটুকু দেখিতে পাই? নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। দুঃসহ এই জ্যোতির ভার, অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই, সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষ-জীবনের ইতিহাস।

দৃশ্য-আলোকের বাহিরে অদৃশ্য-আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন-রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে, তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেই জন্য রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদ-রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ্-জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন

সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেন্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাত দৃশ্যভাবে কিংবা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয়, তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর-প্রমুখ উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে বৃক্ষ স্নায়ুহীন, আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোন সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি, তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। আমাদের জীবন-লক্ষ্মী উদ্ভিদ্-জীবনের কোন ভার গ্রহণ করেন নাই। উদ্ভিদ্-জীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে, আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস।

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের

অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্ত্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয়, তাহা যদি ধরিতে ও মাপিতে পারি।

জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয়, তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে। যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিংবা 'নাড়ার' উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে, তখন হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোন প্ররোচনায় কাগজকলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাততঃ অসম্ভব কার্য্যে কোন উপায়ে যদি সফল হইতে পারি, তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তাহার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার একান্ত শোচনীয় তাহার সন্দেহ নাই। এক লিপি-সভার সভাগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত, অশিক্ষিত কিংবা অর্দ্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ!

সে যাহা হউক, মানসসিদ্ধির পক্ষে দুইটী প্রতিবন্ধক—প্রথমতঃ গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান। দ্বিতীয়তঃ গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা।

শিশুকে আজ্ঞাপালন করান অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি, এই জন্য বিচিত্র প্রকারের চিম্‌টি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে, এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায়, তাহার কোন মূল্য নাই—ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

এখন বুঝিতে পারিতেছি, তাড়াহুড়া করিলে কিংবা অতিরিক্ত আঘাত করিলে প্রকৃত কোন উত্তর পাওয়া যায় না। সকালবেলা আমাদের মত তাহাদের একটা জড়তা আইসে। সুতরাং উত্তর কতকটা অস্পষ্ট। দ্বিপ্রহরের গরমের সময় দুই চারিটা উত্তর দিয়া গাছ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যে দিন ঝড় কিংবা অন্য দৈবদুর্য্যোগ ঘটে, সে দিন গাছ মৌনভাব ধারণ করে। এ সব বিরক্তির কারণ ত্যাগ করিয়া শুভ দিন ও ক্ষণ নিরূপণ করিলে, বহুঘণ্টাব্যাপী সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়।

গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটেই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের

কোন হাত থাকিবে না, কারণ মানুষ তাহার স্ব-প্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।

গাছের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তের ইতিহাস উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য। সে জন্য জানিতে চাই, তাহার উপর প্রত্যেক অনুকূল, প্রত্যেক প্রতিকূল ঘটনার ছাপ—তাহার সহিত আলো ও অন্ধকারের ক্রীড়া, তাহার উপর পৃথিবীর টান ও ঝটিকার আঘাত। কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাত, কত প্রকারের সাড়া! এই স্থির এই নিশ্চলবৎ প্রতীয়মান জীবন-প্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রীড়া চলিতেছে। কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব।

এই যে তিল তিল করিয়া বৃক্ষ-শিশুটা বাড়িতেছে, যে বৃদ্ধি চক্ষে দেখা যায় না, মুহূর্ত্ত মধ্যে কি প্রকারে তাহাকে পরিমাণের মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে পারিব? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়? আহার দিলে কিংবা আহার বন্ধ করিলে কি পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইতে কত সময় লাগে? ঔষধ সেবনে কিংবা বিষ প্রয়োগে কি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যাইতে পারে কি? বিষের মাত্রা প্রয়োগে কি ফলের বৈপরীত্য ঘটে?

তার পর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনরূপ সাড়া দেয়, তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে কত সময় লাগে? সেই অনুভব কাল ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্ত্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারা যায়? তার পর বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পৌঁছে? স্নায়ুসূত্র আছে কি? যদি থাকে, তবে স্নায়বীয়-প্রবাহ কিরূপ বেগে ধাবিত হয়? কোন্ অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহের গতি বৃদ্ধি হয়? কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় নিবারিত অথবা নিরস্ত হয়? আমাদের স্নায়বিক-

ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে? সেই গতি ও সেই গতির পরিবর্ত্তন কোন প্রকারে কি স্বতঃলিখিত হইতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্পন্দনশীল পেশী আছে, উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃ-স্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে যখন মৃত্যুর প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়, সেই নির্ব্বাণ-মুহূর্ত্ত কি ধরিতে পারা যায়? এবং সেই মুহূর্ত্তে কি বৃক্ষ কোন একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?

এই সব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস বিবিধ যন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হইলেই গাছের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হইবে।

যদি গাছ তাহার লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত, তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত। কিন্তু এ কথা ত দিবা-স্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য, কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্ম্মে পরিণত করিতে চাই, তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতি-দেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আব্দার এবং ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছে না। কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতা-সঞ্চিত শক্তি-বলে রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই প্রকৃতিদেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা।

সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ-বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। এ কথা যদিও অনেক

পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত, তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগার-নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন, সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই, সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে তাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশ জনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, সমস্ত দুঃখ ধৈর্য্যের সহিত তাহারা বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়।

এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে—কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেত-পদ্ম তাহা সোণার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।

তরুলিপি যন্ত্র।

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষযন্ত্র নির্ম্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনামাত্র ছিল, তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্ব্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে, বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নির্ণীত হইবে, তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ুঃ পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে, এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্ম্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান্ দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এ দেশে আমাদেরই কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এদেশীয়। এখন গাছের সাড়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-চারিটা কথা বলিব।

গাছ লাজুক কি অলাজুক ?

তৎপূর্ব্বে তরুজাতিকে যে লাজুক ও অলাজুক সসাড় ও অসাড় বলিয়া দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, সেই কুসংস্কার দূর করা আবশ্যক। সব গাছই যে সাড়া দেয়, তাহা বৈদ্যুতিক উপায়ে দেখান যাইতে পারে। তবে কেবল লজ্জাবতী লতাই কেন পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয় ?—সাধারণ গাছ দেয় না কেন ? ইহা বুঝিতে হইলে ভাবিয়া দেখুন যে, আমাদের

বাহুর এক পাশের মাংসপেশীর সঙ্কোচন দ্বারাই হাত নাড়িয়া সাড়া দেই; উভয় দিকেই মাংসপেশী যদি সঙ্কুচিত হইত, তবে হাত নাড়িত না। সাধারণ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকের পেশী আহত হইয়া সমভাবে সঙ্কুচিত হয়, তাহার ফলে কোন দিকেই নড়া হয় না। কিন্তু এক দিকের পেশী যদি ক্লোরোফরম দিয়া অসাড় করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণ গাছের সাড়া দিবার শক্তি সহজেই প্রমাণিত হয়।

অননুভূতি-কাল নিরূপণ।

জীব যখন আহত হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সাড়া দেয় না। ভেকের পায় চিমটি কাটিলে সাড়া পাইতে ন্যূনাধিক সেকেণ্ডের শত ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। ইংরাজী ভাষ্যে, এই সময়টুকু লেটেণ্ট পিরিয়ড। "অননুভূতি সময়" ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইল।

বাহিরের অবস্থা অনুসারে এই অননুভূতি-কালের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে; মৃদু আঘাত অনুভব করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করিতে বেশী সময়ের অপব্যয় হয় না। আর যখন শীতে জীব আড়ষ্ট থাকে, তাহার অননুভূতি-কাল তখন দীর্ঘ হইয়া পড়ে। পুনরায় আমরা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন অনুভূতি করিবার পূর্ব্বকাল একান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে; এমন কি, সে সময়ে কখন কখন একেবারেই অনুভব-শক্তি লোপ পায়। গাছের অনুভূতি সম্বন্ধে একই প্রথা। লজ্জাবতীর তাজা অবস্থায় অননুভূতিকাল সেকেণ্ডের শতাংশের ছয় ভাগ,—উদ্যমশীল ভেকের তুলনায় কেবলমাত্র ছয় গুণ বেশী। আর একটী আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, স্থূলকায় বৃক্ষ দিব্য ধীরে সুস্থে সাড়া দিয়া থাকে। কিন্তু কৃশকায়টী একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বসে। মনুষ্যলোকেও ইহার সাদৃশ্য আছে কি না, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শীতে গাছের অননুভূতিকাল প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আঘাতের পর গাছের প্রকৃতিস্থ হইতে প্রায় পোনের মিনিট লাগে। তাহার পূর্ব্বে আঘাত করিলে অননুভূতি-সময় প্রায় দেড়গুণ দীর্ঘ হয়। অধিক ক্লান্ত হইলে অননুভূতি-শক্তির সাময়িক লোপ হয়, তখন গাছ একেবারেই সাড়া দেয় না। এ অবস্থাটি যে কিরূপ অবস্থা, আমার দীর্ঘ বক্তৃতার পর তাহা আপনারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

সাড়ার মাত্রা।

সময়ভেদে একই আঘাতে সাড়ার প্রবলতার তারতম্য ঘটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকালবেলা রাত্রির নিশ্চেষ্টতাজনিত গাছের একটু জড়তা থাকে। আঘাতের পর আঘাতে সে জড়তা চলিয়া যায় এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়িতে থাকে; সেটা যেন জাগরণের অবস্থা। গরম জলে স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা শীঘ্রই দূর হয়। দু-প্রহরের সময় এ সব উল্টা হইয়া যায়; ক্লান্তিবশতঃ সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য সময় দিলে সেই ক্লান্তি চলিয়া যায়। আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে, সাড়ার মাত্রাও বাড়িতে থাকে; কিন্তু তাহারাও একটা সীমা আছে। এ বিষয়ে মানুষের সহিত গাছের প্রভেদ নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শীতকালে ঘা খাইলে যেমন সারিতে আমাদের অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। গ্রীষ্মকালে যাহা পোনের মিনিটে সারিয়া যায়, তাহা সারিতে শীতকালে আধ ঘণ্টার অধিক লাগে।

বৃক্ষের স্নায়বিক প্রবাহ।

জন্তুদেহে এক স্থানে আঘাত করিলে আঘাতের ধাক্কা স্নায়ু দ্বারা দূরে পৌঁছে। স্নায়বীয়-প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ,

স্নায়বীয়-বেগ বিবিধ অবস্থায় হ্রাস বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতায় বেগ বৃদ্ধি এবং শৈত্যে বেগ হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যুৎ-প্রবাহে স্নায়ুতে কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। যতক্ষণ স্নায়ু দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিতে থাকে, ততক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে না। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রেরণ এবং বন্ধ করিবার সময় কোন বিশেষ স্থলে উত্তেজনা এবং অন্য স্থানে অবসাদ উপলক্ষিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিবার মুহূর্ত্তে যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যাগ করে, সেই স্থলেই স্নায়ু হঠাৎ উত্তিজিত হয়। এতদ্ব্যতীত যদি স্নায়ুর কোন অংশে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করা যায়, তবে সেই অংশ দিয়া আর কোন সংবাদ যাইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলে অমনি রুদ্ধ পথ খুলিয়া যায়, স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।

যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষদেহেও যে স্নায়বীয় সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে ধরা যাইতে পারে এবং একই কলের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ পৌঁছিতে কত সময় লাগে, তাহাও নির্ণীত হয়। স্নায়বীয়-বেগ বৃক্ষদেহে, ভেকদেহ তুলনায় মন্থর, কিন্তু নিম্নজাতীয় জন্তু হইতে দ্রুত। বৃক্ষে উষ্ণতায় স্নায়ুবেগ প্রায় সাতগুণ বর্দ্ধিত হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রারম্ভকালে বৃক্ষস্নায়ুর এক স্থানে উত্তেজিত অন্য স্থানে অবসাদিত হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা বৃক্ষের স্নায়বীয় ধাক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়। স্নায়ুসম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে, সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা জীব ও উদ্ভিদে যে, এ সম্বন্ধে কোন ভেদ নাই, তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

স্বতঃ-স্পন্দন।

জীবদেহের অংশবিশেষে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ পেশী আছে, যাহা আপনা-আপনি স্পন্দিত

হয়। যতকাল জীবন থাকে, ততকাল হৃদয় অহরহঃ স্পন্দিত হয়। কোন ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। কিন্তু জীব-স্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিদেও এইরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়; তাহার অনুসন্ধান-কালে সম্ভবতঃ জীব-স্পন্দন-রহস্যের কারণ প্রকাশিত হইবে।

শারীর-তত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন। হৃদয়-জানা কথাটা শারীরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি, কবিতার অর্থে নহে। সমস্ত ব্যাংটিকে লইয়া পরীক্ষা সুবিধাজনক নহে; এজন্য তাঁহারা হৃদয়টাকে কাটিয়া বাহির করিয়া পরীক্ষা করেন;—কি কি অবস্থায় হৃদয়গতির হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলেই স্পন্দন-ক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুন্ন-গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয়, কিন্তু ঢেউগুলি খর্ব্বকায় হয়। শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ভৈষজ্যদ্বারা হৃদয়ের স্বাভাবিক তাল বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইথার প্রয়োগে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়।

ক্লোরোফরমের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিবিধ বিষপ্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য রহস্য এই যে, কোন বিষে হৃদয়স্পন্দন সঙ্কুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিস্পন্দিত হয়। বিষের এইরূপ পরস্পর বিরোধী গুণ জানিয়া, এক বিষদ্বারা অন্য বিষ ক্ষয় হইতে পারে।

জীবের স্বতঃ-স্পন্দনসম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টী প্রধান ঘটনা বর্ণন করিলাম। উদ্ভিদেও কি এই সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়? নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া গাছও যে স্পন্দনশীল তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাইয়াছি।

বনচাঁড়ালের নৃত্য।

বনচাঁড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পত্রগুলি আপনা-আপনি নৃত্য করিতেছে। লোকের বিশ্বাস যে, হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। গাছের সঙ্গীত-বোধ আছে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু বনচাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোন সম্বন্ধ নাই। তরুস্পন্দনের স্বতঃলিপি পাঠ করিয়া, জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেছি।

প্রথমতঃ, পরীক্ষার সুবিধার জন্য, বনচাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে, স্পন্দনক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নলদ্বারা উদ্ভিদ্-রসের চাপ দিলে স্পন্দনক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে। তার পর দেখা যায় যে, উত্তাপে স্পন্দনের সংখ্যা বর্দ্ধিত ও শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইথার-প্রয়োগে স্পন্দনক্রিয়া স্তম্ভিত হয়, কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্যভাব দূর হয়।

ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাব মারাত্মক। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যে বিষদ্বারা যেভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেইভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, স্বতঃ-স্পন্দনের মূল রহস্য কি? উদ্ভিদে পরীক্ষা

করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, কোন কোন উদ্ভিদ্-পেশীতে আঘাত করিলে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল, তাহা নহে; উদ্ভিদ্ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এইরূপে আহার-জনিত বল, বাহিরের আলোক-উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ্ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয়, তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে, সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরুচ্ছ্বাস; যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায়, তখন স্বতঃস্পন্দনেরও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পরে, বাহিরের উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছ অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি উথলিয়া উঠে, কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা বাহিরের উত্তেজনার কাঙ্গাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙ্গা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেক কাল সাড়া দেয় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বনচাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ।

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থার জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতার আবশ্যক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অবস্থা স্বতঃস্পন্দনেরই একটি উদাহরণবিশেষ। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থাভিলাষী

সাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন, কোন্ পথ—কামরাঙ্গা অথবা বন-চাঁড়ালের পদাঙ্কানুসরণ—তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। পরিপূর্ণ অবস্থাই যে স্বতঃস্পন্দনের কারণ তাহা বিবিধ। মানবিক ব্যাপারেও দেখা যায়। শিশু যখন মাতৃদুগ্ধ এবং স্নেহাতিশয্যে পরিপূর্ণ হয়, তখন তাহার হাত পার স্বতঃস্পন্দন দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করে।

মৃত্যুর সাড়া।

উদ্ভিদের জীবনে পরিশেষে এরূপ সময় আইসে, যখন কোন আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত মৃত্যুর আঘাত; কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্ত্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধমূর্ত্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের কথা। মৃত্যুর রুদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে, তখন গাছের জীবন তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম-মুহূর্ত্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল আকুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটা বৈদ্যুতিক-প্রবাহ মুহূর্ত্তের জন্য মুমুর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্ত্তিত হয়,—ঊর্দ্ধগামী রেখা নিম্নদিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম-সাড়া।

এই আমাদের মূক-সঙ্গী;—আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীর মর্ম্মের কথা আজ তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইল। এতদিন তরুলতার সহিত মানুষের জীবনগত আত্মীয়তার সংবাদ কেবল কবি-

কল্পনার আভাষে প্রচারিত হইতেছিল; আজ কঠোর বিজ্ঞান,—কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিল।

উপসংহার।

বহুদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্দ্ধ-অন্ধকারে বিশ্ব-কর্ম্মার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন-আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্ত্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্ম্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানা প্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহা শিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি;—কখন শিল্পকলায়, কখন সাহিত্যে, কখন বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটী দেখিয়াছিলাম, এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম, আমাদের দেশের বিশ্বকর্ম্মা বাঙ্গালী-চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন, তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবি-কল্পনা, কোথাও যুক্তি-বিচার, কোথাও তথ্য-সংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানব-শক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, এ আমাদের দেশের চিরকালের সংস্কার। দেবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষও

সৃজন করিতে পারে এবং সংহারও করিতে পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে, তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্ব্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চির-সত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী, তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের নিজের মধ্যে কাজ করিতেছে। আমাদের জীবনে আমাদের যে জাতীয় মহত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনী-শক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।



স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অতিথি-সেবা।

(স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়।)

'এক কপর্দ্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায়'। এই জনপ্রবাদে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম;—'করিতাম' বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে এদেশে আতিথ্য-সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবতী ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছে। পূর্ব্বে কোনও গৃহস্থের বাটীতে একটা অতিথি আসিলে অতিথির প্রত্যাখ্যান ত প্রায়ই হইত না—বাটীতে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। গৃহস্বামী নম্রতা এবং ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক আগন্তুকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন; গৃহ-প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন, কি স্বপাকে খাইবেন, তাহা সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। গৃহ-প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন শুনিলে যেন কৃতার্থ হইতেন এবং স্বপাকে খাইবেন শুনিলে বিশিষ্টরূপ শুচি হইয়া আয়োজন করিয়া দিবার নিমিত্ত লোক-জনকে আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ঘরে তাদৃশ অতিথির ভোজন সমাপন—অন্ততঃ ভোজনার্থ উপবেশন না হইলে, আপনারা কেহ জলগ্রহণ করিতেন না।

ভারতবর্ষীয়গণের অতিথিসেবার বিশেষত্ব।

আজকাল আর ওরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন স্বপাকভোজী অতিথি, সহরের কথা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রামেও বড় একটা সমাদর প্রাপ্ত হন না। আর যাঁহারা গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে সম্মত, তাঁহারাও অসময়ে আসিলে গৃহস্থের বিরক্তিকর হইয়া পড়েন। গৃহস্থ তাদৃশ স্থলে বিরক্তি সংগোপনে সতর্ক হয়েন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে—নিকটে দোকান,

বর্ত্তমান কালে অতিথির প্রতি ব্যবহার—আতিথ্য-ধর্ম্মের হ্রাস।

সরাই, সদাব্রত অথবা হোটেল আছে,—ইঙ্গিতক্রমে এরূপ বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ভাল লোক আর প্রায়ই অতিথি হইয়া কোন গৃহস্থের দ্বারস্থ হইতে সম্মত হন না। এখনকার অতিথির মধ্যে অধিকাংশ লোকই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-নিবাসী সন্ন্যাসী বা সাধু; ইহারা সদাব্রতে পেট টানিয়া এবং গাঁজা খাইয়া বেড়ায়; ফল কথা, প্রকৃতরূপ অতিথি-সৎকার কালক্রমে যে উঠিয়া যাইবে, তাহার উপক্রম দেখা দিয়াছে। তবে, যত দিন একান্নবর্ত্তিতা থাকিবে, যত দিন উদর অথবা স্বাচ্ছন্দ্য-চিন্তার উদ্বেগে এ দেশের লোকেরা উত্তেজিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন আতিথ্য-ব্যাপার একেবারে লোপ পাইবে না। পক্ষান্তরে, এদেশের লোকেরা যতই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে, এবং পরস্পর অথবা আগন্তুক অপর জাতীয়দিগের প্রতিযোগিতায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আর হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইবে না, ততই আতিথ্য-ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া যাইবে।

কিন্তু এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই,—এখনও অতিথি-সৎকার করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য-কর্ম্মের মধ্যে ধরা যায়,—এখনও আমরা এই ধর্ম্মপালনের ফলভোগী হইতে পারি।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধির ক্ষীণ পরিচয়।

আমি এস্থলে যে প্রকার অতিথি-সৎকারের কথা মনে করিতেছি, সে প্রকার অতিথি সচরাচর জুটে না। তিনি কোন পরিচিত বা ক্রিয়ার উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নহেন। তিনি কোন ভদ্রলোক,—কার্য্যগতিকে অসময়ে তোমার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। মনে কর,—বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্নান-ভোজন হয় নাই। তুমি কিরূপে তাঁহার সমাদর এবং অভ্যর্থনা করিবে? আমার বিবেচনায় তোমার

বিশিষ্ট অভ্যাগতের পরিচর্য্যা।

কর্ত্তব্য যে, যথেষ্ট সত্বরতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার স্নান-ভোজনের যোগাড় করিয়া দাও—ভাল করিয়া পাঁচটা ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইবার উদ্দেশে বিলম্ব করিও না। নিজে স্বহস্তে তাঁহার জন্য কোন যোগাড় করিও। সকল কাজ চাকর-চাকরাণীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। দুগ্ধপোষ্য শিশু ভিন্ন বাটীর অপর সকলের নিমিত্ত যে দুধ থাকে, তাহার কিছু কিছু লইয়া অতিথিকে দাও; অর্থাৎ যাহারা বুঝিতে পারিবার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই বুঝিতে পারে যে, অতিথির জন্য তাহাদিগের খাবার সামগ্রী কিছু কিছু কম হইয়া গিয়াছে। অতিথির নিকট আপনার ঐশ্বর্য্য অথবা জাঁক দেখাইবার নিমিত্ত কোন আড়ম্বর করিও না। কিন্তু যে দিন বাটীতে অতিথি আসিয়াছেন, সে দিন বাটীর অপর সকলের অপেক্ষা যেন অতিথির খাওয়াটি ভাল হয়, অবশ্য এরূপ চেষ্টা করিও। যদি অতিথির সৎকার করায় বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের কোন উপভোগে কিছুমাত্র ত্রুটী না হয়, তবে অতিথি-সৎকারে সমগ্র ফললাভ হয় না। কিন্তু যেখানে কাহারও উপভোগের ত্রুটী না হইয়া অতিথির সম্যক্ সৎকার হয়, সে বাটীতে মিত-ব্যয়িতার নিয়মগুলিও যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় না, এরূপ বলা যাইতে পারে।

অতিথির সহিত আলাপে তাঁহার পরিচয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিও না। নিজের বিদেশ-পর্য্যটন যদি কিছু হইয়া থাকে, সেই বিষয়ের কথা কহিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ যদি স্বয়ং কখন অতিথি হইয়া উত্তম সৎকার লাভ করিয়া থাক, তবে সেই কথা কহিও; উহা অতিথির বিশিষ্টরূপে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে।

অভ্যাগতের সহিত আলাপ।

কখন কখন এমন সকল লোককে অতিথি হইতে হয়, যাঁহারা স্নান-

মাত্রের অথবা দ্রব্যবিশেষের প্রার্থী হইয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন রীতির প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধে অসমর্থ কোন কোন ব্যক্তি তাদৃশ অতিথির প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, যদি আমার দ্রব্যই খাইবে না, তবে শুদ্ধ আশ্রয় দিব কেন?—অথবা যদি সিধাই লইবেন না, তবে একটু দুধ কিংবা মংস্য দিয়া কি হইবে? এই সকল লোক আতিথ্য-সম্পাদনে যে পুণ্য লাভ হয়, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই পুণ্যের প্রতি একান্ত লুব্ধ। কিন্তু লোভ মহাপাপ—পুণ্যের প্রতি যে লোভ, তাহাও পাপ। অতএব ঐ পুণ্যের লোভও পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যাহার যেটি প্রয়োজন, তাঁহাকে তাহাই দিবার চেষ্টা পাইবে। তোমার ঘরে বসিয়া অতিথি আপনার দ্রব্য খাইবেন, ইহাতে লজ্জা বোধ করা রাক্ষস প্রকৃতির লক্ষণ—বিশুদ্ধ সাত্বিক স্বভাবের লক্ষণ নয়।

স্থানমাত্র বা দ্রব্যবিশেষের প্রার্থী অভ্যাগতের প্রতি ব্যবহার।

তবে একটি কথা আছে, ওরূপ অতিথির নিকট স্বয়ং থাকিয়া আলাপ-পরিচয় করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। তাঁহার জন্য স্বহস্তে কোন যোগাড় করিয়া দিবারও প্রয়োজন নাই। তাঁহার পরিচর্য্যায় দাসদাসীর নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে অতিথির আজ্ঞা সকল সত্বরে পালন করিবার আদেশ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

অতিথি-সেবায় পরিচারক নিয়োগ।

গৃহস্থের অবশ্য-প্রতিপাল্য দানধর্ম্মের সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। মুষ্টিভিক্ষা দান অতি সৎকার্য্য বলিয়াই আমার বোধ হয়। 'ভিখারীর শরীর সবল ও কর্ম্মক্ষম; অতএব তাহার ভিক্ষা করা উচিত নয়, তাহার খাটিয়া খাওয়াই উচিত'—এ সকল বিচার গৃহস্থকে করিতে হইবে না। উহা সমাজের বিচার্য্য বিষয়। তোমার দ্বারে যে ভিখারী আসিল, তুমি তাহার

গৃহস্থের দান—ভিক্ষা প্রদান।

প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া এবং চাকর-চাকরাণীকে কাহাকেও কটুভাষা কহিতে না দিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও, সে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাউক। ঐ ভিক্ষা-দান কার্য্যটি বাটীর শিশুদিগের হাত দিয়া করানই ভাল।

মুষ্টিভিক্ষা ভিন্ন আরও নানা প্রকার চাদায় গৃহস্থকে অর্থদান করিতে হয়। বিদ্যালয়ের জন্য, পুস্তকাগারের জন্য, ডাক্তারখানার জন্য, পিতৃ-মাতৃ দায়ের জন্য, বারোয়ারির জন্য, দুর্ভিক্ষ-পীড়া নিবারণের জন্য, গৃহস্থকে প্রায় প্রতিমাসেই কিছু না কিছু দান করিতে হয়। আমার বিবেচনায় ঐ সকল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যাত করিতে নাই। সকলকেই কিছু কিছু দান করিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে একটি কথা আছে - দিব বলিয়া না দেওয়া, না দেওয়া অপেক্ষা বেশী দোষাবহ। বরং চক্ষুর্লজ্জা ত্যাগ করিয়া একেবারেই দিব না বলা ভাল, কিন্তু দিতে স্বীকার করিয়া কোন মতেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা উচিত নয়। যেটি দিবে বলিবে, সেটি ঠিক সময়েই যথাপরিমাণে দিবে। ফল কথা, দান-ধর্ম্মের মূল-সূত্র এই, দাতা এমনভাবে দান করিবেন, যেন গ্রহীতার বোধ হয় যে, উনি দান করিতে পাইয়া আপনাকে উপকৃত এবং কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

অন্যবিধ দান।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

(স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ।)

একদা রাজা শান্তনু যমুনাতীরবর্ত্তী এক অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন ; কিন্তু কোথা হইতে সেই সুরভি-গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, সবিশেষ না জানিতে পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিতলোচনা দেবরূপধারিণী এক ধীবর-কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীরু! তুমি কে? —কাহার পত্নী? এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? সে কহিল, মহাশয়! আমি ধীবরকন্যা, পিতার আদেশে তরণীবাহন করিয়া থাকি। রাজা শান্তনু ধীবরকন্যার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গসৌরভ-আঘ্রাণে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ কহিলেন, হে প্রজানাথ; যখন কন্যা জন্মিয়াছে, অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে ; আপনি সত্যবাদী, যদ্যপি এই কন্যাটি ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রার্থনা করেন, তবে আমি আপনাকে সম্প্রদান করিব ; কিন্তু আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ করিব বলিয়া অগ্রে স্বীকার করিতে হইবে।

শান্তনু কহিলেন, হে ধীবর! তোমার অভিপ্রায় শ্রবণ না করিয়া কিরূপে তাহাতে সম্মত হইতে পারি। যদি অভিলষিত বিষয় দানযোগ্য হয়, নিশ্চয়ই প্রদান করিব ; কিন্তু অদেয় হইলে কোন ক্রমেই দিতে পারিব না। ধীবর কহিলেন, মহারাজ! এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্রই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে ; অন্য

কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না, এই আমার অভিলাষ। রাজা ধীবরকে বরদান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ধীবর-কুমারীর অনুপম রূপলাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর এক দিবস দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! আপনার সর্ব্বত্র কুশল ও সমুদয় রাজমণ্ডল আপনার অধীন, তথাপি কি নিমিত্ত নিরন্তর আপনাকে এরূপ শোকার্ত্ত ও দুঃখিত দেখিতেছি? সর্ব্বদাই যেন শূন্য-হৃদয়ে রহিয়াছেন, আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না। অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করেন না, কেবল দিন দিন মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন; অতএব আপনার কি রোগ হইয়াছে, আজ্ঞা করুন, আমি তাহার প্রতীকার করিব।

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, বৎস! আমি যে নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র পুত্র, তুমি অস্ত্র-শস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকারবিশিষ্ট হইয়াছ। কিন্তু হে পুত্র! মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ইহা বড় আক্ষেপের। কারণ, যদি তোমার কোন অনিষ্টঘটনা হয়, তাহা হইলে আমাদের কুল নির্ম্মূল হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি একশত পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব আর বৃথা দারপরিগ্রহ করিতে আমার অভিলাষ নাই; কিন্তু ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন, যাহার এক পুত্র তিনি অপুত্রক মধ্যেই পরিগণিত। ত্বদীয় অনিষ্টশান্তির নিমিত্ত নিরন্তর পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করুন। অগ্নিহোত্র, ত্রয়ী এবং নিখিল-শাস্ত্র কিছুই সন্তানের ষোড়শাংশেরও তুল্য নহে। তুমি মহাবলপরাক্রান্ত, সর্ব্বদা সশস্ত্র ও অমর্ষপরিপূরিত; অতএব রণক্ষেত্র ব্যতিরেকে কুত্রাপি তোমার নিধন হইবে না; কিন্তু বৎস! অধিক কি বলিব, আমি তোমার

নিমিত্ত বৎপরোনাস্তি সংশয়ারূঢ় হইয়াছি, অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হয় না। তন্নিমিত্ত আমি এই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি। মহানুভব দেবদত্ত, রাজার বিষাদকারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিলেন। অনন্তর পিতার পরম হিতৈষী বৃদ্ধ সচিবের সন্নিধানে সত্বর গমনপূর্ব্বক রাজার শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রিবর কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রতকে ধীবরকুমারীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। দেবব্রত মন্ত্রিপ্রমুখাৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ সমভিব্যাহারে ধীবরসমীপে গমনপূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। রাজপুত্র আসনে উপবেশন করিলে ধীবর সমাগত রাজগণের সমক্ষে কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ, আপনার ন্যায় পুত্র আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হয়? সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যিনি আপনার সমান গুণবান্ এবং যিনি সত্যবতীর জন্মদাতা, তিনি বারংবার আমার নিকট ভবদীয় পিতার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজাই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। মহর্ষি পরাশর সত্যবতীর নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া সেই অসিতাঙ্গ মুনীন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি কন্যার পিতা, অতএব একটি কথা বলিব। হে পরন্তপ! বোধ হইতেছে, এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে অতি ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্জ্বলিত হইবে; কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ হইলে কি সুর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, যে কুলসম্ভূত হউক না কেন, সমস্ত শত্রুগণ অচিরকালমধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে

রাজকুমার! কেবল একমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে, নতুবা এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবর-বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত রাজগণসমক্ষে যথাযুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন; হে সত্যবাদিন্! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যাহা কহিবে, অবিকল সেইরূপ কার্য্য করিব। যিনি ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদিগের রাজা হইবেন। অনন্তর জালজীবী কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব কন্যার প্রভু হইলেন। সুতরাং ইহার দানেও আপনার সম্পূর্ণ অধিকার হইল, কিন্তু আমার একটি কথা শ্রবণ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আপনার নিকট ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণসমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনার অনুরূপ বটে, অতএব আমি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু যিনি আপনার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত দাসের অভিসন্ধি জানিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। আমি অপুত্রক হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন, "তোমার পিতাকেই কন্যা দান করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর দেবতা ও অপ্সরাগণ অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই যশস্বিনীকে কহিলেন,

মাতঃ! রথোপরি আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি। অনন্তর রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া রাজা শান্তনুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণ সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই দুরূহ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে দৃঢ় অধ্যবসায় দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন, হে মহাত্মন্! স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।

ভরত।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন।

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্ব্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাঁহার মূর্ত্তি বিষন্নতাপূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন, নর্ত্তকীগণ তাঁহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, সখাগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু ভরতের চির-ভরাক্রান্ত মুখখানি শ্রী-হীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্ব্বাভাস যেন তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোনরূপেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতগণ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক উত্তরে বলিল,—"হে মহাবাহু! আপনি যাঁহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুশলে আছেন।" কিন্তু গতরাত্রের দুঃস্বপ্ন ও দূতগণের ব্যগ্রতা তাঁহার নিকট একটা সমস্যার মত মনে হইল। এই দুই ঘটনা তিনি একটী দুশ্চিন্তার সূত্রে গাঁথিয়া একান্ত বিমর্ষ হইলেন।

বহুদেশ, নদনদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরশ্যামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিত কণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ যে অযোধ্যার মত বোধ হয় না, নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠধ্বনি ও কার্য্যস্রোতে প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলহলা শব্দ একান্তরূপে নিস্তব্ধ। যে প্রমোদোদ্যানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ পরিত্যক্ত। রাজপন্থা, চন্দন ও জলনিষেকে

পবিত্র হয় নাই। রথ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছুই নাই। অসংবৃত কবাট ও শ্রী-হীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে, এ ত অযোধ্যা নহে,— এ যেন অযোধ্যার অরণ্য।

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। 'চাঁদের হাট' ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ত্রিলোক-বিশ্রুতকীর্ত্তি মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অভিষেক-উৎসবে প্রফুল্ল জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন; বলয়, কঙ্কন, কেয়ূর সখীগণকে বিতরণ করিয়া অযোধ্যার রাজবধূ পাগলিনীবেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন; যাঁহার আয়ত এবং সুবৃত্ত বাহুদ্বয় অঙ্গদ প্রভৃতি সর্ব্বভূষণ ধারণের যোগ্য "সেই সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও বধূর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দনের উৎস প্রবাহিত হইতেছে। বিপণী বন্ধ, রাজপথ পরিত্যক্ত। সুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীনা কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি দ্বার প্রতিহারী-দিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে পিতার প্রকোষ্ঠে গেলেন, সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক সময় থাকেন, পিতাকে খুঁজিতে ভরত মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল্লা। পতিঘাতিনী পুত্রের ভাবী অভিষেক-ব্যাপারের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া সুখী হইতেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হৃষ্ট হইলেন। ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"সর্ব্বজীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বনবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। "অক্লিষ্টকর্ম্মা পিতার হাতের সুখের স্পর্শ

কোথায় পাইব ?” বলিয়া ভরত কাঁদিতে লাগিলেন। রাজহীন রাজশয্যা তাঁহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের মত বোধ হইল। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, “রাম কোথায় আছেন ? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাহার দাস,—সেই রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।” রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ভ্রাতার চরিত্র সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া তিনি বলিলেন—“রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, তিনি কি দরিদ্রদিগকে পীড়ন করিয়াছেন, কিংবা পরদারে আসক্ত হইয়াছেন ?—এই নির্ব্বাসনদণ্ড কেন হইল ?” কৈকেয়ী বলিলেন—“রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।” শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজশ্রী-কামনায় কৈকেয়ী যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা বলিয়া পুত্রের প্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই দুঃসহ সংবাদের মর্ম্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মাতাকে যে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহা তাঁহার মহাত্মতার স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী মনে করি। “তুমি ধার্ম্মিকবর অশ্বপতির কন্যা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষসী। তুমি আমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন কর।” যখন কাতর কণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্যা সুমিত্রাকে বলিলেন—“ভরতের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, সে আসিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।” কৃশাঙ্গী সুমিত্রা ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, “তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন, তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দেও।” এই

কটূক্তিতে মর্ম্মবিদ্ধ ভরত কৌশল্যার নিকট অনেক শপথ করিলেন, তিনি এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না,—বহুপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া নিদারুণ শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিজের প্রতি অজস্র অভিসম্পাতবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং কথা বলিবার উত্তেজনায় ও দারুণ শোকে মুহ্যমান হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণাময়ী অম্বা কৌশল্যা ধর্ম্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন—তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরতের শোক ও ঔদাসীন্য ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। শ্মশানঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি প্রিয় পুত্রদ্বয়কে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথায় যাইতেছেন?" অশ্রুপূর্ণ-কাতরদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না করিতে করিতে পিতার ঔর্দ্ধ-দৈহিক কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন; শোকবিহ্বলতায় ভরত নিজে একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিল, ভরত পাগলের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। "ইক্ষ্বাকু বংশের প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার বন্দনা-গীতি গাহিতেছ?" রাজমৃত্যুর চতুর্দ্দশ দিবস বশিষ্ঠ-প্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভরত বলিলেন—"রামচন্দ্র রাজা হইবেন, অযোধ্যার সমস্ত প্রজামণ্ডলী লইয়া আমি তাঁহার পা' ধরিয়া সাধিয়া আনিব; নতুবা চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আমিও বনবাসী হইব।"

শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মারিতে গেলেন এবং কৈকেয়ীকে তর্জ্জন করিয়া অনুসরণ করিল, ক্ষমার অবতার ভরত তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। শৃঙ্গবের

পুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাম একটু জলপান করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃণশয্যা রামের বিশাল বাহু-পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরীয়প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, গুহক কথা বলিতেছিল, ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,— রাণীগণের এবং সচিববৃন্দের শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহু যত্নে ভরত জ্ঞানলাভ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন—"এই নাকি তাঁহার শয্যা, —যিনি আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত— যাঁহার গৃহ পুষ্পমালা, চিত্র ও চন্দনে চিরানুরঞ্জিত,—যে গৃহশিখর নৃত্যশীল শুক ও ময়ূরের বিহারভূমি ও গীতবাদিত্র শব্দে নিত্যমুখরিত ও যাহার কাঞ্চনভিত্তিসমূহ কারুকার্য্যের আদর্শ,—সেই গৃহপতি ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া ইঙ্গুদীমূলে পড়িয়াছিলেন. এ কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্য। আমি কোন্ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবল্কল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবন যাপন করিব।"

এবার জটাবল্কলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন। এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মুনির নির্দ্দেশানুসারে রাজকুমার চিত্র-কূটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে চিনিতে চাহিলেন। ভরত এইভাবে মাতাদিগের

পরিচয় দিলেন, "ভগবন্, ঐ যে শোক এবং অনশনে ক্ষীণদেহা সৌম্যমূর্ত্তি দেবতার ন্যায় দেখিতেছেন, ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের মাতা, উঁহার বামবাহু আশ্রয় করিয়া বিমনা অবস্থায় যিনি দাড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুষ্কপুষ্প কর্ণিকার তরুর ন্যায় শীর্ণাঙ্গী—ইনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা,—আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা প্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা—এই দুর্ভাগ্যের মাতা।" বলিতে বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় একবার জলভরা চক্ষে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আম্র ও লোধ্রদল পক্ক হইয়া শাখাগ্রে দুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোন অংশ ক্ষতবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিম্ন অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্ভারে প্রমোদ-উদ্যানের ন্যায় সুন্দর, কোথাও পর্ব্বত-গাত্র হইতে একটিমাত্র শৈলশৃঙ্গ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়া আছে—অদূরে মন্দাকিনী,—কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে বিলীয়মান। তরঙ্গরাজি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বস্ত্রের ন্যায় বায়ু কর্ত্তৃক ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, কোথাও পার্ব্বত্য ফুলরাশি স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতেছিল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন—"রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাধা জন্মাইতেছে না, আমি এই পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলীর নির্ম্মল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেছি।"

এই কথা শেষ হইতে না হইতে সহসা বিপুল শব্দে নভঃপ্রদেশ আকুল হইয়া উঠিল, সৈন্য-পদোত্থিত ধূলিজালে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল শব্দে

পশুপক্ষী চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সত্রস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়ার জন্য এই বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ শ্বাপদের আগমনে এই সৌম্যনিকেতনের শান্তি এ ভাবে বিঘ্নিত হইতেছে?" লক্ষ্মণ দীর্ঘপল্লবিত শালবৃক্ষের অগ্রে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বদিকে সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হউন।" "কাহার সৈন্য আসিতেছে, কিছু বুঝিতে পারিলে কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন, "অদূরে ঐ যে বিশাল বিটপী দেখা যাইতেছে, উহার পশ্চাতে ভরতের কোবিদার-চিহ্নিত রথধ্বজ দেখা যাইতেছে— অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হয় নাই, নিষ্কণ্টকে রাজ্যশ্রী লাভ করিবার জন্য ভরত আমাদিগের বধসঙ্কল্পে অগ্রসর হইতেছে, আজ এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "ভরত আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিতেছে। সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরস্নেহপরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্নেহাক্রান্তহৃদয়ে পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগের উদ্দেশে আসিতেছে, তুমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই, তুমি তাহার প্রতি কেন ক্রূর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যদি রাজ্য-লোভে এরূপ করিয়া থাক, তবে ভরতকে বলিয়া আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়াইব?" ধর্ম্মশীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিছু পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অনশনকৃশ ও শোকের জীবন্তমূর্ত্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের

ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন—"হেমছত্র যাঁহার মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী উজ্জ্বল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু দ্বারা মার্জ্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগ-বিরহিত কান্তি ধূলিধূসর। যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের আরাধনার বস্তু, তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,—আমার জন্যই তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ এই লোকবিগর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্।"—বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মাথায় জটাজুট, দেহে চীরবাস। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুণ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক অঙ্কে টানিয়া লইলেন; বলিলেন,—"বৎস তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।"

ভরত জ্যেষ্ঠের পদতলে লুটাইয়া বলিলেন,—"আমার জননী মহাঘোর নরকে পতিত হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার ভাই,—আপনার শিষ্য,—দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল;—ভরত বলিলেন "আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইব, প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্ত্তব্য।" কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া কুটীরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জটাভার শোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটের স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন,

"রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব; সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" অযোধ্যার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ভরত বলিলেন, "অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।" নন্দিগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কলপরিহিত ফলমূলাহারী রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন, তাঁহারা সকলে কষায়বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কষায়বস্ত্রপরিহিত, সচিববৃন্দপরিবৃত ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন।

ভরতের এই বিষণ্ণ মূর্ত্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। যখন সীতাকে হারাইয়া তিনি উন্মত্তবেশে পম্পাতীরে ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,—এই পম্পাতীরে রমণীয় দৃশ্যাবলী সীতার বিরহে ও ভরতের দুঃখ স্মরণ করিয়া আমার রমণীয় বোধ হইতেছে না।" আর একদিন লঙ্কায় রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিয়াছিলেন, "বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইব?"

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই পাদুকাদ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর। চতুর্দ্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে।"

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য্য সমর্থন

করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, "কোন কোন জলজন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যপাত করিতেছে। দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন, রাম হইতেও ধর্ম্মবলে ইহাকে অধিক বলিয়ান্ জ্ঞান করিও।" কৈকেয়ীর সহস্র দোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি; যখন মনে হয়, তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিশাদাধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে পারি,—"অযত্নাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি ধন্য, জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না।"

বিলাতের পথে।

(স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।)

জাহাজ ছাড়িল। যতক্ষণ তোমাদিগকে তীরে দেখা গেল, ডেকে দাঁড়াইয়া তোমাদের দিকে নিস্পন্দনয়নে চাহিয়া রহিলাম। যখন আর তোমাদিগকে দেখা গেল না, তখন ডেকের মাঝখানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। প্রিয় মাতৃভূমি, প্রিয়তর বন্ধুবর্গ, প্রিয়তম পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী ত্যাগ করিয়া একাকী অসহায় অবস্থায় কোথায় যাইতেছি—মনে করিয়া হৃদয় চঞ্চল হইতে আরম্ভ হইল, উচ্ছ্বাসময়ী চিন্তায় প্রাণ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। অতীতের সুখময়ী স্মৃতি, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ ঘটনা, ভবিষ্যতের আঁধারময়ী আশা ও অনিশ্চিততায় মন দোলায়িত হইতে লাগিল। উদ্বেগ সম্তাড়িত হৃদয়ে, বিষাদপ্লাবিত অন্তরে, কখন বা শূন্য মনে, লক্ষ্যহীন নয়নে গঙ্গাতীরস্থ হর্ম্ম্য, তরু বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র ও গঙ্গার নীল জল—ইহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

দেশ ছাড়িতে কাহার না মায়া হয়? যাহাদের স্বদেশে নিরাশার অন্ধকার, বিদেশেই আলোক, স্বদেশে বিতৃষ্ণা, বিদেশেই অনুরাগ, যাহাদের স্বদেশে স্নেহবন্ধন পরিবার নাই বা শান্তির আধার স্বপ্নময়, সুখস্মৃতিময় বাস-নিকেতন নাই, যাহাদের হৃদয় অস্থির বা চিরবিষণ্ণ, তাহাদের দেশ ছাড়িতে মন অবসন্ন না হইতে পারে, অশ্রুজলে চক্ষু না ভিজিতে পারে। সুখের বিষয়—এ জগতে সেরূপ লোক অতি বিরল। টাইমনের ন্যায়, ডায়োজিনিশের ন্যায়, বাইরণের ন্যায়, সকলেই সংসারের প্রতি বিদ্বিষ্ট নয়। সুখের বিষয়, অনেকের স্নেহের কেন্দ্র, শান্তির নির্ঝরিণী, প্রীতির মূলাধার প্রিয় পরিবার আছে, অতীত-স্মৃতি-বিজড়িত

বাসস্থান আছে। সুখের বিষয়, সকলেই জাতির প্রতি নির্ম্মম নয়, স্বদেশের প্রতি নিরনুরাগ নয়।

জাহাজ চলিতে লাগিল। বাড়ী, মাঠ, বন, উপবন, জলাশয় একে একে সব অদৃশ্য হইল। প্রথম দিন "হীরা বন্দরে" (Diamond Harbour-এ) জাহাজ নঙ্গর করিল। পরদিন সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; ভারত অদৃশ্য হইল, হৃদয় আরও উদ্বেলিত হইল। সমস্ত দিন জাহাজ চলিল—হর্ষ বীরদর্পে সমুদ্রবক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া চলিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিজয়া-দশমীর অপরাহ্নে পবিত্র-প্রতিভা প্রতিভাসিত, দুঃখ-ভারাবনত প্রতিমার ন্যায়, হর্ষ-বিষাদ-জড়িত সুন্দর মধুর আয়াস-সূর্য্য সাগর-সীমায় ঢলিয়া পড়িয়া বিলীন হইয়া গেল। আমি বাহিরে অন্ধকার দেখিলাম, মনের ভিতরেও যেন একখানি কাল মেঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। কাতর হৃদয়ে, সজল-নয়নে, প্রেম-প্লাবিত অন্তরে, যে দিকে ভারত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সে দিকে চাহিয়া আমার জীবনের ধাত্রী, শৈশবের দোলা, ভালবাসার চিরপাত্রী ভারত-জননীর নিকট বিদায় লইলাম।

জাহাজ চলিল। রাত্রে ছাদে, অর্থাৎ 'ডেকে' শুইয়াছিলাম; মধ্য-রাত্রে বাতাস একটু প্রবল হওয়ায় সমুদ্র শীঘ্রই তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে জল কখন কখন 'ডেকে' উঠিতে লাগিল। আমি ঘুমাইয়াছিলাম; সমুদ্রের মধুর-গম্ভীর গর্জ্জনে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাজের কলের শব্দ সমুদ্র-গর্জ্জনের সহিত মিশিয়া সেই মধ্যরাত্রে, সে নির্জ্জন প্রদেশে যে কিরূপ ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমি সম্পূর্ণ জাগি নাই, সকলই স্বপ্নশ্রুতবৎ বোধ হইতে লাগিল। সে তরঙ্গোচ্ছ্বাস শব্দটি বড় সুন্দর, বড় গম্ভীর, বড় কবিত্বময়; না শুনিলে অনুভব করা যায় না; আর শুনিতে শুনিতে সেই অর্দ্ধ-ঘুমন্ত অবস্থা!

তাই, মানবের কৌশলকে ধন্যবাদ দিলাম—যাহা দ্বারা মনুষ্য নিশীথের অন্ধকারে, জনহীন প্রদেশে, তরঙ্গময় সাগরের মধ্য দিয়া, একাকী নিঃসহায়ে অথচ নির্ভয়ে সাগর-হৃদয় বিদলিত করিয়া, দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে। মনে অহঙ্কার হইল যে, আমি দীন, হীন, পরাধীন বাঙ্গালী হইলেও মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারি।

জাহাজ ছয় দিন অশ্রান্ত চলিল। সপ্তম দিনে লঙ্কা দ্বীপে, "গল" বন্দরে (Galle) নঙ্গর করিল। বৈকালে তীরে গেলাম; একখানি গাড়ী করিয়া নগরের মধ্যে বেড়াইয়া আসিলাম। "গল" নগরটি বড় সুন্দর। একটি 'ক্যাথলিক' গির্জ্জা আছে, একটি দুর্জ্জেয় দুর্গ সমুদ্রমুখী হইয়া রহিয়াছে। বীর দর্পে, শত্রুর পরাক্রমকে তুচ্ছ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে; অধিকাংশ বাড়ীই ছোট, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নগরটি শৈলময়। গণ্ড শৈলের কোলে অনেকগুলি বাড়ী আছে। সেই শৈলের শিখরদেশ লঙ্কাজাত তরু-লতা সুশোভিত। গাছের মধ্যে নারিকেল-জাতীয় গাছ, দারুচিনির গাছই প্রধান। অন্যান্য গাছও আছে, যেমন—লবঙ্গ গাছ, সুপারী গাছ। তরু-লতা-সমাবৃত শৈলরাজিই "গলের" অতুল ভূষণ। সমুদ্রের তীরে, সেই শৈলময় স্থানে কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতে পারিলে হয়ত ইহলোকে শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। সেখানকার গুটিকতক স্ত্রীলোক দেখিলাম। তাহাদের বেশ বাঙ্গালী রমণীদের অপেক্ষা অনেক সভ্য ও সুন্দর। তাহারা দেখিতেও বেশ। গাড়ী চড়িয়া যাইবার সময়ে তাহারা দ্বার রুদ্ধ করে না। পথে সুবেশা রমণী একাকী চলিয়া যাইতেও শঙ্কিত হয় না। ইহাতে বোধ হইল যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা বঙ্গদেশ অপেক্ষা এখানে অনেক বেশী। পুরুষ মানুষ দেখিলে এক হাত ঘোম্‌টা টানিয়া রাস্তার ধারে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায় না; এবং রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া

পুরুষের দিকে 'উকিঝুকি'ও মারে না। সবাই বেশ স্বাধীন, নির্ভয়, সানন্দ। স্বামী স্ত্রী পথে একসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া যায়। য়ুরোপীয় সভ্যতা এখানে বোধ হয় অধিক প্রবল। কারণ, অনুসন্ধানে জানিলাম যে, এখানে অনেক লোক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আলোক এখানে প্রবেশ করে নাই। হিন্দু-ধর্ম্মের পৌরাণিকী কথা তাহারা বড় জানে না। এমন কি, অনেকে বিশ্বাসই করে না যে, লঙ্কা দ্বীপে একদিন রাবণ নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিল। তাহাদের অনেকের বিশ্বাস যে, তাহারা চিরকালই বৌদ্ধ আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতাকা একদিন এখানে উড়িয়াছিল। এখনও অধিকাংশ লঙ্কাবাসী বৌদ্ধ।

* * * * *

"স্বর্ণ-কিরীটিনী" লঙ্কা আজিও স্বর্ণ-কিরীটিনী। ভারতেরই মত শোভাময়ী, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যশালিনী; কিন্তু দুইজনেই আজ পরের পদানত, আহারের জন্য পরের দ্বারে ভিখারিণী।

জাহাজ লঙ্কা দ্বীপ ছাড়িল। আবার সমুদ্র-হৃদয় বিদারণ করিয়া সাহঙ্কারে সগর্ব্বে, সানন্দে চলিল। অনন্ত জলধির মধ্যে আমরা একাকী রহিলাম। জাহাজ আবার এক সপ্তাহ অশ্রান্তভাবে চলিল। চারিদিকেই জল ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরে অনন্ত প্রসারিত নীলাকাশ, পদতলে দিগন্তবিসর্পী ক্রীড়াময় সিন্ধু, দৃশ্যটি বড় সুন্দর বটে! কিন্তু প্রতিদিন এবং সারাদিন এক জিনিষ দেখিতে দেখিতে, মেজাজ বড় ঠিক্ থাকে না। তাই আমারও মেজাজ চটিয়া গেল।

* * * * *

ক্রমে আমরা 'পীরমে' আসিয়া পৌছিলাম। 'পীরম' স্থানটি দেখিতে

বড় অনুর্ব্বর, কিন্তু তথায়ও বৃটনের পতাকা উড্ডীয়মান। বন্দরে তিন দিক ইটের রংএর পাহাড়-বেষ্টিত। মধ্যের জল ঘোর হরিৎ, বাহিরের জল অবশ্য ঘোর নীল। বোধ হয়, যেন সাগরের জল বন্দী হওয়াতে ম্লান ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এ স্থানটি অধিকার করিবার জন্য ফরাসী জাতির কতকগুলি পোত এখানে আসিবার সময়ে 'এডেনে' থামে (Halt করে)। এডেনের গভর্ণর তাহাদের একটা ভোজ দেন এবং সেই সূত্রে তাহাদের উদ্দেশ্য জানিতে পারেন। সেই দিনই গভর্ণর 'পীরমে' রণপোত পাঠাইয়া স্থানটি অধিকার করিয়া রাখেন। পরদিন ফরাসীরা সেখানে গিয়া দেখে "ব্রীটিশ পতাকা" উড়িতেছে! তখন উহা অধিকার করিতে গেলে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বিগ্রহ হয়। এই-রূপে বৃটন 'পীরম' অধিকার করে।

* * * *

আমরা লোহিত সাগরে চলিয়াছি। তুমি বলিবে, ইহার আর আশ্চর্য্যটা কি? কিন্তু কেবল যাহা আশ্চর্য্য তাহাই যে বলিতে হইবে এমন ত কোন কথা নাই। জাহাজ ছাড়িবার পর আমরা মাথায় হাত দিয়া দেখি যে, মাথাটা পাথুরিয়া কয়লার খনি হইয়া বসিয়া আছে; নাকে হাত দিয়া দেখি, মণ-খানেক কয়লা সেখানে প্রশান্তভাবে বাসা করিয়া আছে। ঘোর বিপদ। কিন্তু এ বিপদ সকলেরই। সকালে স্নান করিলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আবার জাহাজের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

সমুদ্রে চাঁদের উদয় দেখি নাই। একদিন রাত্রে সহযাত্রিগণ সব আমোদপূর্ণ গল্পে সময় কাটাইতেছিলেন। তাহাতে যোগ দিবার প্রবৃত্তি না থাকায়, আমি জাহাজের পিছনে গিয়া বসিলাম। তখন চাঁদ উঠিতেছে।— সমুদ্রের কিনারায় লহরীময়ী নীলিমা-প্রান্তে, স্নিগ্ধ লোহিত

গরিমায়, প্রশান্তভাবে চাঁদখানি দেখা দিল। মধুর-স্নিগ্ধজ্যোতিঃ, প্রেমময় চন্দ্রমার উদয়ে, সমুদ্রের শান্ত হৃদয় মৃদুল সমীর-সন্তরণে দোলায়িত হইতে লাগিল। প্রেমিকের মধুর আগমনে, প্রণয়ীর মধুরতর সম্ভাষণ-চুম্বনে সিন্ধু চঞ্চল হৃদয়ে, প্রেমপূর্ণ অন্তরে, চুম্বনের প্রতিদান করিল। এ চুম্বন কি সুন্দর! অপ্সরা-কণ্ঠ-গীতিবৎ, "ইয়োলিয়"—বীণাঝঙ্কারবৎ স্নিগ্ধ ও মধুর! সুন্দর জিনিষ সুন্দর, কিন্তু সুন্দর জিনিষের সম্মিলন শতগুণ মধুর। পূর্ণ বিকশিত প্রভাত-সমীর-সেবিত গোলাপ লাবণ্যময়, পবিত্র নীহারও অতি রমণীয়; কিন্তু উভয়ের সম্মিলন কি শতগুণ মধুর নহে? আকাশরত্ন চন্দ্রমা বড়ই সুন্দর, প্রশান্ত, গম্ভীর; সমুদ্রও অতি মনোহর। কিন্তু উভয়ের সম্মিলন না হইলে যেন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না, মাধুর্য্যের সফলতা হয় না। সম্মিলনের জন্যই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। এ জগৎ সৌন্দর্য্যের বিবাহস্থান, লাবণ্যের মঙ্গল-মন্দির! লাবণ্যের সমাগম প্রকৃতিরই অভিপ্রায়।—নয়?

* * * *

লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে আরব ও আফ্রিকার মরুময় প্রদেশ দেখিতে পাইলাম। তাহার জন্য লোহিত সাগর বড় গরম। কিন্তু আমাদের সময়ে বেশ বিপরীত বাতাস বহিতেছিল। একটু বাতাস প্রবল হওয়াতে সমুদ্র ফেনময় হইল ও জাহাজ দোলাইতে লাগিল। অধিকাংশ রমণীর "সমুদ্র পীড়া" হইল, আমারও হইল। ইহা হইতে অবশ্য এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই যে, আমার ধাতু ও প্রকৃতি রমণীর মত। "সমুদ্র পীড়াটা" কি প্রকার জান?—বোধ হয়, যেন মাথাটা লাটিমের মত ঘুরিতেছে; পা'দুখানা কখন আকাশের দিকে, কখন নীচের দিকে যাইতেছে। যেন পেটের মধ্যে বোল্‌তা ডাকিতেছে; আর, গলার কাছে যেন ফোয়ারা উঠিবার

চেষ্টা হইতেছে। আমি অনেকবার মাথায় হাত দিয়া দেখিতে লাগিলাম—সেটা ঠিক আছে কি না! এই প্রকারে আমরা ক্রমে সুয়েজ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সুয়েজ-খাল দিয়া জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের গতি অবশ্য খুবই ধীর, সঙ্কুচিত ও শঙ্কাকুল। কারণ, অবশ্য বুঝিতে পার,—ঠিক একখানি জাহাজ যাইবার পথমাত্র আছে; দুখানি জাহাজ পাশাপাশি হইয়া যাইতে পারে না। অতএব, একখানি জাহাজ আর একখানির পিছনে, সেখানি আর একখানির পিছনে,—এইরূপে জাহাজ চলে। মধ্যে মধ্যে খালটি একটু প্রশস্ত আছে; সেখানটা বিপরীতগামী জাহাজদ্বয়ের পাশ কাটাইয়া যাইবার জন্য। দুই এক জায়গায় হ্রদের ন্যায় খুব প্রশস্ত। মধ্যে মধ্যে ষ্টেশন আছে। খালটি দেখিতে মোটেই ভাল নহে। লোকে এইটিকে ফ্রেঞ্চদের খুব কীর্ত্তি বলিয়া থাকে। ইংরেজেরা এই খাল কাটিবার প্রস্তাব করিয়া কাটিতে পারিল না,—বড় খরচ। ফ্রেঞ্চরা পরে অনেক টাকা খরচ করিয়া শেষে কাটিল। অবশ্য ইহাতে ফ্রেঞ্চ ইঞ্জিনিয়ারের খুব বাহাদুরী বলিতে হইবে।

খালটি প্রায় ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ। জাহাজ সমস্ত দিন রাত্র মন্দ মন্দ চলিল। পরদিন বেলা ৯টার সময়ে সায়েদ বন্দরে নঙ্গর করিল। তীরে নামিলাম। সাহেবদের সহিত বেড়াইতে ও নগর দেখিতে গেলাম। এ স্থান মূর্ত্তিমতী অপবিত্রতা। নগরটা দেখিতেও মোটেই ভাল নয়। ময়লা রাস্তা, শ্রীহীন বাগান, শোভাহীন বাড়ী,—এ নগরের ভূষণ! তবে খুব দোকান আছে! প্রতি দোকানে সুসজ্জিতা রমণী আছেন; রাস্তায় গাঁট কাটিবার ভয় আছে; এমন কি রৌপ্যময় একগাছি চেনের অধিকারীর পর্য্যন্ত প্রাণের ভয় আছে; কোলাহল আছে; সৌন্দর্য্যহীন, উল্লাসহীন, গম্ভীরমুখ পুরুষের বহুল সমাগম আছে। সুয়েজখালে

প্রবেশ করিবার আগে, সুয়েজ বন্দরের অসীম পাহাড়ময়ী বেষ্টনীর সৌন্দর্য্য আমার ভাল লাগিয়াছিল।

*   *   *   *

"The Magic-car moved on."—ঐন্দ্রজালিক বাষ্পজান চলিতে লাগিল, আমরা ভূমধ্য-সাগরে;—ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যস্থলে। সায়েদ-বন্দর ছাড়াইবার একটু পরেই একটু একটু শীত বোধ হইতে আরম্ভ হয়, বেশ তরঙ্গোৎক্ষেপী, পোতান্দোলী, শীতবর্ষী বাতাস বহে; জাহাজ চলিতে লাগিল; শরীরটিও মন্দ মন্দ দুলিতে লাগিল; মস্তক ও উপায়ান্তর অভাবে শরীরকে অনুকরণ করিল; এবং সমুদ্রজনীন পীড়ার আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপ ঘটনা সমুদায় যে আমার খুব সুখকর হয় নাই এবং কাহারও হয় না সেটা বেশ বুঝিতে পারি; যাহা হউক, জাহাজ চলিতে লাগিল। এই ভূমধ্য-সাগর ঐতিহাসিক স্মৃতিময় উন্নত জগতের পরাক্রান্ত সভ্য জাতির বিচরণ-স্থান। রোমরাজ্য, গ্রীস, কার্থেজ, এই সাগরের প্রান্তে অবস্থিত। এখান দিয়া রোমীয়, গ্রীসীয়, কার্থেজীশ, সমর-পোত যাতায়াত করিত। এই স্থান দিয়া, একদিন বাণিজ্যের লীলাক্ষেত্র ভেনিস দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্য-পোত প্রেরণ করিত। রোম, ভেনিস্, কার্থেজ, এথেন্স, স্পার্টা—আজ সে সব কোথায়?

*   *   *   *

*   *   আমরা চলিলাম, বামে কার্থেজ ও আলেক্জাণ্ড্রিয়া, দক্ষিণে ফ্লোরেন্স ও রোম, পশ্চাতে এথেন্স্ ও স্পার্টা। এক দিকে আফ্রিকা ও অপর দিকে ইউরোপ—পশ্চাতে এসিয়া রাখিয়া, ভূমধ্য-সাগর দিয়া চলিলাম্। অবশেষে জিব্রাল্টার-পোতাশয়ে উপনীত হইলাম। পথিকের দর্শন-পথের এইটি প্রথম ইউরোপীয় নগর। দূর হইতে নগরটি দেখিতে বড় সুন্দর,—যেন একটি ছবি! ঠিক সাগরের উপর

নগরটি। থাক্ থাক্ বাড়ীগুলি—পাহাড়ের কোলে। উপরে কামানময় পাহাড়, নীচে নীল সাগর; বড় সুন্দর। জিব্রাল্টার পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় অজেয়তম দুর্গ। চারি বৎসর পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়াও ইহাকে কেহ অধিকার করিতে পারে নাই। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা ইংরেজদের হাতে আছে। ইংরেজেরা * * এই দুর্গ হস্তগত করিয়াছেন। * * ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে এ দুর্গ মুরদের হাতে ছিল। এখানে রোমীয় অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য বোধ হয়, ইহা রোমীয়দের হাতেও কিছুদিন ছিল। ইতিহাসেও ইহার উল্লেখ আছে। ইহার গহ্বরে মানুষের হাড় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে পুরাকালের,—তাহাদিগের বয়স ঠিক হয় নাই। এখানে মর্কট খুব দেখা যায়, যদিও স্পেনের অন্য কোন স্থানে সে জানোয়ার দেখা যায় না। আর অনেক আফ্রিকাজাত জন্তু (যাহা ইউরোপে কখন দেখা যায় না।) তাহাও দেখা যায়। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, ইউরোপ ও আফ্রিকা একদিন এই স্থানে যুক্ত ছিল, পরে বিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এ সব আমি দেখি নাই, কিন্তু পড়িয়াছি।

জিব্রাল্টার জগতে সঙ্কীর্ণতম প্রণালী, ইহা ইংরাজদের হস্তগত থাকাতে ভূ-মধ্যসাগরে যাতায়াত তাহাদের হস্তে। একদিকে জিব্রাল্টার, অপরদিকে লোহিতসাগরের উপকূলস্থ এডেন তাহাদের হস্তে। এতএব ভারতে অন্য জাহাজের যাতায়াত অনেকটা তাহাদের ক্ষমতাধীন।

* * * *

জিব্রাল্টার হইতে আমরা আট্‌লান্টিক মহাসাগর দিয়া উত্তরে চলিলাম। আফ্রিকার সীমা অতিক্রম করিয়া, পর্টুগালের কূলস্থ পাহাড় নগর, বন ও উপবন দেখিতে দেখিতে চলিলাম। টেমস্ নদীর সাগর-সঙ্গম দেখিতে পাইলাম। দেখিতে দেখিতে ক্রমে জাহাজ বিস্কে

উপসাগরে উপনীত হইল। বিস্কে নাবিকদের বড় ভয়ের স্থান। এখানে অনেক জাহাজ জলমগ্ন হয়, এখানে কত হতভাগ্য নরনারীর সমাধি হইয়াছে সংখ্যা নাই।

বিস্কের সেই প্রবল বাতাস বহিল। সাগরের আবার সেই তরঙ্গ, সেই গর্জ্জন, সেই গম্ভীর সৌন্দর্য্য! নাবিকেরা উচ্চতানে তাহাদের সাগরিক-গান ধরিল। বাতাসের প্রাবল্যের সহিত তাহাদের উচ্চতান উচ্চ হইতে উচ্চতর উঠিতে লাগিল। নাবিকদের সে গানে, কি এক রকম অপার্থিব মাধুর্য্য, স্বপ্নময় স্বাধীন আনন্দ, বৃটনজাতি-সম্ভব পরাক্রম-ভাব জড়িত আছে, শুনিলেই বড় আনন্দ হয়। রণবাদ্যের মত, সে গানে হৃদয় নাচিয়া উঠে। ঢেউয়ের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে জাহাজ চলিতে লাগিল। "The Magic car moved on" হৃদয়ে অভূত-পূর্ব্ব ভয়-জড়িত আনন্দ হইতে লাগিল। বিপদের ছায়া না থাকিলে আনন্দের মহত্ত্ব কোথায়?

ভাবিলাম—আমি আজ ইউরোপের নিকটে,—সভ্যতার রঙ্গভূমি, স্বাধীনতার বিচরণ স্থান, বীরত্বের লীলাক্ষেত্র, ইউরোপের কূল-প্রক্ষালী এট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে। ইতিহাস-পঠিত স্পেন, ফ্রান্স, বৃটন, আজ আমার দক্ষিণে বা অগ্রে বিস্তৃত। এসিয়ার কথা মনে করিয়া দুঃখ হইল। যে সূর্য্য একদিন ভারতে, চীনে, পারস্যে, আশিরিয়ায়, মিশরে একে একে উদিত হইয়াছিল, তাহা সেখানে অস্তমিত হইয়াছে; পূর্ব্বের রবি আজ পশ্চিমে—ইউরোপে আজ দীপ্যমান ও পূর্ণ জ্যোতিঃ; পশ্চিম-তর আমেরিকাতেও সে সূর্য্যের প্রাভাতিক কিরণ পড়িয়াছে। আমার একটা আশ্চর্য্য বোধ হইল—সভ্যতা-রবি প্রাকৃত রবির গতিরই অনুসরণ করিয়াছে। ইউরোপে দেখ, প্রথমে গ্রীস, পরে রোম, পরে ফ্রান্স, স্পেন, জার্ম্মণী ও বৃটন। মনে হইল, হয়ত এ সূর্য্য ইউরোপে অস্তমিত

হইবে, তখন আমেরিকাতে ইহার পূর্ণ বিকাশ হইবে। আবার হয়ত ঘুরিয়া এসিয়াতেও তাহার প্রভাত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে। এসিয়া একদিন সভ্যতার বিহার-ক্ষেত্র ছিল, অদ্য এসিয়া বর্ব্বরতার লীলাভূমি; একদিন সেই আলোকিত এসিয়া—আজ ভীরুতার, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিদ্রিত। এসিয়ার অবতার মনু, বুদ্ধ কনফিউসিয়স্, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য গিয়া, আজ কোর্পিনিকস্, গ্যালিলিও, লাপ্লাস্, নিউটন, হিউম, মিল, ডারউইন, গেটে ও সেক্ষপিয়র স্থান পাইয়াছে। আজ ধর্ম্মের শুষ্ক অনুষ্ঠান-গত রাজত্ব শেষ হইয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানের নবীন পতাকা আকাশে উড়িতেছে। ন্যায়, সত্য ও জ্ঞানের নবরাজ্য প্রসারিত হইতেছে। এ সব কথা মনে করিয়া আনন্দ হইল, দুঃখ হইল, আশাও হইল। রাত্রেও এই সব কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ইংলিশ-চ্যানেলে (English Channel-এ) উপস্থিত হইলাম। উত্তরে বৃটন, দক্ষিণে ফ্রান্স ও ওয়াইট্ দ্বীপ দেখিলাম। কাপ্তেন সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারতের চেয়ে ইহা দেখিতে সুন্দর কিনা। আমি উত্তর করিলাম—ভারতের সৌন্দর্য্যের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। তাহা সত্য কথা। ভারতের পদপ্রান্তস্থ লঙ্কা দেখিয়াছি; তাহাও দ্বীপ; কিন্তু কোথায় তাহার পর্ব্বত শৃঙ্গরাশি, কোথায় ইহার শুষ্ক, বৈচিত্র্যবিহীন সমভূমি উপবন; কোথায় লঙ্কার নীলাকাশ অস্তগামী রবিকর-রঞ্জিত অতুলনীয় মেঘমালা; কোথায় "ওযাইটের" কুজ্ঝটিকা-সমাবৃত ধূসর আকাশ। সত্যই তুলনা হয় না।

জাহাজ ক্রমে 'টেমস্' নদীতে আসিল। নদীতীরস্থ তরুরাজি, হর্ম্ম্য, বন দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মনে হইল—কোথায় গঙ্গা, কোথায় টেমস্; কোথায় নীলসলিলা ভাগীরথী, কোথায় কর্দ্দমাঙ্গার কণা-

কলুষিত টেমস্ নদী। অঙ্গারকণা কলুষিত কেন বলিলাম, বোধ হয় বুঝিলে। টেমস্ নদীর দুইধারে কত প্রধান প্রধান কল-কারখানা। ক্রমাগত ধোঁয়া উঠিতেছে ও নদীতে সেই কয়লার কুচো পড়িতেছে। ক্রমে 'ডকে' আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রোশ হইতে ক্রোশ বিস্তৃত 'ডকে' কত জাহাজই লাগিয়া রহিয়াছে! ইংরাজের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। ক্রমে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া, জাহাজের এক মাসের বন্ধুগণের নিকট দুঃখিত মনে বিদায় লইয়া, লণ্ডনে একটি বন্ধুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বিলাতে।

(স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল দত্ত।)

এই মহাপুরী দেখিয়া আমার প্রথম ধারণা কি হইল,—আনন্দে অধীর হইলাম, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম বা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলাম, তাহা তোমাদের জানিতে যে ইচ্ছা হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? তবে দাঁড়াও গোড়া বাঁধিয়া লই।

—কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী!
কোন্ কোন্ স্থান দেখি, কি ভাবিলা মনে—
বঙ্গসুত বিপ্রবর ভারত-ভরসা,—
লণ্ডনে, সে কোলাহলে, মনুজ-পুঙ্গব।

আমি লণ্ডনে। বৃটনের রাজধানী;—সমস্ত পৃথিবীব্যাপ্ত ইংরেজের কেন্দ্র,—সভ্যতার, বাণিজ্যের, উন্নতির, বিজ্ঞানের বিলাসভূমি;—জগতের হাস্যময়, উল্লাসধ্বনিময়, আলোকময় মন্দির; ক্ষমতার, বীরত্বের, সম্পদের গৌরবের জীবন্ত নিদর্শন; বৃটিশের জাজ্জল্যমান গরিমা,—আজ লণ্ডনে আমি। যে লণ্ডনের কথা কত পড়িয়াছি; নানা জাতির ক্রমান্বয়ে এই স্থানের প্রভুত্ব; সেক্সনের, রোমীয়ের, জার্ম্মাণের আনুক্রমিক এই স্থানে রাজত্ব; উইলিয়ম হইতে ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত বৃটনেশ্বরের এই স্থানে বাস; যাহা স্পেন্‌সারাদি কবিকুলের ধাত্রী—সেই লণ্ডনে আমি। কত সব ভূতকালের ইতিহাস—ইতিহাস-কথিত কথা মনে আসিল। সত্যই আনন্দ হইল, বিস্ময় হইল, ভক্তি হইল; বর্ত্তমানে প্রায় অবিশ্বাস হইল, ভাবিলাম—আমি সত্যই কি লণ্ডনে?

লণ্ডন বাড়ীর অরণ্য, রাস্তার 'গোলক-ধাঁধা'। আমি এখানে আসিয়া

দিশেহারা হইয়া গেলাম। বাঙ্গাল কলিকাতায় প্রথমবার আসিলে যেরূপ দিশেহারা হয়, ট্রামওয়ে থেকে পিছে মুখ করিয়া নামিতে গিয়া আছাড় খায়, গাড়ী চাপা পড়িবার উপক্রম হইলে গাড়োয়ানের নিকট সুমধুর চাবুক খায়, পথহারা হইয়া "ফ্যাল ফ্যাল" করিয়া চারিদিকে তাকানোতে, চল্‌তি লোকের কাছে রমণীয় ধাক্কা খায়, এবং বহুক্ষণ পরে বাসায় আসিয়া বিলম্বজনিত কাঠিন্য-গুণ-সমাগত ডাল ভাত খায়, আমার কলিকাতা হইতে লণ্ডনে আসিয়া প্রায় সেইরূপ দুরবস্থা হইল। যেদিকে চাই, অগণ্য বাড়ী, অসংখ্য লোকের সমাগম। প্রতি মুহূর্ত্তে রাস্তা দিয়া গাড়ী যাইতেছে, 'হুহু' করিয়া লোক চলিয়া যাইতেছে; তুমি রাজা বা রাণী হও, তোমার প্রতি দৃষ্টি, বিস্ময়ের চাহনি নাই; তুমি ভিখারী বা ভিখারিণী হও, তোমার প্রতি দয়াপূর্ণ দৃষ্টিপাত নাই। অসংখ্য লোকের ভীড়, চাকে মৌমাছির ভীড়ের মত অগণ্য; কিংবা আমি যদি মিল্টন হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম যে, সে জনতা "ভ্যালাম্বোজার" (Vallambrosa-র) ভূপতিত তরুপত্ররাশির ন্যায় ঘন ও নিবিড়।

বাড়ীগুলোর আবার এক অপূর্ব্ব রকম। দুটো বাড়ীর মধ্যে আকারে, রঙ্গে কোন বিভিন্নতা নাই। আবার এক বাড়ীতেই বিভিন্ন অংশের প্রভেদ নাই। এক রকম জানালা, এক রকম দোয়ার, আর যেন সমস্ত বাড়ীখানা নিটোল একখানা পাথরের। সাধারণতঃ এ বাড়ীগুলি কলিকাতার বাড়ীর সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনীয় নহে। প্রশস্ত বারান্দা, বিস্তীর্ণ ছাদ, শ্যাম বাতায়ন, রমণীয় উদ্যান,—এসব এখানে কিছুই নাই। তাহার কারণ কি? বিলাত যে আমাদের দেশের মত গরম নহে, তাহা বোধ হয়, তোমাদের কাছে নূতন আবিষ্কার নয়। এখানে সূর্য্য-'মাতুল' মহাশয় আমাদের দেশের মত উগ্রস্বভাবাপন্ন নহেন। এখানে তিনি বড় ওঠেনই না। আবার এখানে আমাদের দেশের মত

বসন্তের প্রাণস্পর্শী মধুর, স্নিগ্ধ বাতাস বহে না। তবে এখন বুঝিতে পারিতেছ, এখানে জানালার তত আমদানী নাই কেন, আর প্রতি বাড়ীর মাথার উপর একটি করিয়া চিমনি বা ধূমনির্গম-পথশ্রেণী কেন। একটা বাড়ীরও চতুষ্কোণ ছাদ দেখিতে পাইবে না। সব বাড়ী চিমনী-কিরীটিনী ও ধূমময়ী। জানালা সব ছোট ছোট, দুইখানি কাচাবরণা, দ্বার চিররুদ্ধ ও পশ্চাতে ঘণ্টা-সমন্বিত।

নগড়ে বড় বড় 'পার্ক' অবশ্য আছে ;—তাহা না হইলে, লণ্ডনের লোক ধোঁয়ার, জনতার ও কোলাহলের জ্বালায় ছুটিয়া পলায়ন করিত। এই উপবনগুলি রম্য, স্নিগ্ধ ও সৌন্দর্য্যময়। স্বভাবের সৌন্দর্য্যই তাহাতে অধিক লক্ষিত হয়। শিল্পের কারিকরি নাই বলিলেও চলে। তবে বসিবার সুন্দর সুন্দর নিভৃত বা গোল স্থান আছে, প্রস্তরবেষ্টিত জলাশয় আছে, দুই একটি সুন্দর বাড়ীও আছে। ফুল-টুল বড় নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ ও বিস্তীর্ণ মাঠ,—ইহাই সেই উপবনের আভরণ। সন্ধ্যায় যাও, দেখিবে—সহস্র সহস্র পুরুষ-রমণী কেহ বা বিচরণ করিতেছেন, কেহ বা বেঞ্চে বসিয়া চারিদিকে তাকাইতেছেন ; কেহ বা এখানে থাকা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, বাড়ীর দিকে নিম্নমুখে চলিয়া আসিতেছেন।

'পার্কগুলি' কলিকাতার 'ইডেন গার্ডেনের' ন্যায় সৌন্দর্য্যে ও শিল্প নৈপুণ্যে তুলনীয় নহে। তবে, দুই একটি 'পার্ক' তার চেয়েও অনেক বড়। ইডেন বাগানের কুসুমের নির্ম্মল সৌরভ, বসন্তের কবিত্বময় সমীরণ, সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শী উচ্ছ্বাস, অদূরে গঙ্গার স্মৃতিময় কলরব,—এখানে কিছুই পাইবে না। তবে যদি সন্ধ্যার কোলাহল দূরে রাখিতে চাও, চিন্তার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে চাও, যুবক-যুবতীর সমবেত সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, তবে তুমি গোধূলি সময়ে এ 'পার্কে' আসিও, নিরাশ হইবে না।

* * * *

এখন বসন্তকাল। দারুণ শীতের অত্যাচার নাই; অন্ধকারময়ী কুজ্ঝটিকা নাই। প্রভাতের তরুরাজির শুষ্ক, হাস্যহীন, পতিত, পল্লব-দৃশ্য হৃদয়কে আর ব্যথিত করে না। সন্ধ্যার কৃষ্ণা, মেঘময়ী, ধূমময়ী কাতরতা নাই। মধ্যাহ্নের বৃষ্টিজাত পথের মালিন্য নাই। সব হাস্যময়, সৌন্দর্য্যময়, উল্লাসময়।

আজ পথে পথে হর্ষধ্বনি। রাজবর্ত্মে শিশুর বালসুলভ হাস্য, উদ্দেশ্যহীন ক্রীড়া, স্থবিরেরও নিঃসঙ্গবিহার, বসন্তের আনন্দের সহিত যোগ দিতেছে। শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইতেছে, নীরব-কুঞ্জ বিহঙ্গের গীতিপূর্ণ হইতেছে, প্রান্তরে প্রান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "ডেসি" (Daisy) ও "বাটার" ক্যাপ (Butter cup) শ্বেত ও পীত সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া ইংলণ্ডকে কুসুমময়ী শোভার আধার করিয়া তুলিয়াছে।

বিলাত ভারত নহে। এখানে সে গম্ভীর মোহময়, স্বপ্নময়, স্বর্গীয় মাধুর্য্য নাই; অনন্ত মাধুরিমা পূর্ণ প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ নাই; সে ফুলের হিল্লোল নাই, বিহঙ্গের গানময় উৎসব নাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া ভারতমাতার সহিত বিলাতের কেন, অন্যান্য অনেক দেশেরই তুলনা সম্ভবে না। তথাপি বিলাতেরও সৌন্দর্য্য আছে। সেখানেও বসন্তে ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, পল্লবহীন তরুরাজি জাগে। সকল মনুষ্য-জাতি সুন্দর হইলেও বাল্যকালে সকলেরই কিছু শোভা আছে; বাল্য-কালে সকলেরই মুখ হাস্যময়, সরলতাময় ও সৌন্দর্য্যময় থাকে। বসন্ত-প্রকৃতির নবজীবনের সময় বসন্ত-প্রকৃতির শৈশব। তখন সর্ব্ব স্থানই মনোহর, উল্লাসময়, সঙ্গীতময়।

বসন্তে লিমিংটন নগরে গিয়াছিলাম। লিমিংটন (Leamington) ইংলণ্ডের প্রায় মধ্যভাগে। ইংলণ্ডের এই স্থান একটি অতি রমণীয়

স্থান। প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়। লিমিংটনে বাটী প্রায় সবই বিষণ্নতাময়, কিন্তু পথে কোলাহল নাই। নগরে ধূমময়ী শ্রীহীনতা নাই।

লিমিংটন বিলাতে একটি উৎসময় স্থান। ইহাকে ইংরেজেরা একটি সুন্দর Watering place বলিয়া থাকে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন চারিটি প্রধান স্বাস্থ্যকর উৎস আছে। সব জলই লবণাক্ত। কিন্তু তাহাতে লবণ ভিন্ন অন্যান্য স্বাস্থ্যকর উপকরণও আছে। কতকগুলি salts. কতকগুলি বায়বীয় (gaseous)। এই জল পান করিবার জন্য বিলাতের নানা স্থান হইতে পীড়িত ও তৎসহ পীড়িতের বন্ধুবর্গ আসিয়া থাকেন। এই উৎসগুলির জন্য লিমিংটন ক্রমে ক্রমে একটি ক্ষুদ্র পল্লী হইতে জনাকীর্ণ নগরে পরিণত হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন কুমারী ছিলেন, তখন অনেকবার এই স্থানে আসিতেন, এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে ইহার নাম "লিমিংটন প্রায়র্স" রাজকীয় লিমিংটন * * পরিবর্ত্তিত হয়।

* * * *

আইস ভাই! লিমিংটন হইতে অমর সেক্সপিয়রের জন্মভূমিতে চল। চল, এভন-প্রক্ষালিত-চরণা, অমর-স্মৃতিময়ী ষ্ট্রাটফোর্ড নগরীতে যাই।

শ্রান্ত পথিক! এই স্থানে দাঁড়াও! বিরামের জন্য নহে—মৃত প্রতিভার পূজার জন্য দাঁড়াও! প্রেম-বাষ্পাকুল-নয়নে, অবনত শিরে, ভক্তিভরে এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রণাম কর। এ স্থানের ধূলিকণা স্বর্ণময়, তরুলতা সঙ্গীতময়, তরঙ্গিণী কবিত্বময়, দেখ দেখি, এখানকার আকাশ গাঢ়তর নীল কি না, সূর্য্য সুন্দরতর; শান্তোজ্জ্বল কি না, চন্দ্রমা অধিকতর মধুময় কি না। দেখ দেখি, এই স্থানে সর্ব্বোচ্চ কবিত্বের জন্মস্থান হইল কেন?—বাগ্দেবীর মধুরতর ঝঙ্কারের প্রিয় স্থান

হইল কেন? সঙ্গীতের দোলা, আনন্দের লীলাস্থান, কবিত্বের ধাত্রী—এ সুন্দরী নগরী! পথিক, এ স্থানে দাঁড়াও!

ষ্ট্রাটফোর্ড লেমিংটন হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ। সেখান হইতে এখানে রেলেও যাওয়া যায়, হাটিয়াও যাওয়া যায়। এখানকার পুরবাসীদের অবস্থা সঙ্গতিপন্ন বলিয়া বোধ হইল। সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি ও প্রশস্ত রাজবর্ত্ম এখানকার শোভা। এখানকার নদী বেশ প্রশস্ত ও বেষ্টনময়ী, কিন্তু যাহা এখানকার সর্ব্বোচ্চ আকর্ষণ—তাহা সেক্ষপীয়রের জন্মভূমি ও সমাধি-মন্দির।

সেক্ষপীয়রের জন্মগৃহ "হেন্‌লি" রাস্তায়। ইহা অর্দ্ধকাষ্ঠময়, ভগ্ন গবাক্ষ, জীর্ণ সোপান, সামান্য কুটীর মাত্র। ইহার নীচে তিনটি ও উপরে দুইটি ঘর। নীচে রান্না ঘর, যাদুঘর, উপরের একটি ঘর কবির জন্মঘর। আর একটি তাহার বসিবার ঘর। বসিবার ঘরে বাতায়ন সমীপস্থ একটি টেবিল, একখানি ভগ্নার্দ্ধ চেয়ার, আর আপাততঃ জানালার উপরস্থ সেক্ষপীয়রের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি। জন্মঘরে খানকতক চেয়ার, জন্মঘরের দেওয়ালের গায়ে ও জানালার গায়ে কবি Longfellow এবং তদীয় পরিবার, প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার Sir Walter Scott এবং অন্যান্য অনেক ভুবনবিখ্যাত লোকের নাম পেন্সিলে লিখা দেখিলাম। লব্ধনামা কবি ও উপন্যাসকার, যোদ্ধা রাজনীতিজ্ঞ, ধনী ও পরিব্রাজক এই স্থান তাহাদের তীর্থভূমি করিয়াছেন। এ ভগ্ন কুটীরের প্রতি ভগ্ন গবাক্ষ স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত; প্রতি জীর্ণ কাষ্ঠাসন পবিত্র সঙ্গীতে জড়িত।

* * * *

এ কুটীরে বড় বড় লোকের সমাগম হইয়াছে। দর্শক-গ্রন্থে (Visitor's book-এ) প্রেসিডেন্ট গারফিল্ড প্রসিদ্ধতম গায়িকা মিস মেরি অণ্ডার্সন প্রভৃতি কত বিদ্বান্, কবি, গুণী ও চিত্রকরের নাম দেখিলাম,

বলিতে পারি না। কে বলে বিলাতে তীর্থ যাত্রা নাই? কে বলে বিলাতে তীর্থ নাই? সর্ব্বত্রই প্রতিভার আদর ও সম্মান আছে। তীর্থযাত্রার মূল কুসংস্কার নহে; মৃত প্রতিভার সহিত কথোপকথন। এখন ভারতে তীর্থের মহিমা বিলুপ্ত হইতে পারে, তীর্থযাত্রার প্রকৃত অর্থ চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার মূলে এই বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম। তীর্থযাত্রা ভবিষ্যতের মঙ্গল প্রার্থনীয় নহে, ইহা বর্ত্তমান পূজা-জড়িত ভালবাসার সন্তান। যখন এই ভক্তি ও প্রেম চলিয়া যায়, তখন তীর্থযাত্রা আর তীর্থযাত্রা নহে।

এই গৃহের প্রাঙ্গণে একটি কূপ আছে, একটি কুসুমশোভিত উদ্যান আছে। সেই উদ্যান হইতে গুটীকতক ফুল তুলিয়া, গৃহস্বামিনী স্মরণার্থ রাখিতে আমাকে দিলেন। তাহার পর আমি বিস্ময়ে, প্রেমে, ভক্তিভরে কুটির দেখিতে দেখিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

এস এখন সেক্ষপীয়রের সমাধি-মন্দিরে যাই। এক দিন সেই বাল্য-কালের নবীন আনন্দের হাস্য,প্রতিধ্বনিত জন্মগৃহ ও অর্থশূন্য ক্রীড়ার দোলা পরিত্যাগ করিয়া, যৌবনের আবেগময় প্রেমের লীলাস্থান এনার-কুটীর পরিত্যাগ করিয়া, চল যেখানে এক সঙ্গীতময় জীবনের অবসান সেইখানে যাই।

সেক্ষপীয়রের সমাধি-বেদী-সমীপস্থ গীর্জ্জার ভিতর, গোরের উপরে, এক পার্শ্বে, লেখনী-হস্তে কবির প্রতিমূর্ত্তি।

প্রতিমূর্ত্তির নীচে প্রস্তরের উপর নিম্নলিখিত কথা কয়টি অঙ্কিত,—

"Stay, passenger, where goes thou so fast?
Read, if thou canst, whom envious death has plast.
Within this monument, Shakespeare, with whom
Ruined nature dide (*i.e.* died) whose name doth deck
this tomb

Far more than cost : Sich (since) all that he hath writt
Serves living art, but page to serve his witt."

আরও গুটিকতক কথা লাইনে লিখিত :—

"Judicis Pyluim, genio Socratesu arte Maronem
Tersa regit, Populous maret, Olympus habet."

বিজ্ঞতায় মেয়র, প্রতিভায় সক্রেটিস, কবিত্বে, ভাজিল পৃথিবীটাকে ঢাকিয়াছে। লোকে তাহার জন্য কাঁদিতেছে। (কবিত্বের ধাত্রী আলিম্পস্ তাহাকে পাইয়াছে।) গোরের প্রস্তরের উপর অনুমানিত সেক্ষপীয়রেরই নিজের লিখিত এই কয়টি ছত্র খোদিত :—

"Good friend, for Jesus sake, forbeare
To dig the dust enclosed heare,
Blest be the man that spares these stones,
But curst be he that moves my bones."

সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, এই স্থানে অনন্ত কবিত্ব-নির্ঝরিণীর উৎস সেই মহাকবি আজ নীরবে অন্ধকারময় আগারে শায়িত। মনে যে ভাব উদিত হইল তাহা অবর্ণনীয়। অনন্ত তরঙ্গায়িত সঙ্গীত, অমর কবিত্বের বীণাময়ী ভাষা এই স্থানে নিদ্রিত। ঘুমন্ত কবিবর! যেথানে ইংরাজী ভাষা বিদিত, সেথানে তোমার নাম অশ্রুত থাকিবে না। আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার হইতে তোমার নাম গীত হইবে, দক্ষিণ মহাসাগরে তোমার নাম প্রতিধ্বনিত হইবে, সমগ্র ইউরোপ জাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া, তোমার গুণগান করিবে। আর দূরে, গঙ্গাতীরবাসী আর্য্যাবর্ত্তের শ্যামল সন্তান তোমাকে ভারতীর বর-পুত্র, কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।

সামাজিক লণ্ডন।

(মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্তাব্ বাহাদুর।)

যে দিন আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম, তাহার পরদিনই আমি প্রথমে ১নং কার্‌ল্‌টন হাউস টেরেসে (Carlton House Terrace) লর্ড কার্জ্জন মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি পরম আনন্দ অনুভব করিয়া-ছিলাম। ভারতের এই রাজপ্রতিনিধিকে ভারতবাসীরা প্রকৃতরূপে বুঝিতে না পারিয়া, তাহার সম্বন্ধে অনেক অন্যায় মত অনেকে পোষণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যে ভারতবর্ষকে কত ভালবাসিতেন এবং ভারতবর্ষের উপর তাঁহার যে কত অনুরাগ ছিল, তাহাও অনেকে জানিয়া শুনিয়াও অস্বীকার করিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহাকে দেখিতে গেলাম, তখন তাঁহাকে যেন একটু অবসন্ন দেখিলাম। শ্রীমতী লেডী কর্জ্জনও সে সময়ে অসুস্থা ছিলেন, কিন্তু কে জানিত যে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার লণ্ডন অবস্থান সময়েই তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইবেন! কে তখন ভাবিয়াছিল যে, তাঁহার জীবনকাল শেষ হইয়া আসিয়াছে! লর্ড কর্জ্জন যখন ভারতবর্ষে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করিতেন, তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া, আর এখন এই কার্‌ল্‌টন্ হাউস টেরেসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ, এই উভয়ের মধ্যে যে কত পার্থক্য, তাহা আমি এই দিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং এই পার্থক্যের স্মৃতি বহুদিন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। এই রাজনীতি-বিশারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, এখন আর নানা রকম বে-রকমের আদব-কায়দার অনুষ্ঠান করিতে হয়,না; দ্বারে শাস্ত্রী-

পাহারা নাই, পার্শ্বে শরীর-রক্ষক নাই,—সে সকল রাজ-কায়দার কিছুই নাই। দেখা করিবার সময় জানিবার জন্য যে পত্রখানি প্রেরণ করিলাম, ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি মহাশয় তাহার উত্তর তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলাম, গৃহদ্বারে লম্বিত ঘণ্টায় মৃদু আঘাত করিলাম, তাহার পরই যে ভৃত্য আসিল, তাহার হস্তে আমার কার্ড দিলাম, ভৃত্য কার্ডখানি লইয়া চলিয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। দুই তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইয়াই আমি লর্ড কর্জ্জনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম এবং তিনি পরম সমাদরে আমার করকম্পন করিলেন। কোনও রাজ-কায়দা নাই। কিন্তু ইনিই সেই রাজপ্রতিনিধি, যাঁহাকে আমি আমার যৌবনের উন্মেষ সময়ে ভারতের সর্ব্বপ্রধান আসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলাম। ইনিই সেই রাজনীতিক পণ্ডিত, যাঁহার সুমধুর ব্যবহার এবং তীক্ষ্ণ মনীষা আমাকে তাঁহার অনুরক্ত করিয়াছিল; এবং তাঁহাকে আমি আমার পরম বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। এতদিন পরে এই প্রথম সাক্ষাতে আমি সত্য সত্যই আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার পর এই লণ্ডন নগরীতে, এই ইংলণ্ডে আমি কি ভাবে চলিব, কোথায় যাইব, কাহার কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এই সকল সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; এবং তিনি যে কত লোকের নিকট পরিচয়-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। মোট কথা এই যে, বিলাতে অবস্থান-সময়ে আমাকে কি করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে তিনি আমাকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং আমার জন্য কোন প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতেও তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। ২রা জুন তারিখে লর্ড কর্জ্জন আমাকে তাঁহার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহা পারিবারিক

নিমন্ত্রণ, অন্য কোন অতিথি এই নিমন্ত্রণে ছিলেন না। এই পারিবারিক আহার সময়ে লর্ড কর্জ্জনের ব্যবহার দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম; তাঁহার কন্যাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আনন্দ করিতেছিল, লেডী কর্জ্জন সেই অসুস্থা অবস্থাতেও আমাদের কথাবার্ত্তায় আমোদ-আনন্দে হৃষ্টচিত্তে যোগদান করিতেছিলেন; লর্ড কর্জ্জন সকলের সহিতই কথা বলিতেছিলেন; এমন কি, তিনি তাঁহার সন্তানগণের শিক্ষয়িত্রীর সহিত রহস্য করিতে করিতে বলিলেন যে, লণ্ডনে এত স্থান থাকিতে তিনি সর্ব্বদাই ছেলেপিলেদের লইয়া কি কারণে হ্যাম্‌পষ্টেড হিথের দিকেই বেড়াইতে যান। এই প্রকার রহস্যালাপে মহা আনন্দে ভোজন-ব্যাপার চলিতে লাগিল। ভোজনের যে একটা বিশেষ আয়োজন ছিল, তাহা নহে,—প্রতিদিন যেমন আয়োজন হইয়া থাকে, এ দিনেও তাই। এ কথাটা বলিবার কারণ এই যে, রাজপ্রতিনিধির গার্হস্থ্য জীবনের এই অংশের সামান্য পরিচয়ও আমারা দেশে থাকিয়া পাই না, পাইবার সুবিধা হয় না। বলিতে কি, এমনভাবে পারিবারিক জীবনযাত্রা দেখিতে না পাইলে, রাজপ্রতিনিধির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমি লর্ড কর্জ্জনের পরিবারে মিশিয়া সত্য-সত্যই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; তাই এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম। লেডী কর্জ্জন মহোদয়ের সাহত এই আমার শেষ সাক্ষাৎ; কারণ, ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি অধিকতর অসুস্থা হইয়া পড়েন এবং তাহার পর ১৯শে জুলাই তারিখেই তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হয়। এই সদাশয়া ও উন্নত-হৃদয়া মহিলার সংসর্গে আসিয়া, তাঁহার ভালবাসার কোমল স্পর্শে— তাঁহার সহানুভূতির শীতল ছায়ায়, লর্ড কর্জ্জন তাঁহার জীবনের অনেক বিরক্তির ও অশান্তির সময়ে সান্ত্বনা ও প্রসন্নতা লাভ করিতেন। এতকাল পরে তাঁহার সেই

সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গিনী তাঁহাকে ফেলিয়া অকালে চলিয়া গেলেন।

লণ্ডন নগরীতে অবস্থান সময়ে আমি যে সকল ভোজে ও অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলাম, তাহার সকলগুলির বিশেষ বিবরণ প্রদান করিবার ইচ্ছা আমার নাই—তাহা বলিয়া উঠাও সহজ নহে। আমি কেবল দুইটি ভোজের সম্বন্ধে এক-আধটি কথার উল্লেখ করিব। কুইন য়্যান্স গেটে (Queen Anne's Gate সার জন ও লেডী ফিসারের ভবনে যে ভোজের নিমন্ত্রণে যাই, সেখানে অধুনা পরলোকগত লর্ড কেলভিন্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইয়া আমি বড়ই আনন্দ ও গৌরব উপভোগ করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডের মহামনীষাসম্পন্ন সম্মাননীয় বৃদ্ধ মহোদয়ের সহিত নানা বিষয়ে অনেক কথাও আলোচনা হইয়াছিল। তৎপরে একদিন মাননীয় মিঃ ও মিসেস্ সিরিল ওয়ার্ড (Mrs. Cyril Ward) আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; এই নিমন্ত্রণে যাইয়া, তাঁহার প্রেমব্রোক্ স্কোয়ার-স্থিত ভবনে তাঁহাদের পরিবারের অনেকের সহিত আলাপ-পরিচয় হয়; তাঁহাদের মধ্যে আর্‌ল্ অব্ ডাড্‌লি Earl of Dudley) একজন। অনেক সময়ে শুনিয়াছি যে, ইংলণ্ডে অতি অল্পসংখ্যক মহাশয় ব্যক্তি ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। আমার মনে হইল, লর্ড ডাড্‌লি মহোদয় সেই অত্যল্প সংখ্যার একজন; তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সে প্রশ্নগুলি নিতান্ত সাধারণ প্রশ্ন নহে; যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

৩১শে মে তারিখে লণ্ডনে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই ইণ্ডিয়া আফিসের মারফত আমি সম্রাট-সকাশে উপস্থিত হইবার জন্য একখানি

আদেশ-পত্র প্রাপ্ত হই। সেই আদেশ-পত্রে লিখিত ছিল, আমি যেন "উপযুক্ত'দরবার-পরিচ্ছদ" (Proper Durbar-dress) পরিধান করিয়া গমন করি। এই অনুরোধ সমীচীন বলিয়াই আমার বোধ হইল; কারণ, আমাদের দেশের রাজা-মহারাজারা কি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা সাহেবী-পোষাক পরিধান করিতে যতই ভালবাসুন না কেন, কোন রাজকীয় দরবারে বা মজলিসে তাঁহার জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং তাহা শোভনও বটে; বিশেষতঃ তাঁহাদের জাতীয় বা বংশ-পরম্পরায় ব্যবহৃত টুপি, পাগড়ী বা অন্য কিছু কোন মতে পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

আমি রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় বাকিংহাম্ রাজ-প্রাসাদে (Buckingham Palace) উপস্থিত হইলাম। রাত্রি দশটার পূর্ব্বে রাজসভার অধিবেশন হয় না। রাজ-প্রাসাদের অনুচরগণ পাউডার-মণ্ডিত কেশে ও রাজ-সভার উপযুক্ত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া এ দিকে ও দিকে যাতায়াত করিতে লাগিল; দলে দলে সুন্দরী ও সুবেশা মহিলাগণ এই আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদে সমবেত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের পরিচ্ছদ বহুমূল্য ভূষণের চাকচিক্যে স্থানটি মনোরম হইয়া উঠিল; রাজ-প্রাসাদের কক্ষগুলি বহুমূল্য আসবাব-পত্র ও নয়নরঞ্জন চিত্রাবলীতে সুশোভিত দেখিলাম। সম্রাটের প্রাসাদ যেমন হইতে হয়, বাকিংহাম প্রাসাদে তাহার কিছুরই অভাব দেখিলাম না। প্রাসাদের ড্রইং-রুমে বৈঠক-খানায় আমার স্বদেশবাসী আরও তিন জন ভদ্রলোককে দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম। আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, একই দিনে একই সময়ে ভারতের চারি প্রান্তস্থ চারিটি প্রদেশ হইতে চারি জন মহারাজা ভারতেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন; এ প্রকার যোগাযোগ প্রায়ই হয় না। অপর তিন জনের মধ্যে এক জন বোম্বাই

প্রেসিডেন্সীর পিপলার রাজা; দ্বিতীয় জন মান্দ্রাজের পদুকোটের রাজা, এবং তৃতীয় জন পঞ্জাবের পাতিয়ালার কুমার সাহেব। ইণ্ডিয়া অফিসের সার কর্জ্জন ওয়ালি (Sir Curzon Wyllie) আমাদিগকে ক্রমানুসারে একে একে হোয়াইট ড্রইং রুমে (White Drawing room) লইয়া গেলেন। আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদের সম্মাননীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় ফিল্ড ম্যার্সালের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহার বাম পার্শ্বে সাম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা রহিয়াছেন; সাম্রাজ্ঞী সেই দিন শোক-পরিচ্ছদ পরিহিতা ছিলেন, কারণ কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার পিতা ডেনমার্কের নরপতি পরলোকগত হইয়াছিলেন। মহামহিমান্বিত সম্রাট মহোদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আমি প্রথম যেন একটু কেমন হইয়া গেলাম। তাহার কারণ আছে; আমরা ভারতবাসী; আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃত রাজভক্তি একেবারে রক্তমাংসের সহিত জড়িত। একজন রাজভক্ত ভারতবাসী প্রজা তাহার সম্মুখে তাহার সম্রাট, সে স্বশরীরে উপস্থিত দেখিলে, তৎকালে তাহার মনে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়া থাকে, আমার মনেও সেই ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং সেই জন্যই আমি হঠাৎ কি এক ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সম্মুখে আমার সম্রাট দণ্ডায়মান—এ দৃশ্য আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে, সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমরা কেবল নতমস্তক হইব; আমরা যেন সম্রাটের করচুম্বন না করি। যখন আমাকে সম্রাটের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল এবং আমার পরিচয় প্রদান করা হইল, সে সময়টা আমার জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত বলিয়া মনে করি। প্রথমে সাম্রাজ্ঞী মহোদয়া আমার করকম্পন করিলেন এবং ২।১টি সদয় কথা বলিলেন। তাহার পর সম্রাট মহোদয় অতি সমাদরে ও সানন্দে আমার কর-কম্পন

করিলেন এবং ২।৪টি কথা বলিলেন। যদিও এ প্রকার দরবারে অধিকক্ষণ কথা বলিবার সময় নহে, সামান্য ২।১ মিনিটমাত্র সময় পাওয়া যায়, তবুও সেই সামান্য সময়ের মধ্যেই সম্রাট মহোদয় আমাকে যে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, কি জন্য তাঁহাকে সকলে য়ুরোপের রাজন্যবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণধী সম্রাট্ বলিয়া থাকে। সম্রাট্ মহোদয় যখন আমার কর কম্পন করিলেন, তখন পূর্ব্বের নিষেধ সত্ত্বেও আমি সুধু মস্তক নত করিয়াই রাখিতে পারিলাম না; সে সময়ে আমার মনের ভাব এমন হইয়াছিল যে, আমি মস্তক নত করিয়া তাঁহার প্রসারিত হস্তখানি, আমার মস্তকে স্পর্শ করিলাম। আমার এই কার্য্য দেখিয়া সম্রাট মহোদয় বিশেষ প্রীতি অনুভব করিলেন বলিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম; তিনি আমার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাস্য করিলেন।

তাহার পর, যে কক্ষে সিংহাসন স্থাপিত আছে, আমাদিগকে সেই কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল। এই কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত; কক্ষের এক পদবি একটু উন্নত স্থানে; রাজকীয় বাদক দল তখন বাদ্য-ধ্বনি করিতেছিলেন। আমরা সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইলাম; সেই সময়ে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সদলবলে যথারীতি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে রাজভবনের মহিলা ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক-গণ প্রবেশ করিলেন; সকলেই উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়া ছিলেন, মহিলাগণ সকলেই কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন; কারণ, সে সময়ে সম্রাজ্ঞী পিতৃবিয়োগের জন্য শোকপরিচ্ছদ-পরিহিতা ছিলেন। তাহার পরেই সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার পর প্রথমেই প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ সম্রাটকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন;

তৎপরে রাজপরিবারের অন্যান্য সকলে এবং বিদেশীয় রাজদূত ও প্রধান-তম কর্ম্মচারিবৃন্দ যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজ পরিবারের মহিলাবৃন্দ ও রাজভবনের অন্যান্য মহিলাগণ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন; তাহার পর বিদেশীয় রাজদূতগণের মহিলাবৃন্দ আগমন করিলেন। তাহার পরেই অন্যান্য ভদ্রলোকগণ আসিতে লাগিলেন। দরবারের পরিচ্ছদে সুশোভিতা মহিলাগণের পরিচ্ছদ বড়ই শোভন বোধ হইয়াছিল। বিদেশীয় রাজদূতগণের মহিলাবৃন্দ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী দণ্ডায়মান থাকিলেন; তাহার পর তাহারা উপবেশন করিলেন। অন্যান্য সকলের অভিবাদন গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। আমাদের সকলকেই এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল,—তবে ইহা আমাদের পক্ষে নূতন নহে। যাহাদের কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে এই প্রকারের দরবার উপলক্ষে প্রবেশের অধিকার আছে, তাঁহারা এ ভাবে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। দরবার শেষ হইয়া গেলে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সপারিষদ্ চলিয়া গেলেন; আমাদিগকে তখন পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল; সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জলযোগের বিশেষ আয়োজন ছিল। এই ভোজনস্থলে বহুদিন পরে আমি লেডি ল্যান্সডাউনের সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। ইনি যখন ভারতবর্ষে ছিলেন, তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম। ইনি তখন আমাকে ও আমার ভগিনীকে বড়ই ভাল-বাসিতেন। এখন তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে, তবুও কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে তাঁহাকে লোকে যে প্রকার সৌন্দর্য্যশালিনী দেখিয়া-ছেন, এখনও সে সৌন্দর্য্য ও সে স্বাস্থ্য অনেকাংশে অটুট রহিয়াছে।

আমি যখন সম্রাট মহোদয়ের সহিত কথা বলিতেছিলাম,—তখন

তাঁহার উচ্চারণে একটা জর্ম্মাণ টান বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম;—আমার মনে হয়, রাজপরিবারের সকলেরই উচ্চারণে ঐ জর্ম্মাণ টান বিদ্যমান। আমি দেশে থাকিতে সম্রাট মহোদয়ের যে সমস্ত রঞ্জিত চিত্র দেখিয়াছিলাম, তাহার অনেকগুলি দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছিল যে, সম্রাট মহোদয় খুব স্থূলকায় ও তাঁহার বর্ণ ধূসর, কিন্তু তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়া ত তেমন মনে হইল না।

৩রা জুলাই তারিখে, পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করিয়া, আমি ক্লারেন্স হাউসে (Clarence House) মহামান্যবর শ্রীযুক্ত ডিউক-অব-কনটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ডিউক মহোদয় যখন লণ্ডনে আসেন, তখন ক্ল্যারেন্স হাউসেই অবস্থিতি করেন, লণ্ডনে এইটিই তাঁহার প্রাসাদ। উক্ত প্রাসাদের ড্রইং রুমে যখন ডিউক মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন সেখানে তাঁহার পত্নী ডাচেস্ মহোদয়া ও তাঁহার কন্যা রাজকুমারী পেট্রিসিয়া উপস্থিত ছিলেন; ইতঃপূর্ব্বে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবারের সময় মাননীয় ডিউক ও তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; ডিউক মহোদয়ের সে কথা বেশ স্মরণ আছে, জানিতে পারিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। এমন কি, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি তাঁহাকে যে বাচ্চা হাতীটি উপহার দিয়াছিলাম, সেই হাতীর সঙ্গে যে মাহুতটি বিলাতে আসিয়াছিল, সে নিরাপদে দেশে পৌঁছিয়াছে কি না। এই প্রকার অদব কায়দা পরিপূর্ণ দেখাসাক্ষাৎ অনেক সময়েই বড় কেমন কেমন ঠেকে; কিন্তু আমি দেখিলাম যে, ব্রিটিশ রাজপরিবারের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তেমন অসুবিধা বা বাধ বাধ ঠেকে না; সময়টুকু বেশ আনন্দে কাটিয়া যায়।

১৪ই জুলাই তারিখে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ মহোদয় আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আদেশ করেন। আমি

তদনুসারে মার্লবরো হাউসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করি। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই তিনি ভারতভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অতি সদয়ভাবে এত কথা বলিতে লাগিলেন এবং এত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, সে সকল কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম; দেখিলাম যে, তিনি শুধু ভ্রমণই করেন নাই; অনেক বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন; এবং তৎসম্বন্ধে তিনি যে সকল অভিমত প্রকাশ করিলেন, তাহাতে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ ও বিচারশক্তির পরিচয় পাইয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। বাহির হইতে দেখিলে মার্লবরো হাউস তেমন সুদৃশ্য প্রাসাদ বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু এই প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ অতি পরিপাটি এবং ইহা সর্ব্বাংশেই রাজপ্রাসাদের উপযুক্ত। লণ্ডনে আমার একটা বড়ই প্রীতিকর কার্য্য হইয়াছিল, অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ানগণের অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা; অবশ্য অনেকের সঙ্গে পথে ঘাটেও সাক্ষাৎ হইত। প্রথম প্রথম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইত যে, যাহারা আমাদের দেশে লাটগিরি করিয়া অবসর গ্রহণপূর্ব্বক বিলাতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই লণ্ডনের পশ্চিম প্রান্তস্থিত এক কোণে সাধারণ কয়েকটি ঘর দখল করিয়া, নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতেছেন। লাট সাহেবদেরই যখন এই অবস্থা, তখন আমাদের দেশে যাহারা কমিশনর, কি জজ-কালেক্টারী করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই; তাঁহাদের অনেককে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হায়রান্ হইতে হয়। এই সিভিলিয়ানদিগের খোঁজ করিতে করিতে আমি বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলি মহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভ করি; ইনি যখন বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনিই বর্দ্ধমানের পরলোকগতা, মহারাজাধিরাণী মহোদয়া-

কর্ত্তৃক আমাকে দত্তকগ্রহণ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সার ষ্টুয়ার্ট অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; এবং তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় বলিয়া এখন একটুকু কুব্জ হইয়াছেন। তিনি কিন্তু আমার বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিলেন; কারণ, তিনি যখন আমাকে দেখিয়াছিলেন, তখন আমার বয়স সবে সাত বৎসর হইয়াছিল। সিভিলিয়ানগণের সহিত সাক্ষাতের আমার আর একটা সুবিধা হইয়াছিল। এখানে যে সমস্ত সিভিলিয়ান আছেন, তাঁহারা বৎসরে একবার করিয়া সম্মিলিত হন। আমি এবার রিজেণ্ট পার্কে তাঁহাদের এই সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। এখানে উপস্থিত হইয়া, আমি অনেকগুলি সিভিলিয়ান বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। আর একটি উদ্যান-সম্মিলনের কথা এই স্থানে বলিতে হইতেছে। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার চার্লস্ এলিয়ট ও লেডি এলিয়ট—উইম্‌ব্লেডেন-পার্কের ফার্ণউড ভবনে একটি উদ্যান-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। আমি তাঁহাদের ভবনে এই সম্মিলন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। বহুকাল পরে লেডি এলিয়েটের দর্শন লাভ করিয়া, আমি বড়ই সুখ লাভ করিয়াছিলাম। এখন অনেক দিন পূর্ব্বের কথা আমার মনে হইল। যখন লেডি এলিয়ট কলিকাতার বেল্‌ভিডিয়ার প্রাসাদে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন, তখন আমি বালক ছিলাম। আমি তখন তাঁহার পুত্র ক্লড এলিয়টের সহিত কত খেলা করিয়াছি, বেলভিডিয়ারের সুপ্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে আমরা দুইজন কত দিন দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইয়াছি। এত দিন পরে সেই সকল পূর্ব্বস্মৃতি আমার মনে উদিত হইল। শুনিলাম, ক্লড এলিয়ট তখন ইটনে অবস্থান করিতেছেন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের দুইটি সম্মিলনে (At homes) আমি যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। এ সকল সম্মিলনে যোগদান

আমার পক্ষে নূতন বলিয়া আমি ইহা উপভোগ করিয়াছিলাম; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এ সকল সম্মিলন যেন ঐ এক রকমের; ইহাতে বেশ স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায় না। ইহার একটী সম্মিলন ক্যাণ্টারবেরির আর্চ্চ বিশপ্ মহোদয় আহ্বান করিয়াছিলেন; অপরটি লণ্ডনের বিশপ্ মহোদয়ের আহূত। এই দুইটি সম্মিলনেই দেখিলাম যে, দলে দলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আগমন করিতেছেন; আর তাঁহাদিগকে একে একে ধর্ম্মযাজক মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হইতেছে; তাহার পর যে সকলে উদ্যানে চলিয়া যাইবেন তাহা নহে; সকলেই সেখানে ভিড় পাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পরে যাঁহারা আসিয়া অভ্যর্থিত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা দেখিতে লাগিলেন। আমার নিকট কিন্তু ইহা ভাল লাগিল না। এই পরিচ্ছেদটা ক্রমেই যেন দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; এখন একটু সঙ্ক্ষেপ করি। কেবল একটি চা-পানের সম্মিলনের কথা এই স্থানে উল্লেখ করিব। এমিস্মোর বাগানে কয়েকজন বন্ধু একটা চা-পানের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈন্যদলের যে সমস্ত ভারত সন্তান প্রতি-বৎসর সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য এদেশে আগমন করেন এবং সম্রাটের পার্শ্বচরের কার্য্য করিতে আদিষ্ট হন, সেই সকল ভারতীয় সৈনিক-বিভাগের দেশীয় কর্ম্মচারিরা এই সম্মিলনে আহূত হইয়াছিলেন। এই সম্মিলনস্থানে একটি ব্যাপার দেখিয়া খুব বিস্ময় ও আমোদ বোধ হইয়াছিল। উপস্থিত ইংরাজ-ভদ্রলোক ও মহিলাগণ এই সকল কালা-আদমীর করমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। সুধু কি তাই!—তাঁহারা এই সকল দেশীয় লোকদিগের বসিবার জন্য চেয়ার আনিয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহাদের হস্তে চুরুট প্রভৃতি প্রদান করিয়া আপ্যায়িত ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, ভারত-প্রত্যাগত এংলো-ইণ্ডিয়ান্

হুজুরেরাও এই ভাবে কালা-আদমীর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তখন আমার মনে হইল যে, এই সকল দেশীয় ভদ্রলোক ভারতবর্ষে অবস্থান-সময়ে যদি এই সমস্ত বড় সাহেবের সমীপস্থ হইবার জন্য আবেদন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল হুজুর লোকের সহিত 'মুলাকাৎ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ,—চেয়ার আগাইয়া দেওয়া বা চুরুট দেওয়া ত বহু দূরের কথা! এই ব্যাপার দেখিয়া আমার একটা পুরাতন কথা মনে হইয়া পড়িল। কিছু দিন পূর্ব্বে একদিন আমি একজন ছোটলাটের সহিত বাঁকুড়া জেলার, এক জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় তিনি কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলেন,—

"Remember Maharaja, that the Englishman at home is a different being altogether to the one out in India. It is you Indians who spoil us by your over-politeness and constant low-bowings."

অস্যার্থ—"মনে রাখিবেন মহারাজা, ভারতবর্ষে ইংরেজকে যেমন দেখেন, তাঁহারাই স্বদেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। আপনারাই ত ক্রমাগত অতিরিক্ত বিনয়-নম্র ব্যবহার এবং আভূমি-প্রণত সেলামে আমাদিগকে মাটি করিয়া দিয়া থাকেন।" বিলাতে এই দিনের ব্যাপার দেখিয়া, আমার সেই ছোটলাটের মন্তব্যটা মনে পড়িল। সে ছোটলাট এখন আর জীবিত নাই; তাঁহাকে কলিকাতাতেই সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। এই ছোটলাটই আর এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এংলো-ইণ্ডিয়ান মহাশয়েরা আমাদের দেশে রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া যখন বিলাতে উপস্থিত হন, তখন বিলাতে মোটেই স্বচ্ছন্দ ও স্বস্তি বোধ করেন না; কারণ বিলাতে তাঁহারা ত আর 'হুজুর' থাকেন

না। তাঁহাদিগকে সাধারণ দশজনের একজন হইয়া থাকিতে হয় এবং অবশিষ্ট জীবন অতি সাধারণ ভাবেই যাপন করিতে হয়। বিলাতে আসিয়া ঐ সদাশয় ছোটলাট বাহাদুরের কথাগুলির মর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম। ও সকল কথা থাকুক্। লণ্ডনটা যে কি, তাহা আমি শ্রীযুক্ত কিসার মহোদয়ের দশজন পরিবারের সহায়তায় বেশ অবগত হইতে পারিয়াছিলাম। সারজন কিসার, লেডি কিসার এবং তাঁহাদের কন্যাগণের সহানুভূতিপূর্ণ ভদ্রব্যবহার আমি চিরদিন স্মরণ রাখিব। আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, সেই সময়েই একটি কিসার-দুহিতার শুভ উদ্বাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। হ্যানোভার স্কোয়ারের সেণ্ট জর্জ্জ গির্জ্জায় এই বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল; লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের বিবাহক্রিয়া এই গির্জ্জাতেই হইয়া থাকে। আমার সিবিলিয়ান বন্ধু সিসিল কিসারের বন্ধুবৎ ব্যবহার সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব, তাঁহার ন্যায় বন্ধুলাভ আমি পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। আমি কিসার পরিবারের প্রত্যেকের নিকট নানা ভাবে কৃতজ্ঞ; তাঁহাদের দ্বারাই আমি লর্ড কেলভিন, লর্ড টুইড্ বাউথ প্রভৃতি মহারথীদিগের সৌহৃদ্যলাভে সক্ষম হইয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত, যাঁহারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিলাসী লণ্ডনের কেন্দ্র-স্থান পার্ক লেনে বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের সহিতও কিসার-পরিবারের কেহ না কেহ আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। এবার এই খানেই শেষ।

সন্ধ্যা।

(স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

সন্ধ্যার লজ্জাশীলা তারাগুলি যখন লজ্জাবনতমুখে আকাশের কোলে বাহির হয়, তখন ছাদের উপর দাঁড়াইয়া অনন্তের বিমল সৌন্দর্য্যের মুখচ্ছবি ভাবিতে কি আনন্দ!—তখন জগতের বিশালতা অনুভব করিতে ভাল লাগে! এই বিশাল সৌন্দর্য্যের কবিত্বের ছায়ায় আমাদের প্রাণ মন ঢাকিয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে এ জগতের সৌন্দর্য্য বসিয়া যায়। সন্ধ্যার আধো আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমাদের প্রাণে ভাবের শত সহস্র হিল্লোল আসিয়া আঘাত করে এবং সংসারের সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া লইয়া গিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। সন্ধ্যার সুকোমল ছায়ায় আমাদের প্রাণ শীতল হইয়া যায়। এই জন্য সন্ধ্যার ছায়া আমাদিগের অত ভাল লাগে—তাই আমরা সন্ধ্যার সময় জগতের সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব বেশ অনুভব করিতে পারি।

এই বিশ্ব-জগতের প্রতি স্তরে স্তরে কবিত্ব মাখান। চরাচর শত সহস্র কবিতার সংগ্রহ। চন্দ্র সূর্য্য তারকারা এক একটি কবিতা। এই বিশ্ব-জগৎ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার মালা। শত সহস্র উজ্জ্বল তারকাবলী এই মালায় গ্রথিত হইয়া শোভা পাইতেছে—কত শত চন্দ্র সূর্য্য এই মালার মধ্যে ফুলের আকারে বিরাজ করিতেছে। সৌন্দর্য্যের সূত্রেই চন্দ্র তারকাবলী গাঁথা রহিয়াছে। সমস্ত দিবস মালাটীর তেমন সুগন্ধ থাকে না। সন্ধ্যায় তাহার সুগন্ধ বিকশিত হয়—তাহার হাসি ফুটিয়া উঠে। সন্ধ্যার রক্তিমচ্ছটায় মালাটি হাসিতে থাকে। মনুষ্য হাসি ভালবাসে, সুগন্ধও সে চায়। তাই সে সন্ধ্যার কোলে বসিতে চায়। সন্ধ্যা তাহার হৃদয়ের ধন; সন্ধ্যায় সে ভাবুক।

মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশের তলে সন্ধ্যায় বসিয়া থাকিতে কি আরাম! আমাদের হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য দূর হইয়া গিয়া সেও যেন আকাশের মত নির্ম্মল হয়। আমাদের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে। মনে হয়, সাঁজের তারার সহিত মিলাইয়া এক হইয়া যাই। সন্ধ্যা আমাদের সঙ্গে খেলা করিতে বড় ভালবাসে। সে মানব-হৃদয়ে নানা রকম খেলার ভাব তুলিয়া দেয়, কিন্তু তাহার সকল খেলাগুলিই গাম্ভীর্য্য মাখা, তাহার খেলায় গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়া যেন ফুটফুটে হাসি দেখা দিতেছে। যে হাসি গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হয় তাহাই যথার্থ সুন্দর। এই কারণে সন্ধ্যার খেলা বড় সুন্দর, কেননা তাহার হাসি গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে বিকাশিত হইতেছে। এইরূপ সুন্দর হাসির আধার বলিয়াই সন্ধ্যা মানুষের প্রিয়।

সমস্ত গগন নীল। কেবল দূরে দূরে এক একটী শুভ্র মেঘের টুকরা ধীরে ধীরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার এই দৃশ্যে কি গম্ভীর ভাব! কি মধুর হাসি! মেঘগুলি যেন নীলিমার চাপা ঠোটের এক একটী হাসির টুকরা। তাহারা যেন চাপা থাকিতে না পারিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা এই হাসিগুলিকে সাজাইয়া দেয়—তাহাদের সৌন্দর্য্যকে আরও সুন্দর করিয়া তুলে।

সন্ধ্যার আশ্রয়ে এই হাসিগুলি ফুটিয়া উঠে। তাই সন্ধ্যার এত গৌরব—তাই সন্ধ্যার সময় জগতের সৌন্দর্য্য দেখিবার উপযুক্ত সময়, তাই সন্ধ্যার প্রাণ কবিত্ব মাখা।

সন্ধ্যায় আমাদের হৃদয় তন্ত্রী নাচিয়া উঠে—হাসির আলোকে প্রাণ ভরিয়া যায়। চারিদিকের কবিত্বের মধ্যে থাকিতে থাকিতে আমরাও যেন কতকটা কবি হইয়া পড়ি। আমাদের প্রাণেও যেন সন্ধ্যার কবিত্বের হিল্লোল উথলিয়া উঠে। যেন আমরা সমস্ত দিবস সংসারের

কীট হইয়া শত সহস্র কোলাহলের বোঝা বহন করিয়া সন্ধ্যায় বিশ্রাম করিতে থাকি। আমাদের ক্লান্ত অবসন্ন প্রাণকে শান্তির পথে অগ্রসর করিতে থাকি। সংসারের বাহ্য চাকচিক্যে আমাদের ঝলসিত চক্ষু সন্ধ্যার সময়ে যেন আবার তাহার পূর্ব্ব দৃষ্টি লাভ করে। সমস্ত দিন আমরা কৃত্রিমতার মধ্যে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় প্রকৃতির পানে ফিরিয়া চাই। সন্ধ্যায় আমরা প্রকৃতির সন্তান—সমস্তদিন আমরা কৃত্রিমতার দাস।

আমরা প্রকৃতির সন্তান হইয়াও সংসারের কুটিলতার মধ্যে থাকিতে থাকিতে প্রকৃতিকে ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যাই। চব্বিশ ঘণ্টা কৃত্রিমতার সঙ্গে বাস করিতে করিতে আমাদের আচার-ব্যবহার প্রকৃতির অনুযায়ী না হইয়া প্রায় কৃত্রিমতার অনুযায়ী হয়। সন্ধ্যার ছায়ায় যেন আমাদের কৃত্রিমভাব ঢাকা পড়িয়া যায়—কৃত্রিমতা দূরে চলিয়া যায়। সন্ধ্যা আমাদিগকে প্রকৃতির নিকটে লইয়া আসে, আমাদের হৃদয়কে কতকটা প্রাকৃতিকভাবে গঠিত করিয়া তুলে। প্রকৃতি সত্য। সুতরাং সন্ধ্যা আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায়—আমাদের প্রাণের মধ্যে সত্য ঢালিতে থাকে। সন্ধ্যা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সরল করিয়া তুলে, নিতান্ত কুটিলতা হইতে একটু দূরে লইয়া যায়।

সন্ধ্যা প্রেমের মিলনস্থান। সন্ধ্যায় জগতের প্রেম বেশ ফুটিয়া উঠে—সাঁজের আলোকে তাহার পরিস্ফুট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যা প্রেমের হাসি। সন্ধ্যা না হইলে প্রেমের হাসি ভাল দেখা যায় না—জগতের সৌন্দর্য্যের তেমন বিকাশ হয় না। সন্ধ্যার হাসিতে কত ফুল ফুটে—তাহারা আবার কত প্রেম ছড়ায়। এইরূপ সন্ধ্যাকালে চারিদিকে প্রেম ফুটিয়া উঠে—চারিদিকে সৌন্দর্য্য বিকসিত হয়। সন্ধ্যা প্রেম বিলায়—আমাদের হৃদয়ে প্রেম ফুটাইয়া দেয়। তাই সন্ধ্যা প্রেমিক।

গাছের মাথায় সন্ধ্যার সময় যখন সূর্য্যের সোণালী-রশ্মিগুলি খেলা করিতে থাকে—গাছেদের কোমল পত্রে বসিয়া দুলিতে থাকে, তখন প্রেমের কি চমৎকার হাসি দেখিতে পাওয়া যায়! তখন মনে হয়, যেন চরাচর চরাচরের প্রেমে ঢল ঢল—প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুর প্রেমে টলমল। তখন মনে হয়, বিশ্ব-সংসারে প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়াছে, জগৎ প্রেমে গলিয়াছে, প্রেমের হিল্লোলে জগতে প্রাণের হিল্লোল মিলিয়াছে। তখন সন্ধ্যাকে প্রকৃত প্রেমিক—প্রেমের প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যা আমাদিগকে সসীম হইতে অসীমের পানে লইয়া যাইতে চায়—অসীমের পানে যাইবার জন্য আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দেয়। সসীম-সৌন্দর্য্যে নিতান্ত মুগ্ধ না হইয়া সন্ধ্যা আমাদিগকে অসীম-সৌন্দর্য্যের পানে ফিরিয়া চাহিতে বলে। সন্ধ্যা অসীমের ভাব কতকটা প্রকাশ করে। সসীমের সামান্যতা সন্ধ্যা আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। সন্ধ্যা আমাদিগের হৃদয়-দ্বার খুলিয়া রাখিতে পরামর্শ দেয়। সে বলে যে, দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিও না। সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভাবের মধ্যে আমাদিগের মন-প্রাণ আবদ্ধ করিতে সন্ধ্যা সহজে দিতে চাহে না। আমাদের সম্মুখে অসীমভাব আনিয়া দিয়া সে আমাদের প্রাণের দ্বার খুলিয়া দেয়। আমাদের প্রাণের বদ্ধ হাওয়া বাহির হইয়া যায়।

সন্ধ্যা প্রেমিক—সন্ধ্যা কবি। জগতে সন্ধ্যা প্রেম বিলায়—জগতে সে সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া দেয়। কবি না হইলে কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারে না। সন্ধ্যা কবি; তাই সে জগতের কবিত্ব বুঝাইতে কতকটা সক্ষম হয়। কবিত্ব সীমাবদ্ধ হইতে পারে না—তাহাতে তাহার শ্রী নষ্ট হইয়া যায়। সন্ধ্যায় আমরা জগতের যে কবিত্ব দেখি, তাহার

মধ্যে কোথাও বদ্ধভাব দেখি না। সন্ধ্যার কবিত্ব এই জন্যই বড় সুন্দর —সন্ধ্যার প্রাণ এই জন্য প্রেমপূর্ণ। সন্ধ্যায় আমরা দেখি ও বেশ বুঝিতে পারি যে,

"ছন্দে উঠিছে তারকা
ছন্দে কনক রবি উদিছে।"

———